

হরর কাহিনি

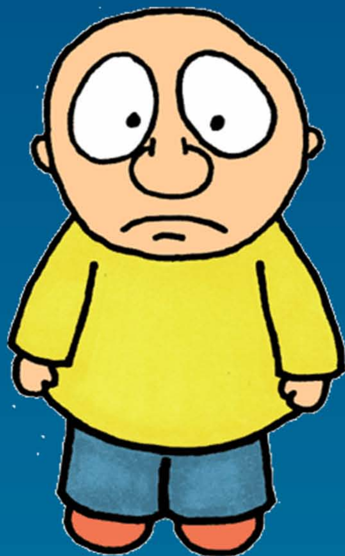
রক্ততৃষ্ণা

অনীশ দাস অপু

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!



Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

রক্ততৃষ্ণা

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

নিশি ডাক

মাঝরাতে ঘুমের ভেতর জুলিয়েট শুনতে পেল খুব কাছ থেকে এন্টনী তার নাম ধরে ডাকছে। জুলিয়েট, প্রিয়তমা জুলিয়েট ওঠো। ওঠো। আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। বহুকাল ধরে অপেক্ষায় আছি।

জুলিয়েটের ঘুম ভেঙে গেল।

বিছানায় শুয়েই জুলিয়েট তার ঘরের চারদিকে তাকাল।

জুলিয়েট থাকে দোতলার শেষ মাথার ছোট্ট রুমে। একা। পাশের বড়সড় ঘরটিতে থাকে তার মা-বাবা। দু'জনই মধ্যবয়সী। জুলিয়েটের আর কোন ভাই-বোন নেই।

জুলিয়েটদের বাড়িটা আট কাঠার ওপর। গেট দিয়ে ঢোকার মুখেই তরুণ ছিমছিমে, মোটামুটি ঝাপড়ানো একটা বকুল গাছ। তারপর বিশাল সাদা উঠোন। উঠোনে ইতিউতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দু'চারটা পাতাবাহার, বেলী কিংবা গোলাপ চারা। বড় রোগা চারাগুলো। কায়ক্লেশে বেঁচেবর্তে আছে। কোন যত্ন নেই তো!

যত্নটা নেবে কে?

গাছপালার ব্যাপারে জুলিয়েট খুব উদাস। সে কখনও তাকিয়েও দেখে না। আর মা-বাবা কিংবা চিরকালীন বাঁধা কাজের লোক ডি কস্টা তো যে যার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত চৌপর দিন। তাদের যেন শ্বাস ফেলার সময় নেই।

উঠোনের পরই জুলিয়েটদের প্রাচীন দোতলাটা। কতকাল চুনকাম হয়নি বাড়িটায়। জায়গায় জায়গায় প্লাস্টার খসে গেছে। লোম ওঠা ঘেয়ো কুকুরের মত ইটপাটকেল বেরিয়ে আছে। বৃষ্টি বাদলায় শ্যাওলা পড়ে গেছে পুরো বিল্ডিংটায়। কার্নিসে অবলীলায় গজিয়েছে বট অশথের চারা।

বিল্ডিংটার দিকে বহুকাল, জুলিয়েটের জন্মের পর থেকে কেউ মনোযোগ দেয় না। জন্মেই এই পুরনো বিল্ডিংটা, বিল্ডিং না বলে দরদালান বলাই ভাল—দেখেছে জুলিয়েট। প্লাস্টার, চুনকাম ইত্যাদি করালে, বাড়িটার চেহারা কী রকম হতে পারে সে-সম্পর্কে জুলিয়েটের কোন ধারণা নেই। আগ্রহও নেই।

জুলিয়েট মেয়েটা খুব উদাস প্রকৃতির। শুধুমাত্র একটা ব্যাপারেই সে খুব সচেতন। খুব আগ্রহী।

সেই সচেতনতার নাম এন্টনী। সেই আগ্রহের নাম এন্টনী।

জুলিয়েটদের বিল্ডিংয়ে একতলা দোতলা মিলে সাতটা ঘর। ওপর তলায় ডাইনিং স্পেস নিয়ে চারটি রুম। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখের রুমটি ড্রয়িং। তারপর পাশাপাশি দুটোর একটা মা-বাবার, শেষেরটা জুলিয়েটের। রেলিং দেয়া বেশ চওড়া একটা বারান্দাও আছে দোতলায়। বারান্দার শেষ মাথায় রান্নাঘর এবং বাথরুম। পুরনো কালের বাড়ি বলে রান্নাঘরটা বেশ বড়। প্রায় জুলিয়েটের ঘরের

সমান। সেখানে তিনজন মানুষ বসে খেতে পারে এমন একটা টেবিল পাতা। সঙ্গে তিনটে চেয়ার। ডাইনিং স্পেসটা ব্যবহার করা হয় না। কেন যে!

নীচের তলার তিনটি রুমের একেবারে ভেতরের দিকেরটায় থাকে ডি কস্টা। মাঝেরটা বাবার স্টাডিরুম। অত বড় ঘরে বই এবং বাবার চেয়ার টেবিল ছাড়া আর কিছু নেই। তিন দিকের দেয়ালের সঙ্গে লাগানো বিশাল বিশাল বুক সেলফ। একেকটার মাথা গিয়ে ঠেকেছে ছাদের সঙ্গে। অত উঁচু থেকে বই পাড়ার জন্য হালকা কাঠের একটা মই আছে বাবার। উপরের দিককার কোন বইয়ের দরকার হলে ডি কস্টাকে মইয়ে চড়িয়ে দেন বাবা। নিজে নীচে দাঁড়িয়ে বইটা দেখিয়ে দেন।

বাবা কখনও মইয়ে চড়েন না। মইটা এত হালকা, বাবার ভার সইতে পারবে না।

জুলিয়েটের বাবা ডেভিড সাহেব, ভদ্রলোক বেশ মোটাসোটা।

নীচের তলার অন্য যে রুমটার কথা এখনও বলা হয়নি সেটি বাবার মক্কেলদের জন্য। রুমটায় পুরনো একটা কার্পেট পাতা। আর চারদিকে ভারি ভারি সব সোফা। একটা টেবিল আছে এক কোণে। সেখানে খুব সকালবেলা এসে বসে বাবার অ্যাসিস্ট্যান্ট জন। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক। সদ্য পাশ করে বেরিয়েছে। এই লাইনে পাশ করে বেরুবার পর বেশ কিছুকাল কারও অ্যাসিস্ট না করলে জমানো মুশকিল। জন বেশ ভাল লোককেই ধরেছে।

জুলিয়েটের বাবা ডেভিড সাহেব এই শহরের সবচেয়ে নাম করা উকিল।

জুলিয়েটের মা শহরের একমাত্র মেয়েদের স্কুলের টিচার। জুলিয়েট সেই স্কুলেই পড়ে। মা ইংরেজীর টিচার। খুবই জাঁদরেল মহিলা। টিচার হিসেবে খুব নাম করা। চমৎকার পড়ান তিনি। আর এ ধরনের জাঁদরেল টিচারদের যা হয়, ছাত্রীরা ভীষণ ভয় পায় তাঁকে। কখনও কারও সঙ্গে কোনও ব্যাপারে একটাও বাড়তি কথা বলেন না তিনি। গম্ভীর।

শরীরের দিক দিয়ে মা আবার বাবার সম্পূর্ণ বিপরীত। লম্বা, স্লিম ফিগার মা'র। টুকটুকে ফর্সা গায়ের রং। চেহারার এখনও যা জৌলুস—যে কেউ এক কথায় তাঁকে সুন্দরী বলবে। তার মানে যুবতী বয়সে তিনি কী ছিলেন!

হ্যাঁ, যুবতী বয়সে তিনি যা ছিলেন, জুলিয়েট এখন তাই। এই শহরে জুলিয়েটের মত সুন্দরী মেয়ে আর একটাও নেই।

সকালবেলা, সাড়ে ন'টার দিকে মার সঙ্গে স্কুলে যায় জুলিয়েট। বাবা জনকে নিয়ে যান কোর্টে। তারপর থেকে বিকেল অবধি বাড়িতে শুধু ডি কস্টা। একাকী নীচের তলায় বারান্দায় বসে ঝিমোয় লোকটা। আগের দিনে খৈনি খেয়ে বাড়ির চাকর দারোয়ানরা যেমন ঝিমুতো, ডি কস্টা খৈনি না খেয়েই তেমন ঝিমোয়।

মা'র সঙ্গে জুলিয়েট স্কুল থেকে ফেরে বিকেলবেলা। তারপর ডি কস্টা যখন টেবিলে বৈকালিক নাস্তা সাজিয়ে ফেলে ততক্ষণে বাবা এসে যান। তখন আধঘণ্টা খানেক তাদের কাটে টেবিলে। সারাদিনে যতটুকু কথাবার্তা হয় তিনজন মানুষের, সে কেবল ওই সময়েই।

সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা চলে যান নীচে তাঁর স্টাডিরুমে। মা নিজের

ঘরে গিয়ে বসেন পরদিন স্কুলে কী পড়াবেন তাই নিয়ে। অথবা পরীক্ষার খাতা নিয়ে। আর জুলিয়েট গিয়ে ঢোকে নিজের রুমে। পড়াশুনা।

রাত দশটায় জুলিয়েটেরা সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় যায়।

শোবার আগে জুলিয়েটের কিছু ছোটখাটো কাজ থাকে। প্রথমে পাতলা একটা নাইটি পরে সে। তারপর মুখে মাখে সুগন্ধী একটা নাইট ক্রীম। শরীরের ভেতর ছড়িয়ে দেয় দামী পারফিউম।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে বিছানায় যেতে যেতে জুলিয়েট এণ্টনীর উদ্দেশে বলে, গুড নাইট, মাই লাভ।

জুলিয়েটের ঘরে একটি মাত্র জানালা। জানালাটা জুলিয়েটের বিছানা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। দিনরাত জানালাটা সে খুলে রাখে। কারণ বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে বিশাল, স্তব্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা জুলিয়েটের প্রিয় অভ্যেস। তাকিয়ে তাকিয়ে এণ্টনীর কথা ভাবা, জুলেয়েটের প্রিয় কাজ।

জুলিয়েটের প্রেম, এণ্টনী।

জুলিয়েটের বয়স পনেরো বছর। আগেই বলা হয়েছে সে তার মা বাবার একমাত্র মেয়ে। শহরের গুটিকয় খ্রীস্টান পরিবারের মধ্যে জুলিয়েটেরা অন্যতম। তাদের বাবা মা'র কারণে পরিবারটি বেশ নাম করা।

জুলিয়েটের কারণেও তাদের পরিবারকে শহরের সব যুবক ছেলে চেনে। জুলিয়েট এই শহরের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে।

এই শহরের নাম চন্দনপুর। একদা শহরটা ছিল সুন্দর বনভূমি। বনে ভয়ঙ্কর কোন প্রাণী ছিল না। আজেবাজে গাছপালা ছিল না। ছিল কেবল মূল্যবান চন্দনবৃক্ষ। দিনে দিনে বনটি উজাড় হয়ে গেছে। মূল্যবান চন্দন কাঠ সংগ্রহ করতে এসে ব্যবসায়ীরা আস্তানা গেড়েছিল। ক্রমে লোক বসতি বেড়েছে। বন থেকে পাচার হয়ে গেছে সব চন্দন গাছ। কালক্রমে গড়ে উঠেছে এই শহর। নাম হয়েছে চন্দনপুর।

ছিমছাম ছোট্ট শহর চন্দনপুর। একদা খ্রীস্টান-প্রধান শহর ছিল। এখন আর অত খ্রীস্টান নেই। জুলিয়েট আর এণ্টনীদের পরিবার ছাড়া আর হয়তো দশ বারোটি পরিবার আছে।

চন্দনপুরের মধ্যিখানে বহুকালের পুরনো, ভাঙাচোরা একটা গির্জা। গির্জায় আছেন বৃদ্ধ এক পাদ্রী। ফাদার যোসেফ। সংসারে কেউ নেই তাঁর। একাকী গির্জার ভেতরই একটা রুমে থাকেন তিনি। খুব বেশি প্রয়োজন না পড়লে বাইরে বেরোন না। শহরের লোকজনের সঙ্গে খুব কমই দেখা হয় তাঁর। গির্জার ভেতর একাকী বছরের পর বছর কেমন করে থাকেন তিনি, কে জানে! কী করেন, কে জানে!

নিজের চারদিকে রহস্যময়তার একটা আবরণ তৈরি করে রেখেছেন ফাদার যোসেফ। শহরের কোনও খ্রীস্টান মারা গেলে তিনি এসে বাইবেল পাঠ করে যান। কারও সঙ্গে কথা বলেন না। সাদা আলখাল্লা পরে নিঃশব্দে আসেন, নিঃশব্দে চলে যান, কারও দিকে ফিরেও তাকান না।

শহরের শেষ মাথায় একটা খ্রীস্টান কবরস্থান। সেই কবরস্থানটির পরেই

শহরের শেষ। সেখান থেকে শুরু হয়েছে খোলা প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে, বহুদূরে আবছা মত একটা রেখা দেখা যায়। জায়গাটা কোথায় কতদূর গিয়ে শেষ হয়েছে কেউ বলতে পারে না। শহরের কোন লোক ভুলেও কখনও ওদিকটায় যায় না।

জায়গাটির নাম কিঞ্চিৎ অদ্ভুতুড়ে। খরগোসপুর।

শোনা যায় এই খোলা প্রান্তর একদা ছিল বিশাল তৃণভূমি। সেই তৃণভূমিতে নাকি খরগোস ছাড়া অন্য কোন প্রাণী ছিল না।

এই কারণেই কি নাম হয়েছে খরগোসপুর?

কে জানে!

খরগোসপুরের মাঝমধ্যিখানে নাকি আছে প্রায় চারশো বছরের পুরনো একটা রাজপ্রাসাদ। লোকে বলে, সেই প্রাসাদে এখনও রাজত্ব করছেন রাজা। শরীরী নয়। অশরীরী। রাজার প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায় প্রাসাদে। কখনও কখনও নিঝুম রাতে বাদুড়ের ছদ্মবেশে প্রাসাদ থেকে বেরোন রাজা। নিশিরাতে খরগোসপুরের আকাশে তখন ওড়াওড়ি করতে দেখা যায় বিশাল একটা বাদুড়। খাদ্যের অভাবে নাকি বাদুড়ের ছদ্মবেশ ধারণ করেন রাজা। বাগে পেলে সেই বাদুড় নাকি মানুষের রক্ত শুষে নেয়। মাড়াই করা আখের মত ছিবড়ে করে ফেলে মানুষ।

এই ভয়ে, রাতের বেলা তো দূরের কথা, দিনের বেলাও কেউ কখনও খরগোসপুরের খোলা প্রান্তরের দিকে যায় না।

মানুষ বড় ভীতু জীব।

খরগোসপুরের কথা জুলিয়েটও শুনেছে। কখনও তার মা বাবার কাছে, কখনও তার স্কুলের বন্ধুদের কাছে। সবচেয়ে বেশি শুনেছে যার কাছে, তার নাম এন্টনী। জুলিয়েটের প্রেম।

ভারি সুন্দর ছেলে এন্টনী। দেখতে সিনেমার নায়কদের মত। স্বভাবটাও সুন্দর। সময় হলে এন্টনীর সঙ্গে জুলিয়েটের বিয়ে হবে। দুই পরিবারের মধ্যে পাকা কথা হয়ে আছে।

এন্টনী এখন চন্দনপুরে নেই। এখানকার স্কুলের পড়া শেষ করে সে গেছে দূরের বড় শহরে পড়াশুনা করতে। প্রায় দু'বছর হয়ে এল। আরও চার বছর সেই শহরে থাকতে হবে এন্টনীকে। তারপর পড়াশুনা শেষ হলে বিয়ে।

তবে প্রতি বছরই দু'তিনবার করে চন্দনপুরে আসে এন্টনী। ছুটিছাটার সময়। সেই সময়টা জুলিয়েটের খুব আনন্দে কাটে। সারাদিন ওরা দু'জন একত্রে থাকে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

এ বছরও দু'বার এসেছে এন্টনী। আর একবার আসার সময়ও হয়ে এল। বড় দিনের সময়।

বড় দিনের এখনও মাস দুয়েক বাকি। দু'মাস পর এন্টনী ফিরবে। জুলিয়েট দিনমান সেই কথা ভাবে। স্কুলে ক্লাস করার সময়, বাড়িতে নিজের রুমে পড়তে বসে, মোট কথা যতক্ষণ জেগে থাকে, বিছানায় শুয়ে সামনের খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে।

আজও বিছানায় শুয়ে এন্টনীর কথা খুব ভেবেছে জুলিয়েট। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু মাঝরাতে, খুব কাছ থেকে জুলিয়েটের নাম ধরে ডাকল এন্টনী। সেই ডাকে ঘুম ভেঙে যায় জুলিয়েটের।

বিছানায় শুয়ে থেকেই ঘরের চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল জুলিয়েট। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর এসে পড়েছে ধোঁয়াটে একটা আলো। ঘরের ভেতরকার জমাট অন্ধকার সেই আলোয় খানিকটা তরল হয়ে গেছে।

কিন্তু ঘরের ভেতর তো কেউ নেই।

তা হলে?

তখন আবার এন্টনীর ডাক এল জুলিয়েটের কানে। জুলিয়েট, প্রিয়তমা জুলিয়েট, এই তো আমি। এদিকে তাকাও।

জুলিয়েট মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার দিকে তাকাল। তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

দোতলার জানালার বাইরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এন্টনী। পায়ের তলায় মাটি থাকলে লোক যেমন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে, তেমন করে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ দোতলার জানালা থেকে মাটি প্রায় বিশ ফুট নীচে। আর জানালার বাইরে একদম খাড়া দেয়াল, কোনও কার্নিস নেই।

তা হলে এন্টনী ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেমন করে?

এই কথাটা কিন্তু একবারও মনে হলো না জুলিয়েটের। প্রথমে এন্টনীর ডাক শুনেছে সে। তারপর ঘুম ভেঙে জানালায় তাকিয়েছে, ওই তো দেখা যাচ্ছে আবছা আলো আঁধারিতে এন্টনী দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না তার। কেবল চোখ দুটো দেখা যায়। রক্তের মত টুকটুকে লাল চোখ। গভীর জলের ভেতর থেকে গজার মাছ যেমন টুকটুকে লাল চোখে পলকহীন তাকিয়ে থাকে এন্টনী তেমন করে তাকিয়ে ছিল জুলিয়েটের দিকে। চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলছিল। যেন তীব্র লাল কোন পাথর জ্বলছে।

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে ভেতরে কী যেন কী একটা ঘটে গেল জুলিয়েটের।

নিজের অজান্তে বিছানায় উঠে বসল জুলিয়েট।

তখন এন্টনী আবার তাকে ডাকে। এসো প্রিয়তমা বেরিয়ে এসো। আমি কতকাল তোমার অপেক্ষায় আছি।

জুলিয়েট বিছানা থেকে নেমে নিঃশব্দে গিয়ে দরজা খুলল। ঘর থেকে বারান্দায় বেরুল।

বারান্দায় বেরিয়ে, রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে জুলিয়েট দেখে উঠোনের বকুলগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছে এন্টনী। আকাশে বুঝি সেদিন ক্ষয়াটে চাঁদ ছিল। হাঁটি হাঁটি পা পা করে শীতকাল আসছে বলে রাতের বেলা পাতলা কুয়াশা পড়ে। চাঁদের মরা আলো কুয়াশায় মিশেল খেয়ে কী রকম একটা ধোঁয়াটে ভাব তৈরি করে রেখেছে চরাচরে। কিন্তু বকুলতলাটা ছিল অন্ধকার। অন্ধকারে এন্টনীর মুখ দেখতে পায় না জুলিয়েট। কেবল চোখ দুটো দেখতে পায়। তীব্র লাল পাথরের মত ধক ধক করে জ্বলছে।

বকুলতলা থেকে এন্টনী আবার ডাকল জুলিয়েটকে। এসো প্রিয়তমা। নীচে নেমে এসো। আমি তোমার অপেক্ষায়।

জুলিয়েট সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে লাগল।

নীচে নেমে বকুলতলায় এন্টনীকে আর দেখতে পায় না জুলিয়েট। দেখে, তাদের গেটটা হাট করে খোলা। গেটের বাইরে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে এন্টনী। তার মুখ দেখা যায় না, শুধু সেই চোখ দুটো।

রাস্তা থেকে এন্টনী আবার তাকে ডাকল। এসো প্রিয়তমা। এসো।

জুলিয়েট বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

জুলিয়েটের পরনে ছিল ঘুম পোশাক, পাতলা নাইটি। নাইটির তলায় আর কিছু পরা নেই। ফলে রাস্তার ওপর চেপে থাকা কুয়াশা এবং চাঁদের ম্লান আলোয় জুলিয়েটের পনেরো বছর বয়সের অসাধারণ সুন্দর শরীরের যাবতীয় মহার্ঘ বস্তু যে কেউ তাকালেই দেখতে পাবে।

জুলিয়েটের সেসব খেয়াল ছিল না। কী এক ঘোরের মধ্যে রাস্তায় এসে দাঁড়াল সে।

জুলিয়েটদের বাড়ির সঙ্গেই রাস্তা। রাস্তার একটা দিক চলে গেছে শহরের ভেতর দিকে, আর একটা দিক গেছে খ্রীস্টান কবরস্থানটা ডানদিকে রেখে সোজা খরগোসপুরের খোলা প্রান্তরের দিকে।

সেই রাস্তায় বেরিয়ে জুলিয়েট দেখল খরগোসপুরের দিকে যাওয়ার রাস্তায়, জুলিয়েটের থেকে বেশ অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে এন্টনী। রাস্তার ওদিকটায় বিদ্যুৎ আসেনি। ফলে আলো নেই। আকাশে ম্লান চাঁদ আছে, রাস্তায় আছে কুয়াশা–এ রকম ধোঁয়াটে আলোয় এন্টনীর মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু লাল পাথরের মত চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলছে, দেখা যায়।

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে, পাগলের মত প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল জুলিয়েট। এন্টনী, প্রিয়তম এন্টনী, দাঁড়াও আমি আসছি।

কিন্তু জুলিয়েট ছাড়া সেই ডাক আর কেউ শুনতে পায় না।

রাস্তার যেখানটায় এন্টনী দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে পৌঁছে জুলিয়েট দেখে এন্টনী নেই। ওই তো বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখা যায় না এন্টনীর। শুধু তীব্র লাল পাথরের মত চোখ দুটো।

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে জুলিয়েট চিৎকার করে ওঠে, এন্টনী, দাঁড়াও আমি আসছি।

তারপর আবার দৌড়।

কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে দেখে কোথায় এন্টনী। ওই তো দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। মুখ দেখা যায় না। শুধু তীব্র লাল পাথরের মত চোখ।

জুলিয়েট চিৎকার করে, এন্টনী, এন্টনী।

জুলিয়েট নিজে ছাড়া আর কেউ সেই ডাক শোনে না। তবুও চিৎকার করতে করতে বহুদূরে দাঁড়ানো এন্টনীর দিকে ছুটতে থাকে জুলিয়েট।

ছুটতে থাকে। ছুটতে থাকে।

খ্রীস্টান কবরস্থানটায় ঢোকার মুখে, চারদিক খোলা, মাথার ওপর ছাদ এমন একটা বেদী। বেদীটার পেছন দিকে বিশাল এক দেবদারু গাছ। চন্দনপুর যখন

বন ছিল গাছটি সম্ভবত সেই সময়ের। ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে টিকে আছে। দেবদারু গাছটার কারণে বেদীটার ওপর ঠিকঠাক আলো পড়তে পারে না। রাতেরবেলা তো অন্ধকার থাকেই জায়গাটা, দিনেরবেলাও।

বেদীটার পরই কবরস্থানের পুরনো ভারি লোহার গেট। গেটটা সব সময়ই বন্ধ থাকে। দু'চার বছরে এক আধজন খ্রীস্টান মারা গেলে খোলা হয়।

জায়গাটা মৃত্যুপুরীর মত নীরব নিঝুম। রাতের বেলা তো দূরের কথা দিন দুপুরেও এদিকটায় কেউ আসে না।

কবরস্থানের প্রায় গা ঘেঁষে চলে যাওয়া রাস্তাটা গিয়ে পড়েছে খরগোসপুরের খোলা প্রান্তরে। খরগোসপুর নিয়ে ভয়াবহ সব গল্প প্রচলিত। রক্তচোষা অতিকায় একটা বাদুড় নাকি প্রায়ই ওড়াউড়ি করে এখানকার আকাশে। চন্দনপুরের অনেকেই নাকি দেখেছে। জ্যোৎস্না রাতে বিশাল কালো মেঘের মত উড়ে বেড়ায়। বাগে পেলে সেই বাদুড় মানুষের গলার কাছটা তীক্ষ্ণ ঠোঁটে কামড়ে ধরে সব রক্ত চুষে নেয়। মাড়াই করা আখের মত ছিবড়ে করে ফেলে যায় মানুষ।

কিন্তু ওরা চারজন লোকের এইসব কথা বিশ্বাস করে না। শহরের সবচে' নিরিবিলি জায়গা বলে, কোন লোকজন কখনও এদিকটায় আসে না বলে সন্ধের পর প্রায়ই ওরা নেশা করার উপযুক্ত জায়গা মনে করে বেদীটায় এসে বসে। তারপর রাত দুপুর অবধি মদ গাঁজা খায়, মেয়েমানুষ সংক্রান্ত রসাল আড্ডা দেয়। কিংবা কখনও জোরজার করে কোন মেয়েকে ধরে এনে একের পর এক এই বেদীটায়—

সে রাতেও ওরা চারজন বসেছিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা শহরের একটি নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁয় মিলিত হয় ওরা। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে একেকজন দশটা এগারোটায়। তারপর খেয়েদেয়ে বাড়ি থেকে বেরোয়। বেরিয়ে শহরের মূল ব্যবসা কেন্দ্রের ভেতর একটা রেস্তোরাঁয় হাজির হয়। একে একে চারজন। দুপুর অবধি থাকে ওই জায়গাটায়। সে সময় তাদের কাজ হচ্ছে নিরীহ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বখরা আদায় করা। বড় কিংবা স্থায়ী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তো তাদের চুক্তি করাই থাকে, মাস শেষে মোটা অংকের টাকা পায়। কেউ বখরা দিতে রাজি না হলে, তাকে আর এই শহরে ব্যবসা করে খেতে হবে না। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সুখে সংসার করতে হবে না। হাজার লোকের সামনে ধরে এমন মার মারবে—জান শেষ করে ফেলবে। বাধা দেয়ার, প্রতিবাদ করার কেউ নেই। শহরের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোও ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে না। তা ছাড়া ওরা চারজনই শহরের বেশ প্রভাবশালী ঘরের ছেলে। রাগী, স্বাস্থ্যবান এবং মাস্তান। কিন্তু চারজন চার ধর্মাবলম্বী। মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ এবং হিন্দু।

শহরের লোকেরা ওদের চারজনকে খরগোসপুরের সেই অতিকায় রক্তচোষা বাদুড়ের চেয়েও বেশি ভয় পায়। শহরের যুবতী মেয়েগুলো ওদের দেখলে ভয়ে সরে যায়। কখন কার ওপর চোখ পড়বে! কাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে কবরস্থানের বেদীতে!

এই কারণে কোন গলি দিয়ে ওরা হেঁটে গেলে মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায় গলির

দু'পাশের যাবতীয় ঘরবাড়ির দরজা জানালা। গলিটি হয়ে ওঠে কবরস্থানের মত নীরব নিঝুম। মানুষের শ্বাস পতনের শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

ওরা চারজন এই শহরের আতঙ্ক।

দুপুরের পর পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে ওরা ফিরে যায় যে যার বাড়ি। চারজনের বয়সই তিরিশের নীচে। কেউ এখনও বিয়ে করেনি। মা বাবার সঙ্গে থাকে। হলে কী হবে ওরা মা বাবার ধার ধারে না। মা বাবার কথা পাত্তা দেয় না।

দুপুরে বাড়ি ফিরে খাওয়া এবং ঘুম। তারপর সন্ধ্যেবেলা ঢুলু ঢুলু চোখমুখ নিয়ে ওই রেস্তোরাঁয় মিলিত হওয়া। আজকের নেশা কী হবে সেটা ওরা ওই রেস্তোরাঁয় বসেই ঠিক করে নেয়।

সেদিন, ওদের নেশার দ্রব্য ছিল বিদেশী মদ। মদটা ওরা জোর করে এনেছিল।

শহরের একমাত্র বেশ্যাপাড়ায় মদের দোকান চালায় বাবুয়া নামের এক জোয়ান মর্দ মাড়োয়ারী। মদের কারবার করে টাকার কুমীর হয়ে গেছে লোকটা। কিন্তু স্বভাবে হাড় কিপটে বাবুয়া। একটি পয়সা বাকি দেয় না কাউকে। একটি পয়সা ছাড়ে না। তার ওপর আধ বোতল মদে আধ বোতল পানি মিশিয়ে বিক্রি করে। কেউ প্রতিবাদ করে না।

মাতালরা কতটুকু প্রতিবাদী হতে পারে!

তা ছাড়া বাবুয়া লোকটা তাগড়া জোয়ান। ভীষণ বদমেজাজী। কেউ বাড়াবাড়ি করলে মদের বোতল দিয়ে মাথায় মেরে বসবে। বোতল দিয়ে মাথায় মারতে বাবুয়া খুব পছন্দ করে।

সন্ধেবেলা সেই রেস্তোরাঁয় বসে ওরা চারজন ভাবছিল আজ কী দিয়ে নেশা করবে। প্রত্যেকের হাতে জ্বলছিল দামী সিগ্রেট, সামনে টেবিলের ওপর চায়ের কাপ।

গ্যাংলিডার মণ্টু একসময় বলল, এই দিলীপ, আজ কী দিয়ে নেশা করা যায়, বলতো?

সিগ্রেটে টান দিয়ে দিলিপ তাকাল মণ্টুর দিকে। মণ্টুর মুখে ঘন কালো দাড়ি-গোঁফ। খাড়া নাক। কালো মোটা ঠোঁটে সিগ্রেট জ্বলছে। ভাটার মত চোখে সহজে পলক পড়ে না মণ্টুর। কারও দিকে তাকালে মনে হয় হাড়মাংসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা শরীরের ভেতরকার আসল ব্যাপারগুলো দেখতে পাচ্ছে।

মণ্টুর মাথায় ঝাঁকড়া চুল। ঘাড় অবধি লম্বা। গলায় মোটা একটা সোনার চেন। পরনে টাইট গেঞ্জি। গেঞ্জির বাইরে মণ্টু তাগড়া বাহু দেখলেই বোঝা যায় বুনো শুয়োরের মত শক্তি আছে গায়ে।

দিলীপ বলল, তুই-ই বল কী করা যায়।

দিলীপ দেখতে লম্বা, পাতলা। ভাঙাচোরা মুখে থার্ড ব্রাকেটের মত গোঁফ। দিলীপ কথা বলে কম। কিন্তু খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। অন্যেরা গায়ের জোরে করে যে কাজ দিলীপ সেটা করে বুদ্ধি দিয়ে। ফলে এই গ্রুপের যে কোন কাজে দিলীপের পরামর্শ নেয়া হয়।

মাইক বলল, আজ মদ খাব।

মাইক দেখতে একদম সাহেবের মত। সুন্দর চেহারা। সব সময় ক্লিন শেভ করে। মাথায় হালকা লালচে চুল। মাইকের কমনীয় মুখ দেখে কেউ বুঝবে না এই সুন্দর মুখের আড়ালে লুকিয়ে আছে নৃশংস এক মানুষ। অবলীলায় মানুষ খুন করা মাইকের প্রিয় অভ্যেস।

সিদ্ধার্থ বলল, হ্যাঁ, আজ মদ হলে খুব জমে। অনেক দিন ভরপেট বিদেশী মদ খাওয়া হয় না।

সিদ্ধার্থর চেহারা খুবই ভগ্ন ধরনের। দেখতে বেঁটেখাটো। শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়। মুখটা কদাকার। সিদ্ধার্থের শরীর দেখে মনে হয় বারো বছরের বালক। মুখ দেখে মনে হয় বায়ান্ন বছরের প্রৌঢ়। অত্যন্ত কামুক সে। মেয়েমানুষ ব্যবহারের সময় সে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় নেয়।

হাতের সিগ্রেট ছুঁড়ে ফেলে মণ্টু বলল, দিলীপ বুদ্ধি বের কর।

মাইক বলল, চল মদ কিনি।

সিদ্ধার্থ বলল, বুদ্ধি আবার কী! পকেটে টাকা আছে। দু'টো বোতল কিনে আখড়ায় চলে যাই।

মণ্টু বলল, নগদ টাকা খরচ করে নেশা করতে হবে!

মাইক বলল, তো বিদেশী পাবি কোথায়? আমরা গেলে তো বিদেশী মাল কেউ বেরই করবে না। হুজুর হুজুর করে দেশীটা ধরিয়ে দেবে।

সিদ্ধার্থ বলল, তাই।

এতক্ষণ দিলীপ কোন কথা বলেনি। এবার বলল, একটা জায়গায় গেলে পাওয়া যাবে।

মণ্টু বলল, কোথায়?

পাড়ায়, বাবুয়ার দোকানে।

ধুৎ! ও শালা তো দেশী বেচে।

না। ওর কাছে সব থাকে।

মাইক বলল, চল যাই। বহুদিন পাড়ায় যাই না।

সিদ্ধার্থ বলল, ভালই হয়। ফাঁকে একটু মেয়েমানুষ।

মণ্টু গম্ভীর গলায় বলল, ওই সিফিলিসঅলাগুলোর কাছে যাব না।

সিদ্ধার্থ বলল, না, তা যাব না। যদি নতুন মাল এসে থাকে।

চল যাই।

সন্ধ্যের মুখে মুখে ওরা চারজন বেশ্যা পাড়ায় এসে ঢুকল।

পাড়া তখন খুবই জমজমাট। খুপরি ঘরগুলোর সামনে শুধু ছায়া ব্লাউজ পরা মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। কেউ গান গাইছে, কেউ খদ্দেরদের সঙ্গে দরদাম করছে, রঙ্গতামাসা করছে। পুরুষমানুষের মত অশ্লীল গালাগাল দিচ্ছে কোন বেশ্যা। মাতালরা হৈ চৈ করছে।

ওরা পাড়ায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সব হৈ হল্লা, রঙ্গতামাসা বন্ধ হয়ে গেল। বেশ্যা মেয়েগুলো হুটহাট ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। মাতালগুলোর নেশা কেটে গেল। কামার্ত খদ্দেররা আশি বছরের বৃদ্ধের মত বীর্যহীন হয়ে গেল। ফিল্মের ফ্রিজশটের মত একটা অবস্থা।

ওরা চারজন বেশ্যাপাড়ার মাটি কাঁপিয়ে বাবুয়ার মদের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।

বাবুয়ার লম্বা চালা ঘরের বেঞ্চে সার ধরে বসে দেশী মদ খাচ্ছিল কয়েকজন। ওদের দেখে কে কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেল কেউ জানে না।

বাবুয়া প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। খদ্দেররা পয়সা না দিয়ে কেটে পড়ছে দেখে সে হৈ হৈ করে ক্যাশ থেকে লাফিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মণ্টু একহাতে তার কলার চেপে ধরে মুরগীর ছানার মত টেনে আনল। অত বড় জোয়ান মানুষ বাবুয়া, মণ্টুর সামনে কেঁচো হয়ে গেল। ওই অবস্থায়ই দু'হাত জোড় করে বলল, হুজুর মাই বাপ, কেয়া কসুর মেরা?

মণ্টু তাকে ছুঁড়ে ক্যাশ বাক্সের ওপর ফেলে দিল। লোক ঠকিয়ে খুব কামাচ্ছ শালা।

নেহি তো হুজুর।

সঙ্গে সঙ্গে মাইকের একটা তীব্র লাথি গিয়ে পড়ল বাবুয়ার মুখে। নীচের ঠোঁটটা কেটে ঝুলে পড়ল।

বাবুয়া হাউমাউ করে উঠল, হুজুর হুজুর।

সিদ্ধার্থ বলল, চোপ বাঞ্চোত। মাল বের কর।

লে লেন, সব মাল লে লেন।

বাবুয়ার পেছনের তাকে সাজানো ছিল কয়েকটা দেশী মদের বোতল। দিলীপ এগিয়ে গিয়ে খুব ঠাণ্ডা মাথায় ধাম করে একটা লাথি মারল তাকে। তাকটা কাৎ হয়ে পড়ে বোতলগুলো চুরমার হয়ে গেল। মুহূর্তে দেশী মদের ঝাঁকাল গন্ধে ভরে গেল পুরো বেশ্যা পাড়া।

দিলীপ বলল, বিদেশী মাল দে। খুব বেশি চাই না। মাত্র চার বোতল।

বাবুয়া হাউমাউ করে বলল, হুজুর মাই বাপ, ওহি মাল তো হামারা পাস–

চোপ শালা মিথ্যুক–বলে মণ্টু এক হাতে বাবুয়ার টুঁটি চেপে ধরল। মণ্টুর হাতের প্রচণ্ড চাপে বাবুয়ার লকলকে জিব বিঘৎ পরিমাণ বেরিয়ে এল।

গোঙাতে গোঙাতে, দু'হাতে শূন্যে ভাসমান কিছু একটা হাতড়াতে হাতড়াতে বাবুয়া বলল, আভি দেতা হয়। আভি—

বাবুয়া তারপর চোখ মুছতে মুছতে চারটে বিদেশী মদের বোতল বের করে দিল।

মণ্টুরা চারজন চারটা বোতল হাতে নিল।

দিলীপ বলল, বাবুয়া, এখানে ঠিকঠাক মত কারবার চালাতে হলে সপ্তাহে চারটে করে এরকম বোতল দিতে হবে আমাদের।

শুনে বাবুয়া আঁতকে উঠল। হুজুর—

মণ্টু বলল, তুই নিজে গিয়ে দিয়ে আসবি। আমরা আসব না।

মাইক বলল, যদি এদিক ওদিক হয়—

বাবুয়ার ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছিল। একহাতে ঠোঁট চেপে ধরে বাবুয়া বলল, নেহি হুজুর।

সিদ্ধার্থ বলল, যা এক কার্টুন বিদেশী সিগ্রেট এনে দে।

চোখের পলকে সিগ্রেট এসে গেল।

ওরা যখন পাড়া থেকে বেরিয়ে আসছে, সিদ্ধার্থ বলল, মণ্টু মেয়েমানুষ।

মণ্টু বলল, আজকে বাদ দে।

সিদ্ধার্থ আর কোন কথা বলল না।

তারপর ওরা এসে বসেছে কবরস্থানের সেই বেদীটায়। দিলীপ বুদ্ধি করে দু'টো বড় মোমবাতি নিয়ে এসেছিল। মোমের আলোয় বিদেশী মদ এবং সিগ্রেট এবং ফাঁকে ফাঁকে রসাল আড্ডা–কখন রাত নিঝুম হয়ে আসে–ওরা বুঝতে পারে না।

এক সময় সিদ্ধার্থ বলল, ওই মণ্টু, জুলিয়েটকে একদিন তুলে আনা যায় না!

মণ্টু বোতল থেকে ঘট করে এক ঢোক মদ খায়। ওরা চারজনে চারটে বোতল ভাগ করে নিয়েছে।

দিলীপ বলল, শালা জুলিয়েটকে একদিন পেলে বড় ভাল হত।

মাইক সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, রোমিও শালা কোথায়?

মণ্টু বলল, রোমিও কে?

আরে ওই শালা, জুলিয়েটের লাভার।

দিলীপ বলল, ওটার নাম তো এণ্টনী।

একই কথা। জুলিয়েটের লাভারের নাম এণ্টনী হয় কেমন করে!

সিদ্ধার্থ বলল, তাই তো হয়েছে। ব্যাটার নাম তো এণ্টনী।

মণ্টু বলল, হ্যাঁ এণ্টনী।

মাইক এবার রেগে গেল। নিজের বোতলে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে বলল, খামোস খামোস। আমি এখন একটা ভাষণ দেব।

তিনজন একত্রে বলল, দাও বাপ।

মাইক শুরু করল, ভাইসব, ভাইসব ও আমার বন্ধুগণ, মাতাল বন্ধুগণ–আজ আমি আপনাদের এখানে উপস্থিত, উপস্থিত হয়েছি একজন কবি সম্পর্কে, হ্যাঁ পৃথিবী বিখ্যাত একজন কবি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করতে।

তিনজন একসাথে বলল, সেম সেম।

মাইক বলল, ভাইসব, হে আমার প্রিয় মাতালগণ, সেই যুগান্তকারী কবির নাম ছিল–দিলীপ, কী যেন নাম ছিল?

দিলীপ বলল, সেক্সপীয়র।

মাইক আঙুল তুলে বলল, নো নো। তাঁহার নাম ছিল উইলিয়াম সেক্সপীয়র।

মণ্টু বলল, নামটা যেন চেনা চেনা লাগে! কী করে রে?

সিদ্ধার্থ বলল, কবিতা লেখে।

মাইক বলল, ইয়েস। হি ইজ এ পোয়েট।

দিলীপ বলল, থাকে কোথায়?

সিদ্ধার্থ বলল, কী জানি।

মণ্টু বলল, কবিতা বুঝি খুব ভাল লেখে?

মাইক বলল, আই ডোণ্ট নো। তারপর আঙুল তুলে–ভাইসব, সেক্সপীয়র একটি নাটক লিখেছিলেন। মানে প্লে অর্থাৎ ড্রামা।

শুনে মণ্টু খিক খিক করে হেসে উঠল। যা শালা, মাইকটা তো মাতাল হয়ে গেছে। এই মাত্র বলল, সেক্সপীয়র কবিতা লেখে এখন বলছে নাটক—হি হি হি।

দিলীপ বলল, মনে হয় নাটকও লেখে।

মণ্টু মাথা দুলিয়ে বলল, অল রাইট। মাইক?

ইয়েস কমরেড।

ভাষণ।

ওকে। সেক্সপীয়রের নাটকটির নাম ছিল, ছিল—ওওও, দিলীপ।

দিলীপ জড়ানো গলায় বলল, রোমিও জুলিয়েট।

ইয়েস, রোমিও জুলিয়েট। ইটস এ ফেণ্টাসটিক লাভ মানে—এএএ অতিশয় চমৎকার প্রেমের নাটক। জুলিয়েটের প্রেমিকের নাম রোমিও। নট এণ্টনী। ওকে?

তিনজন একত্রে বলল, ইয়েস লিডার।

দিলীপ বসেছিল রাস্তার দিকে মুখ করে। নিজের বোতল তুলে চুমুক দিতে গেছে তখুনি দেখে শহরের দিক থেকে চাঁদের ম্লান আলো এবং কুয়াশা ভেঙে কে একজন তীর বেগে ছুটে আসছে।

প্রথমে দিলীপ কিছু বুঝতে পারে না। বোতলে চুমুক না দিয়ে মাথাটা জোরে একবার ঝাঁকুনি দেয় সে। তারপর আবার রাস্তার দিকে তাকায়। না, ভুল দেখছে না তো সে। ওই তো ছুটে আসছে একজন। মানুষের মত দেখতে।

দিলীপের পাশে বসেছিল মণ্টু। দিলীপ জোরে তাকে একটা ধাক্কা দিল—ওই মণ্টু, দেখ দেখ।

মণ্টু বলল, কী?

ওই যে দেখছিস না!

মাইক এবং সিদ্ধার্থও শুনেছে কথাটা। চারজন একসঙ্গে রাস্তার দিকে তাকাল। মুহূর্তে নেশা ছুটে গেল তাদের।

সিদ্ধার্থ বলল, মেয়েমানুষের মত মনে হয়।

দিলীপ বলল, হ্যাঁ।

মাইক বলল, রাইট।

মণ্টু বলল, চল তো দেখি।

ওরা চারজন উঠে দাঁড়াল।

তখন দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠল একটি যুবতী মেয়ে। হাঁটু অবধি ফিনফিনে নাইটি পরা। ঊর্ধ্বশ্বাসে খরগোসপুরের দিকে ছুটে যাচ্ছে সে।

মণ্টু বলল, আরে মেয়েমানুষ তো!

মাইক বলল, ও ভাবে ছুটে যাচ্ছে কোথায়?

সিদ্ধার্থ বলল, চল ধরে ফেলি।

তার এই একটি মাত্র কথায় কামনার আগুন ছিল।

ওরা চারজন মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথমেই ছিল মণ্টু। সে ছুটে গিয়ে সামনের দিক থেকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটাকে। ধরেই খুশিতে পাগল হয়ে গেল। আঃ দারুণ নরম একটা শরীর তো।

মণ্টু জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, এণ্টনী মাই

লাভ।

তারপর মণ্টুর বুকে ঢলে পড়ল।

সিদ্ধার্থ এবার আনন্দের গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। মণ্টু কাজ হয়ে গেছে।

কী?

আরে এই তো জুলিয়েট!

তিনজন একত্রে বলল, অ্যাঁ?

হ্যাঁ।

চল তো ভাল করে দেখি।

মেয়েটিকে পাঁজা কোলে করে বেদীতে নিয়ে এল মণ্টু। সঙ্গে সঙ্গে বেদীতে বসানো মোমটা জ্বেলে মেয়েটির মুখের সামনে আনল সিদ্ধার্থ। এবং খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল। মণ্টু কাজ হয়ে গেছে।

জুলিয়টকে পাঁজা কোলে রেখেই মণ্টু বলল, মনে হয় সেন্সলেস হয়ে গেছে।

মাইক বলল, কিন্তু মেয়েটি এই পোশাকে, খালি পা—কোথায় ছুটে যাচ্ছিল!

সিদ্ধার্থ বলল, যেখানে ইচ্ছে যাক। আমাদের আজ কপাল খুলে গেছে।

দিলীপ গম্ভীর গলায় বলল, মণ্টু শুইয়ে দে।

জুলিয়েটকে শুইয়ে দেয়ার পর দেখা গেল সত্যি সত্যি সে সেন্সলেস হয়ে গেছে।

কিন্তু ওরা চারজন সেসব খেয়াল করল না। পাতলা নাইটির ভেতর থেকে ফুটে থাকা জুলিয়েটের অসাধারণ সুন্দর শরীর, মোমের আলোয় স্পষ্ট ফুটে থাকতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল সবাই। যে যার বোতল হাতে নিয়ে ঢক ঢক করে মদ ঢালল গলায়। তারপর খেমটা নাচ শুরু করে দিল।

অজ্ঞান জুলিয়েট চিৎ হয়ে পড়ে রইল বেদীতে।

এক সময় দিলীপ বলল, মণ্টু মেয়েটার সেন্স আনা দরকার।

মাইক বলল, হ্যাঁ, নয়তো জমবে না।

সিদ্ধার্থ বলল, শালা জীবনটা আজ ধন্য হয়ে যাবে।

মণ্টু বলল, আগে জ্ঞান আসুক।

দিলীপ বলল, মনে হয় সহজে জ্ঞান আসবে না।

কী করা যায়?

মুখটা হাঁ করিয়ে মদ ঢেলে দে।

গুড আইডিয়া।

মণ্টু গিয়ে জুলিয়েটের মুখের কাছে বসল। তারপর মাইককে ডাকল, মাইক মুখটা হাঁ করা।

মাইক দু'হাতে জুলিয়েটের মুখটা হাঁ করাল। মণ্টু ঘাট করে খানিকটা মদ ঢেলে দিল জুলিয়েটের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট একটা গোঙানি তুলে নড়েচড়ে উঠল জুলিয়েট। তারপর চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

দিলীপ বলল, নে হয়ে গেছে।

মাইক বলল, লেটাস স্টার্ট।

মণ্টু বলল, না একে একে। এত সুন্দর জিনিসটা খুবলে খাওয়ার দরকার নেই।

দিলীপ বলল, হুঁ।

সিদ্ধার্থ বলল, আমি সবার শেষে। তোরা তো জানিস আমার ম্যালা টাইম লাগে।

মণ্টু বলল, প্রথমে আমি।

মাইক বলল, তা তো অবশ্যই।

তা হলে তোরা ওই দূরে, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়া।

ওরা তিনজন চলে যেতেই মোমটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল মণ্টু। তারপর যখন নিজের প্যান্ট খুলে জুলিয়েটকে জড়িয়ে ধরেছে তখন শুনতে পেল জুলিয়েট ফিসফিস করে বলছে, এণ্টনী, মাই লাভ।

শুনে মণ্টুর বুকটা জীবনে প্রথম বারের মত কেঁপে উঠল।

মণ্টুর পর গেল মাইক।

তারপর দিলীপ।

দিলীপের পর আবার মণ্টু।

মণ্টুর পর মাইক।

মাইকের পর দিলীপ।

সব শেষে গেল সিদ্ধার্থ।

ঘণ্টাখানেক পর সিদ্ধার্থ ফিরে এসে বলল, মণ্টু কেস খারাপ হয়ে গেছে।

কী?

ফিনিশ।

মানে?

মারা গেছে।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ।

মাইক বিচলিত গলায় বলল, এখন কী করবি মণ্টু?

দিলীপ বলল, আমরা এখানটায় বসি সবাই জানে। লাশটা এখানে ফেলে রাখলে সবাই বুঝে যাবে কাজটা আমাদের।

সিদ্ধার্থ বলল, বুঝলে কী হয়েছে?

শুনে মণ্টু ধমকে উঠল। চোপ ব্যাটা। অযথা ঝামেলা করে কী লাভ। জুলিয়েটের বাপ নাম করা উকিল।

মাইক বলল, চল লাশটা সরিয়ে ফেলি।

মণ্টু বলল, কোথায় সরাবি?

দিলীপ বলল, কবরস্থানটা হচ্ছে বেস্ট জায়গা। ম্যালা ভাঙাচোরা কবর আছে। একটার ভেতর ফেলে ঝোপ-ঝাড় আর ইঁট পাটকেল দিয়ে চাপা দিয়ে রাখব।

মাইক বলল, গুড আইডিয়া।

ওরা দু'জন জুলিয়েটের লাশ ধরল আর দু'জন গিয়ে কবরস্থানের পুরনো ভারি

লোহার গেটটা ঘড়ঘড় শব্দে খুলে ফেলল।

কবরস্থানে ঢুকে মোম জ্বালাল দিলীপ। তারপর জুলিয়েটের লাশটা ফেলে রেখে চারজন মিলে পুরনো ভাঙা কবর খুঁজতে শুরু করল।

জুলিয়েটের লাশ একটা ভাঙা কবরে শুইয়ে ওরা যখন ঝোপঝাড় তুলে, ইঁট পাটকেল খুঁজে চাপা দিচ্ছিল তখন ওদের খুব কাছেই, বড়সড় একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল কালো বিশালদেহী এক ছায়া।

ওরা কেউ তা দেখতে পেল না। ওরা কেউ তা টের পেল না।

জুলিয়েট যেদিন অদৃশ্য হয়েছিল, সেদিন রোববার। তারপর পুরো একটা সপ্তাহ ছোট্ট শহর চন্দনপুরের প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে রইল জুলিয়েটের অদৃশ্য হওয়া। শহরের লোক নানারকম গল্প তৈরি করে ফেলল জুলিয়েটকে নিয়ে। বেশিরভাগ লোকেরই ধারণা জুলিয়েটকে সেই রক্ত চোষা বাদুড়ে ধরেছিল। জুলিয়েটের রক্তপান করে ছিবড়ে করে তাকে ফেলে দেয়া হয়েছে খরগোসপুরের কোথাও। খরগোসপুরের খোলা প্রান্তর তন্নতন্ন করে খুঁজলে নিশ্চয় কোথাও না কোথাও জুলিয়েটের লাশ পাওয়া যাবে।

কিন্তু নিজের জান দিতে কে যাবে খরগোসপুরে জুলিয়েটকে খুঁজতে!

মণ্টুরা চারজন লোকের এই সব কথা শুনে নিঃশব্দে হাসত।

ওদিকে জুলিয়েট অদৃশ্য হয়ে যেতে তার মা বাবা দু'জনেই প্রায় বোবা হয়ে গেছেন। জুলিয়েটের বাবা কোর্টে যাওয়া ছেড়ে দিলেন, মা বাদ দিলেন স্কুলে যাওয়া। তাঁরা দু'জন কারও সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেন না। দোতলায় জুলিয়েটের ছোট্ট রুমে চুপচাপ বসে থাকেন। বাড়িতে কোন লোক এলে ডি কস্টা বলে দেয়, দেখা হবে না।

আর মণ্টুরা চারজন কবরস্থানের সেই বেদীটায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কী রকম একটা আতঙ্ক যেন পেয়ে বসেছিল তাদের চারজনকেই। জায়গাটার কথা মনে হলেই, ঘটনাটার কথা মনে হলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসত তাদের। জীবনে এতসব বাজে কাজ করেছে তারা, কত মেয়েকে এইভাবে মেরে গুম করে দিয়েছে, কখনও তো এমন হয়নি!

শহরে মণ্টুদের অত্যাচারও আশ্চর্যজনক ভাবে কমে গেল। লোকেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক, জুলিয়েট অদৃশ্য হয়ে অন্তত একটা শুভ কাজ করে দিয়ে গেছে।

পরের রোববার আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল চন্দনপুরে। রাতের বেলা।

মণ্টুরা চারজন সন্ধ্যের পর সেই রেস্তোরাঁ থেকে আড্ডা দিয়ে বেরিয়েছে। বেরিয়েই দিলীপ বলল, মণ্টু এখন কোথায় যাবি?

মণ্টু বলল, ভাল্লাগছে না। ভাবছি বাড়ি ফিরে যাব।

মাইক বলল, এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে কী করবি?

সিদ্ধার্থ বলল, চল কোথাও বসে একটু নেশা করি। সেদিনের পর তো আর খাওয়াই হলো না।

মণ্টু কেমন নির্জীব গলায় বলল, কোথায় বসবি?

সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ বলল, কবরস্থানের দিকে কিন্তু যাচ্ছি না।

মাইক বলল, ওদিকে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

সিদ্ধার্থ বলল, না ওদিকে না। অন্য কোথাও।

মণ্টু এবার ভাঙাচোরা গলায় বলল, আচ্ছা তোদের একটা কথা বলি। সেদিনকার ঘটনাটার কথা মনে হলেই এমন লাগে কেন রে! কী রকম একটা ভয় ধরে যায়। বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

মাইক বলল, আমারও।

সিদ্ধার্থ বলল, হ্যাঁ। জীবনে এরকম কেস কত করলাম, কখনও কিন্তু এমন মনে হয়নি। ঘটনাটা মনে পড়লেই বুকটা কেমন কাঁপতে থাকে। হাত পা অবশ হয়ে আসে।

দিলীপ বলল, সেদিনের পর থেকে শরীরে একদম শক্তি পাই না। একটু হাঁটা চলা করলে মনে হয় বছর খানেক অসুখে ভুগে উঠেছি। আর ওই জায়গাটার কথা, ঘটনাটার কথা মনে হলে শ্বাস-প্রশ্বাস কী রকম বন্ধ হয়ে আসে!

মণ্টু বলল, কিছু বুঝতে পারছি না শালা। মরে-টরে যাব নাকি রে আমরা!

সিদ্ধার্থ বলল, ধুৎ। চল, নেশা করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাইক বলল, কোথায় যাওয়া যায়?

দিলীপ বলল, বাবুয়ার ওখানে চল।

মণ্টু বলল, তা হলে ওখানে বসেই খাব।

ঠিক আছে।

বাবুয়ার ওখানে বসে রাত দুপুর অবধি আকণ্ঠ মদ্যপান করল ওরা। আজ কোন হুজ্জত করেনি। বাবুয়াকে গিয়ে শীতল গলায় মণ্টু বলেছে, মাল দে বাবুয়া। এখানে বসেই খাব। ঘাবড়াস নে। মাগনা খাব না। পাই পয়সাটিও হিসেব করে দিয়ে যাব। আর সপ্তাহে সপ্তাহে তোর যে চার বোতল করে দেবার কথা ছিল, সেটা দিতে হবে না।

মণ্টুর এ ধরনের কথা শুনে সঙ্গের তিনজন তো অবাক হয়েছিলই, সবচে' অবাক হয়েছিল বাবুয়া। এক সপ্তাহ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা সে ভুলতে পারেনি। নিজের অজান্তেই বাবুয়ার একটা হাত উঠে গিয়েছিল ঠোঁটে। কাটা ঠোঁটটা এখনও পুরোপুরি সারেনি বাবুয়ার।

বাবুয়া খুব খাতির তোয়াজ করে বসাল ওদের। তারপর বিদেশী বোতল বের করল। পরিষ্কার কাচের গ্লাস বের করল।

ওরা যে যার গ্লাসে মদ ঢেলে নিল। কিন্তু গ্লাসে মদ ঢালার সময় ওদের কারুরই একবারও মনে হলো না ওরা কখনও গ্লাসে ঢেলে মদ খায় না। বোতল থেকেই চুমুক দেয়।

আজ সবকিছু কেমন অদ্ভুত লাগছে।

গভীর রাতে বাবুয়ার পয়সা চুকিয়ে দিয়ে ওরা বেরুল। তখন চন্দনপুর মৃত শহর। বেশ্যাপাড়ার বাইরে একটি লোকও জেগে নেই।

ওরা জানে না, ওরা যখন রাস্তায় নেমেছে তখন ঠিক সেই সময়, গত

রোববার ঠিক এই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে ছিল জুলিয়েট।

ওরা চার মাতাল টালমাটাল পায়ে খরগোসপুরের দিকে চলে যাওয়া রাস্তায় উঠেছে, যাবে শহরের ভেতর দিকে—তখুনি কবরস্থানের ওদিকটায়, বেদীর পেছনকার দেবদারু গাছ থেকে কী একটা অচিন পাখির রক্ত হিম করা ডাক ভেসে এল। এরকম ডাক ওরা জীবনেও শোনেনি। সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে নেশা একদম ছুটে গেল ওদের।

চারজন এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। কারও মুখে কোন কথা নেই।

খোলা রাস্তায় জমে ছিল কুয়াশা। সেই কুয়াশার দিকে তাকিয়ে মণ্টু ফিসফিস করে বলল, জুলিয়েট, জুলিয়েট।

তারপর হঠাৎই ঝেড়ে কবরস্থানের দিকে দৌড় দিল। ওরা তিনজন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে দেখল তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে মণ্টু। সে রাতে যেমন করে ছুটে আসছিল জুলিয়েট।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেল মণ্টু। মুহূর্তে।

পরদিন মণ্টুর লাশ পাওয়া গেল কবরস্থানের সেই বেদীটায়। বেদীর ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে মণ্টু। যেমন করে সে রাতে পড়েছিল জুলিয়েট।

মণ্টুকে হত্যা করা হয়েছে তার পুরুষাঙ্গ কেটে। কে যেন খুব ধারাল কিছু দিয়ে মণ্টুর পুরুষাঙ্গ কেটে নিয়েছে। মণ্টুর রক্তে ভেসে গেছে বেদীটা। সে রাতে যেমন ভেসেছিল জুলিয়েটের রক্তে।

মণ্টুর মৃত্যুতে চন্দনপুরের কেউ বিন্দুমাত্র দুঃখিত হলো না। খুশি হলো। পালের গোদাটা গিয়েছে, ওদের মূল শক্তিটা কমে গেছে। এবার শহরটা শান্ত হবে। লোকে নিশ্চিন্তে ঘুমুবে, ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, সুখে শান্তিতে দিন যাপন করবে। যুবতী মেয়েরা আর আতঙ্কের মধ্যে থাকবে না।

তবে মণ্টুর মৃত্যুটা খুবই রহস্যজনক এবং নৃশংস বলে শহরে দু'একদিন খুবই আলোচনা হলো। কে এই খুনী, পুরুষাঙ্গ কেটে মণ্টুকে হত্যা করেছে।

শহরের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তৎপর হয়ে উঠল। গোয়েন্দা বিভাগ খোঁজ-খবর শুরু করল!

দিলীপদের তিনজনকে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা মণ্টু হত্যার রহস্য সম্পর্কে জেরা করে এল। তিনজনে একই ঘটনার কথা উল্লেখ করল। একই ভাবে। রাত দুপুরে শহরের বড় রাস্তায় ওঠার পরই কবরস্থানের বাইরে দেবদারু গাছে রক্ত হিম করা ডাক ডাকল কী একটা পাখি। সেই ডাকে ওরা চারজনই থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপরই মণ্টু হঠাৎ দৌড় দিল।

দৌড় দেয়ার আগে মণ্টু কি কিছু বলেছিল?

ওরা তিনজনেই বলেছে, না।

কিন্তু দৌড় দেয়ার আগে মণ্টু ফিসফিস করে দু'বার জুলিয়েটের নাম উচ্চারণ করেছিল। ওরা কেউ সে কথা বলল না কেন?

আসলে ওরা কিন্তু মণ্টুর 'জুলিয়েট জুলিয়েট' কথাটা শুনতেই পায়নি। মণ্টু কেবল নিজেই শুনেছিল।

আরেকটা অনিবার্য প্রশ্ন তিনজনকেই করেছিল গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা—আপনাদের প্রিয় বন্ধু ওরকম গভীর রাতে একাকী দল থেকে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে ছুটতে শুরু করল, আপনারা কেন তার পিছু পিছু ছুটলেন না? কেন তাকে ধরলেন না? দৌড়ে সে কোথায় গেল কেন দেখলেন না?

ওরা তিনজনে একই কথা বলেছে। একটুও এদিক ওদিক হয়নি কারও বক্তব্য। যেন একই গান ভিন্ন ভিন্ন তিনজন শিল্পী গাইছে। মণ্টুর দৌড় দেয়া দেখে আমাদের শরীর একদম অবশ হয়ে গিয়েছিল। বুক খুব কাঁপছিল। শরীরে একবিন্দু শক্তি ছিল না। মনে হচ্ছিল মাটির ভেতর দু'পা পুঁতে রাখা হয়েছে আমাদের। হাঁটা চলার শব্দ ছিল না। তা ছাড়া মণ্টু এবং আমাদের মাঝখানে কী রকম কালো একটা দেয়াল যেন ছিল। যখন কুয়াশার ভেতর মণ্টু হারিয়ে গেল তখন কী যে ভয় আমাদের পেয়ে বসল, আমরা পাগলের মত যে যার বাড়ির দিকে দৌড় দিয়েছিলাম।

তিনজনের মুখে হুবহু একই কথা শুনে চিন্তিত মুখে ফিরে গিয়েছিল গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা। এরকম রহস্যজনক মৃত্যু তো তারা আগে কখনও দেখেইনি, শোনেওনি কোনদিন।

মণ্টুর মৃত্যুর পর দিলীপরা তিনজন খুব ভড়কে গেল। কী রকম একটা আতঙ্ক পেয়ে বসল তাদেরকে। দু'তিন দিন বাড়ি থেকেই বেরুল না কেউ। তারপর একে অন্যের বাড়ি গিয়ে দেখা করতে লাগল। সেই ব্যবসাকেন্দ্রের রেস্তোরাঁ এবং সান্ধ্যকালীন রেস্তোরাঁয় বসা তারা একদম ছেড়ে দিল। সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকেও বেরোয় না।

কিন্তু কী যেন কী কারণে পরের রোববার সন্ধ্যেবেলা একে একে তিনজনই এসে হাজির হলো সেই রেস্তোরাঁয়। এবং একজন আরেকজনকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

প্রথমে এসেছিল মাইক। এসে নির্দিষ্ট টেবিলটায় বসতে যাবে, ঠিক তখুনি এল দিলীপ। মাইক ফ্যাল ফ্যাল করে দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়েছে, তখুনি সিগ্রেট টানতে টানতে ঢুকল সিদ্ধার্থ।

একে অন্যকে দেখে খানিক কোন কথা বলতে পারল না ওরা।

বেয়ারা চার কাপ চা দিয়ে গেল। তিনজন মানুষ, চা চার কাপ কেন?

বেয়ারা ব্যাপারটা খেয়াল করতে পারেনি। অভ্যেস।

মণ্টু যে নেই, চায়ের কাপ দেখেই ওদের যেন মনে পড়ে গেল। আনমনে ওরা যে যার চেয়ারে বসল। মণ্টুর নির্দিষ্ট চেয়ারটা খালি। সামনে টেবিলের ওপর ধূমায়িত চায়ের কাপ।

ওরা নিঃশব্দে চা পান করতে লাগল।

এক সময় মাইক বলল, আমার মনটা আজ কী রকম যেন লাগছে।

দিলীপ বলল, কী রকম?

ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

সিদ্ধার্থ বলল, মণ্টুর ব্যাপারটায় আমরা খুব আপসেট হয়ে গেছি।

দিলীপ বলল, হ্যাঁ, এতটা মুষড়ে পড়ার মানে হয় না।

মাইক বলল, কী করব?

সিদ্ধার্থ বলল, চল আবার আগের মত সব শুরু করি।

দিলীপ বলল, তাই করা উচিত।

সিদ্ধার্থ তখন কেন যে বলল, চল আজ থেকেই।

মাইক বলল, আজ থেকে মানে?

এখান থেকে বেরিয়ে চল বাবুয়ার ওখানে যাই। ভরপেট নেশা করলেই দেখবি কাল থেকে সব ঠিক হয়ে গেছে।

দিলীপ বলল চল।

কিন্তু ওরা যখন রেস্তোরাঁ থেকে বেরুল, কেউ জানে না—মাইকের বুকটা তখন কী রকম একটু কেঁপে উঠেছিল।

কথাটা কাউকে বলতে পারল না মাইক। বলতে চাইল কয়েকবার। কিন্তু প্রত্যেক বারই স্বরনালীটা চেপে ধরে রাখল কে যেন।

মৃতের মত দিলীপ সিদ্ধার্থের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বেশ্যাপাড়ায় বাবুয়ার দোকানে গিয়ে হাজির হলো মাইক।

কিন্তু বাবুয়ার দোকানে হাজির হয়েই মাইকের আচরণ মণ্টুর সেদিনকার আচরণের মত হয়ে গেল। মাইক বাবুয়াকে ঠিক মণ্টুর সেদিনকার কথাগুলো বলল, মদ খেয়ে পাই পয়সাটিও হিসেব করে দিয়ে যাব—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবুয়া সেদিনকার মত খাতির তোয়াজ করেই বসাল ওদের। বিদেশী মদ এল, গ্লাস এল। রাত দুপুর অবধি মদ্যপান করল ওরা।

তারপর ওরা একসময় বেরুল। বেরিয়ে যখন খরগোসপুরের দিকে যাওয়ার রাস্তায় উঠল, তখন সেই সময়। দু'সপ্তাহ আগের ঠিক এই সময় জুলিয়েট ঘর থেকে বেরিয়েছিল।

রাস্তায় ওঠার পরই ঘটল ঘটনাটা। কবরস্থানের দেবদারু গাছ থেকে রক্ত হিম করা ডাক ডেকে উঠল সেই অচিন পাখি।

ওরা তিনজন থমকে দাঁড়াল। নেশা একদম ছুটে গেল ওদের।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাইক ফিসফিস করে বলল উঠল, জুলিয়েট, জুলিয়েট।

মাইক নিজে ছাড়া সেই ডাক অন্য কেউ শুনতে পেল না।

তারপর, সেদিন মণ্টু যেমন করে ছুটেছিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে, পাগলের মত—মাইক হঠাৎ তেমন করে কবরস্থানের দিকে দৌড় দিল। দিলীপ এবং সিদ্ধার্থ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল মাইক।

পরদিন কবরস্থানের সেই বেদীতে মাইকের লাশ পাওয়া গেল। মণ্টুর মত তারও পুরুষাঙ্গ কেটে নেয়া হয়েছে।

মাইকের মৃত্যুতে চন্দনপুরের লোকজন কিন্তু খুশি হলো না। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। ঠিক একই জায়গায়, একই ভাবে এক সপ্তাহ আগে পরে দু'বন্ধুর নৃশংস খুন—ব্যাপারটা ভয়াবহ।

শহরের সাধারণ নাগরিকরা দিশেহারা হয়ে পড়ল। গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা বিব্রত। দুটো হত্যাকাণ্ড ঘটেছে একই জায়গায়, একই ভাবে। এবং

দু'বারই রোববার রাতে।

গোয়েন্দা বিভাগ আরও তৎপর হয়ে উঠল। দিলীপ এবং সিদ্ধার্থের জবানবন্দী নিল ওরা। ওরা দু'জন মণ্টুর ব্যাপারে যে জবানবন্দী দিয়েছিল মাইকের ব্যাপারেও ঠিক একই কথা বলল। দু'জন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসে জবানবন্দী দিল, কিন্তু দু'জনের কথার এক চুলও এদিক ওদিক হলো না। একটি শব্দও এদিক ওদিক হলো না।

গোয়েন্দা বিভাগ চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা অনুমান করল আসছে রোববার রাতেও এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটবে। দিলীপ কিংবা সিদ্ধার্থের মধ্যকার কেউ একজন মণ্টু অথবা মাইকের মত খুন হবে।

এ অবস্থায় কী করা যায়।

দিলীপ এবং সিদ্ধার্থের বাড়ি থেকে বেরুনো সম্পূর্ণ মানা করে দিল তারা। পালিয়ে যাতে না বেরুতে পারে এজন্যে দু'জনের বাড়ির ভেতর এবং বাইরে, আশপাশে পাহারা বসাল। এবং আর একটা কাজ করল, কবরস্থানটার চারপাশে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রচুর লোক চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় থাকার ব্যবস্থা করল।

তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল তৃতীয় হত্যাকাণ্ডটিও এখানেই ঘটবে। সেটা যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য প্রতি মুহূর্তে সতর্কতা অবলম্বন করল তারা।

কিন্তু এত কিছুর পরও দিলীপের মৃত্যু ঠেকানো গেল না।

এটা চতুর্থ রোববারের কথা।

সন্ধ্যেরাতেই শুয়ে পড়েছিল দিলীপ। মাইক খুন হওয়ার পর বাড়ি থেকে বেরুনো নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার। পালিয়ে বেরুবার কোন পথ নেই। দিলীপদের বাড়ির চারপাশে গোয়েন্দা বিভাগের লোক দিনরাত, চব্বিশ ঘণ্টার পাহারায় নিয়োজিত। তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এই বাড়ি থেকে একটি ছুঁচও গলে বেরুতে পারবে না।

অবশ্য বাড়ি থেকে বেরুবার কোন ইচ্ছেও ছিল না দিলীপের। মণ্টু এবং মাইকের ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর সে মারাত্মক ভয় পেয়ে গেছে। চৌপর দিন, নিজের ঘরে গুটিসুটি বসে থাকে সে। কারও সঙ্গে তেমন কথা বলে না। বাড়ির লোক তিনবেলা তার ঘরে খাবার দিয়ে যায়। সেই সব খাবারের সামান্যই গ্রহণ করে সে। হয় চুপচাপ হাঁটু মুড়ে খাটের ওপর বসে থাকে। নয়তো শুয়ে।

কিন্তু সিগ্রেট খাওয়াটা এই সাতদিনে সাংঘাতিক রকম বেড়ে গেছে তার। প্রতি পাঁচ মিনিটে একটা করে সিগ্রেট ধরাচ্ছে। সিগ্রেটের ছাই এবং ফিল্টারে ঘরের মেঝে ভরে গেছে।

সাতদিনে দিলীপ একটা মিনিটও ঘুমাতে পারেনি। ঘুমের চেষ্টা করেছে। হয়নি।

সেদিনও সন্ধ্যের দিকে শুয়েছে। ঘুম আসেনি। শুয়ে শুয়ে সিগ্রেট টেনেছে।

একটা সময় তন্দ্রামত এসেছিল।

তখন... তখন সেই সময়। জুলিয়েট যে সময়...

হঠাৎই কবরস্থানের দেবদারু গাছ থেকে রক্ত হিম করা সেই অচিন পাখির

ডাক এল দিলীপের কানে। পাগলের মত বিছানায় উঠে বসল দিলীপ। তারপর ফিসফিস করে দু'বার বলল, জুলিয়েট, জুলিয়েট।

তারপর দরজা খুলে বাইরে এল দিলীপ। গেট খুলে রাস্তায় এল। একসময় ঊর্ধ্বশ্বাসে, পাগলের মত কবরস্থানের দিকে ছুটতে শুরু করল।

পরদিন দিলীপের লাশ পাওয়া গেল কবরস্থানের সেই বেদীতে। মণ্টু মাইকের মত পুরুষাঙ্গ কেটে হত্যা করা হয়েছে দিলীপকে।

এই ঘটনায় গোয়েন্দা বিভাগের মাথা খারাপ হয়ে গেল। এটা কী করে সম্ভব? দিলীপকে বাড়ি থেকে বের করে নেয়া হলো কেমন করে? বাড়ির ভেতর এবং চারপাশে চারজন গোয়েন্দা পাহারায় ছিল। তাদের চোখ কেমন করে ফাঁকি দিল আততায়ী!

না হয় এই চারজনকে ফাঁকি দিলই, কবরস্থানের চারপাশে ছিল একেক গ্রুপে দু'জন করে পাঁচটি সশস্ত্র পাহারাদার। তাদের চোখের ওপর কেমন করে ঘটল ঘটনাটা!

মোট চোদ্দজন পাহারাদারের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে জেরা করা হলো। তাতে অদ্ভুত একটা ফল পাওয়া গেল। চোদ্দজনের প্রত্যেকে একই কথা বলল। দাঁড়ি কমা সহ।

সেই রাতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিটি পাহারাদার সম্পূর্ণ অন্ধ বধির এবং বোবা হয়ে গিয়েছিল। যে যেখানে যেভাবে ছিল, পাথরের মূর্তির মত জমাট, স্থবির হয়ে গিয়েছিল তারা।

পাথরের মূর্তির কি নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে!

যখন পুনরায় মানুষে রূপান্তরিত হয় তারা, তখন নিজেদের মধ্যে হৈ-হল্লা ছুটোছুটি পড়ে গিয়েছিল। দিলীপদের বাড়ির চারজন ছুটে গেছে কবরস্থানের বেদীতে। কবরস্থানের চারপাশে দশজন এসে উপস্থিত হয়েছে বেদীতে। তারা দেখতে পেয়েছিল দিলীপের লাশ পড়ে আছে। পুরুষাঙ্গ কেটে নেয়া হয়েছে তার। রক্ত তখনও জমাট বাঁধতে পারেনি।

শুনে গোয়েন্দা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বোবা হয়ে গেল।

তা হলে এবার কি সিদ্ধার্থের পালা?

খুনীর কার্যকলাপে তো মনে হয় এই দলের একজনকেও ছাড়বে না সে।

কিন্তু কেমন করে সম্ভব হলো ব্যাপারটা?

অলৌকিক ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। কিন্তু দিলীপের ঘটনায় তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো—এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিশ্চয় কোন অলৌকিক ব্যাপার জড়িত।

এটা কি তা হলে খরগোসপুরের তথাকথিত সেই রাজার কাজ। চারশো বছর ধরে যে রক্তচোষা বাদুড় হয়ে আছে!

গোয়েন্দা বিভাগ ভীত হয়ে পড়ল। সিদ্ধার্থের ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নিল—সিদ্ধার্থকে এই শহর থেকে বহুদূরে কোথাও সরিয়ে দেয়া হবে।

সিদ্ধার্থের মৃত্যু ঠেকাবার সেটাই একমাত্র পথ।

দুপুরবেলা হোস্টেলে ফিরে, খাওয়া-দাওয়া সেরে এণ্টনীর একটু গড়িয়ে নেয়ার অভ্যেস। সেদিনও গড়িয়ে নিচ্ছিল। বিকেল প্রায় হয়ে আসছে। তখুনি এণ্টনীর মনের ভেতর থেকে সম্পূর্ণ অচেনা একটা মানুষ বলল, এণ্টনী তুমি এক্ষুণি চন্দনপুর যাও। সেখানে তোমার জন্যে অনেক রহস্য অপেক্ষা করছে।

শুনে এণ্টনী খুব চমকে উঠল। তার মনে পড়ল জুলিয়েটের কথা। এবং জুলিয়েটের কথা মনে পড়তেই সে কী রকম যেন উতলা হয়ে পড়ল। তার আর কিছুই মনে থাকল না।

বিছানা থেকে উঠে জামা কাপড় পরল সে। আলনায় যে সব কাপড়-চোপড় ছিল সেগুলো একটা কাঁধে ঝুলানো ব্যাগে ভরে নিল। টাকা পয়সা সব মানি ব্যাগেই থাকে এণ্টনীর। মানিব্যাগটা পকেটে নিয়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হোস্টেল থেকে বেরুল সে।

এণ্টনীর কলেজ খোলা। বড় দিনের ছুটি হবে বেশ কিছুদিন 'পর। এসময় ক্লাশ কামাই করা খুবই অন্যায়। কিন্তু সেসব কথা কিছুই মনে থাকল না এণ্টনীর।

কী রকম একটা ঘোরের মধ্যে স্টেশনে এসে ট্রেনে চড়ল সে। সারারাত ট্রেনের জানালার ধারে বসে রইল। কোন যাত্রীর সঙ্গে একটাও কথা বলল না। একবারও বাথরুমে গেল না। রাতের খাবার খেলো না। এমন কী একটা সিগ্রেট খাওয়ার কথাও মনে হলো না তার।

পুরদিন সকালবেলা চন্দনপুর স্টেশনে নেমে এণ্টনীর মনে হলো সম্পূর্ণ একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে এই দীর্ঘ পথটা পেরিয়ে এসেছে সে।

চন্দনপুর স্টেশনে নামার সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল তার। এবং সেই মুহূর্তে এণ্টনী খুব চমকে উঠল। সে কেমন করে চন্দনপুর চলে এল। এটা কি স্বপ্ন?

চিন্তিত ভাবে এণ্টনী একটা সিগ্রেট ধরাল। সিগ্রেটে টান দেয়ার পর ভীষণ খিদে টের পেল এণ্টনী।

কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল। তারপর নাস্তাটাস্তা খেয়ে যখন বেরুবে, তখন দেখে তিন চারজন অচেনা লোকের সঙ্গে সিদ্ধার্থ এসে ঢুকছে সেই রেস্তোরাঁয়।

সিদ্ধার্থকে দেখে কী রকম একটু চমকে উঠল এণ্টনী। তার মনের ভেতর বসে সম্পূর্ণ অচেনা এক মানুষ ঠা ঠা করে হেসে উঠল।

সিদ্ধার্থকে প্রথমে চিনতেই পারেনি এণ্টনী। ওরকম জাঁদরেল ছেলে সিদ্ধার্থ, ওদের গ্রুপের নামে শহর কাঁপে—তাকে কী রকম দুর্বল এবং ভীত সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে। কাঁধে ব্যাগ। সিদ্ধার্থ কি কোথাও—

সিদ্ধার্থের দিকে এগিয়ে গেল এণ্টনী।

এণ্টনীকে দেখে সিদ্ধার্থ কী রকম কেঁপে উঠল। এণ্টনী ব্যাপারটা খেয়াল না করে বলল, কী সিদ্ধার্থ, কোথাও যাচ্ছ নাকি?

সিদ্ধার্থ ঢোক গিলে বলল, হ্যাঁ। কিছুদিন শহরের বাইরে থাকতে হবে।

কেন?

এই শহরে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। আমি ছাড়া আমাদের গ্রুপের বাকি তিনজন খুন হয়ে গেছে।

বলো কী? কেমন করে?

তিনজনকেই পুরুষাঙ্গ কেটে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করে কবরস্থানের বেদীটায় ফেলে রাখা হয়েছে।

কবে?

পরপর তিন রোববার তিনজন। এ রোববার নিশ্চয় আমার পালা, এজন্যে শহর ছেড়েই চলে যাচ্ছি।

এন্টনী চিন্তিত মুখে বলল, অদ্ভুত ব্যাপার তো!

সিদ্ধার্থ বলল, তোমার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে এন্টনী।

কী রকম?

জুলিয়েট নিখোঁজ।

মানে?

জুলিয়েটকে মাসখানেক ধরে পাওয়া যাচ্ছে না।

আসল কথাটা চেপে গেল সিদ্ধার্থ।

কিন্তু সিদ্ধার্থের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এন্টনী পাগলের মত জুলিয়েটদের বাড়ির দিকে ছুটল। আর কোন দিকে ফিরেও তাকাল না।

ছুটতে ছুটতে এন্টনী এল জুলিয়েটদের বাড়ির কাছে। তারপর জুলিয়েট জুলিয়েট বলে চিৎকার করতে করতে দোতলায় জুলিয়েটের রুমে চলে এল।

জুলিয়েটের রুমে চুপচাপ, পাথরের মূর্তির মত বসেছিল জুলিয়েটের মা বাবা। এন্টনীকে দেখে প্রথমে একটু নড়েচড়ে উঠল তারা। তারপর হাউ-মাউ করে কান্না শুরু করল—জুলিয়েট মাই চাইল্ড।

এন্টনী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

শহরের পুবদিকে, শেষপ্রান্তে নিরিবিলি সুন্দর একটা পার্ক। পার্কের একটা নির্দিষ্ট বেঞ্চে জুলিয়েটকে নিয়ে প্রায়ই এসে বসত এন্টনী।

আজও বসেছিল। তবে একা। জুলিয়েটকে কোথায় পাবে এন্টনী!

জুলিয়েটদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এন্টনী আর নিজের বাড়ি যায়নি। কাঁধের ব্যাগটি কোথায় পড়ে গেছে, মনে নেই। এন্টনী এসে বসেছে পার্কের সেই বেঞ্চে। বসে বসে সারাদিন কেঁদেছে। মনে মনে কতবার যে জুলিয়েটকে ডেকেছে। জুলিয়েট, জুলিয়েট আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেলে তুমি!

এভাবে কখন সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে উঠেছে খেয়াল নেই এন্টনীর। হঠাৎ মাথায় কার হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল এন্টনী। কাঁদতে কাঁদতে ফুলে গেছে তার মুখ, চোখ। সে রকম ফোলা মুখ তুলে তাকাল এন্টনী।

বিশালদেহী ফাদার যোসেফ দাঁড়িয়ে আছেন এন্টনীর সামনে। সাদা আলখাল্লা পরা। মুখটা খুব গম্ভীর তাঁর।

ফাদার যোসেফকে এভাবে, এত কাছ থেকে কখনও দেখেনি এন্টনী। এই প্রথম দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল সে। বিশাল দেহের অধিকারী ফাদার

যোসেফ।

ফাদার যোসেফকে দেখে কেন যে চোখ ফেটে আবার কান্না এল এন্টনীর। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে এন্টনী শুধু বলল, ফাদার, জুলিয়েট—

এন্টনীর মাথায় হাত রেখে ফাদার বললেন, আমি সব জানি। তোমার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসাই মেয়েটির মৃত্যুর কারণ।

শুনে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল এন্টনী। ফাদার, জুলিয়েট—

ইয়েস মাই চাইল্ড। সি ওয়াজ কিল্ড।

কে, ফাদার কে আমার জুলিয়েটকে—আবার কাঁদতে শুরু করল এন্টনী।

ফাদার বললেন, যারা জুলিয়েটকে হত্যা করেছে তাদের তিনজনই জুলিয়েটের হাতে খুন হয়ে গেছে। আর একজন বাকি আছে। আসছে রোববার রাতে সেও খুন হবে।

ফাদারের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে এন্টনী বলল, সিদ্ধার্থরা?

হ্যাঁ।

কেন ফাদার, কেন?

এক রোববার রাতে, ঘুমুবার আগে জুলিয়েট খুব করে তোমার কথা ভাবছিল। তারপর নিশিরাতে ঘুমের ভেতর সে তোমার ডাক শুনতে পেয়েছে। সেই ডাক জুলিয়েটকে টেনে নিয়েছিল কবরস্থানের ওদিকে। কবরস্থানের বেদীতে বসে মদ খাচ্ছিল মণ্টুরা চারজন। জুলিয়েটকে ছুটে যেতে দেখে ওরা জুলিয়েটকে ধরে। কবরস্থানের বেদীতে রেপ করে জুলিয়েটকে ওরা হত্যা করে। তারপর কবরস্থানের ভেতর একটা ভাঙা কবরে ঝোপঝাড় ইঁট পাটকেল দিয়ে চাপা দিয়ে রাখে। এভাবে খুন হয়েছে বলেই জুলিয়েটের আত্মা এখনও চন্দনপুর ছেড়ে যায়নি। একে একে প্রতিশোধ নিচ্ছে সে। আর মাত্র একটা কাজ বাকি আছে তার সেটা এই রোববার ঘটবে।

এন্টনী ভাঙাচোরা গলায় বলল, সিদ্ধার্থ?

হ্যাঁ।

কিন্তু সিদ্ধার্থ তো আজই শহর ছেড়ে চলে গেল।

শুনে ফাদারের মুখে কী রকম একটা হাসি ফুটে উঠল। যেখানেই যাক, যতদূরে—রোববার রাতে ঠিক ওই বেদীতে ফিরে আসতে হবে সিদ্ধার্থকে। এবং তাকেও মণ্টুদের মত পুরুষাঙ্গ কেটে হত্যা করবে জুলিয়েট। তারপর জুলিয়েটের আত্মা চন্দনপুর ছেড়ে যাবে।

এন্টনী এবার কেমন করে যেন বলে ফেলল, ফাদার আপনি—

আমি সব জানি। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। আমি অনেক ঘটনা আগে জেনে যেতে পারি। কী ঘটবে বলে দিতে পারি। জুলিয়েট যে রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, আমি যখন টের পেয়েছি—ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। কালো আলখাল্লা পরে ছুটে গেছি কবরস্থানে। ওরা তখন কবর চাপা দিচ্ছে জুলিয়েটকে। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখেছি। এবং সেই মুহূর্তেই জেনে গেছি জুলিয়েটের হাতে ওরা চারজনই খুন হবে। পরপর চার রোববার। তিনজন গেছে। এই রোববার সিদ্ধার্থ যাবে। তুমি কেঁদো না এন্টনী। এটাই জুলিয়েটের নিয়তিতে

ছিল।

তারপর পার্কের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন ফাদার যোসেফ। এন্টনী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

অতঃপর ফাদার যোসেফের কথাই সত্য হয়েছিল। রোববার রাতে খুন হলো সিদ্ধার্থ। পরের দিন কবরস্থানের বেদীতে সিদ্ধার্থের লাশ পাওয়া গেল। মন্টুদের মত তারও পুরুষাঙ্গ কেটে নেয়া হয়েছে।

চন্দনপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিল সিদ্ধার্থ। কখন, কীভাবে ফিরে এসেছিল, খুন হয়েছিল—সেটা চিরকালের রহস্য হয়ে থাকল।

ইমদাদুল হক মিলন

রক্ততৃষ্ণা

কার্পেথিয়ায় যাওয়ার রাস্তা একটাই।

দু'দিক খোলা লাল গাড়িটা ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে দুর্গম পথ বেয়ে। সামনের উঁচু আসনে বসে সাঁই সাঁই চাবুক চালাচ্ছে কোচোয়ান রোজারিও। ঘোড়া দুটো ভারি তেজী। চাবুকের বাড়ি খেয়ে প্রাণপণে ছুটছে।

পাহাড়ের পুব ঘেঁষে রাস্তাটা চলে গেছে কার্পেথিয়ার শেষ প্রান্তে। শীতকালের চমৎকার দিন। পরিষ্কার নীল আকাশ। চারদিকে মিষ্টি রোদ। নিশ্চিন্ত মনে গাড়ি চালাচ্ছে রোজারিও, কিন্তু নজর তীক্ষ্ণ। লক্ষ করছে কোথায়, কেমন বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। মৃদু হাসি ওর ঠোঁটে। ছইয়ের ভিতর বসে আছে ওর যাত্রীরা। চোখ বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে। দেখেই বোঝা যায়—দীর্ঘ যাত্রায়, পথশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন।

গাড়িটা এবার ঢাল বেয়ে খাড়া ভাবে উঠতে শুরু করল। সে সঙ্গে দু'ধারের দৃশ্য বদলাতে শুরু করল। জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে গাড়ি। জঙ্গল অত্যন্ত নিবিড়। এদিকের গাছগুলো আরও মোটা এবং উঁচু। ঝোপঝাড়গুলো আরও ঘন। এ বনভূমিতে যেন কোন দিন মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্য ডুবু ডুবু। পাতার ফাঁক দিয়ে রোদের অসংখ্য টুকরো এখন ঝিলমিল করছে না। গাঢ় ছায়া নামছে জঙ্গলে।

সামনের পথের দিকে চাইল রোজারিও। এই রাস্তা ধরে পুরো তিন মাইল গেলে কার্পেথিয়ায় পৌঁছানো যাবে।

জঙ্গলে ঢুকলেই সবকিছু নিরর্থক মনে হয় ওর। যদিও এদেশে নতুন নয় সে। বরং বহুদিন এ রাস্তায় আসা-যাওয়া করে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবুও জঙ্গলে ঢুকলেই সহজাত প্রবৃত্তির বশে সে প্রতিবারই টের পায় বিপদ সংকেত, কেন জানি একটা অস্পষ্ট ভয় চেপে বসে মনে, কুঁকড়ে আসে সর্বশরীর।

ঠাণ্ডা হাড় কাঁপানো একটা বাতাস বয়ে গেল খড়খড় শব্দে শুকনো পাতা উড়িয়ে। কাঁটা দিয়ে উঠল রোজারিওর গা। লাগামে হ্যাঁচকা টান মেরে গাড়ি দাঁড় করাল। ছুটন্ত গাড়ি হঠাৎ থেমে যেতে তারস্বরে প্রতিবাদ জানাল ঘোড়া দুটো।

'কী হলো,' ছইয়ের ভিতর থেকে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল জনি। কোন উত্তর দিল না রোজারিও। স্তব্ধ হয়ে গেছে ও।

বুকের ওপর ক্রশ আঁকতে শুরু করল সে। বিড় বিড় করে কী যেন বলছে আপন মনে।

বুড়ো চাষী কেইন ঠিকই বলেছিল, ভাবল সে, এই জঙ্গলে সন্ধ্যার পর চলাফেরা করা উচিত না। শির শির করে একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে।

ড্রাকুলা! কাউন্ট ড্রাকুলা নাকি ঘুরে বেড়াত এই জঙ্গলে। কিন্তু সে তো অনেক আগের কাহিনি। হাত দুটো পরস্পরের সাথে ঘষে সাহস ফিরিয়ে আনতে চাইল

সে। তারপর সাঁই সাঁই চাবুক চালাল ঘোড়ার ওপর। লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল ঘোড়া।

ঘোড়ার গাড়িটা যেন এবার উড়ে চলল। চিঁহিহি...চিঁহিহি—বনভূমি সচকিত করে ছুটে চলেছে তেজী ঘোড়া।

হাঁ করে চেয়ে রইল জনি। এতজোরে ছোটে ঘোড়া, স্বপ্নেও ভাবেনি। মনে হচ্ছে যেন মাটি স্পর্শ করছে না গাড়ির চাকা, উড়ে চলেছে শূন্য দিয়ে। বিস্মিত জনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরে নজর দেয়ার চেষ্টা করল। সব কিছু কেমন যেন অবাস্তব লাগছে ওর কাছে। জঙ্গলের রাস্তায় জমে আছে বারো ইঞ্চি ধুলোর স্তর। বিতিকিচ্ছিরি কারবার। কাঁচা রাস্তার অসম্ভব ঝাঁকুনি, তার ওপর ধুলোর পাহাড় ধাওয়া করছে, মাঝে মাঝেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে ছইয়ের ভিতর।

বনভূমিটা পেরিয়ে এল ওরা সন্ধ্যার একটু পরেই, ঢুকে পড়ল জনপদে। সিকি বর্গমাইল পরিষ্কার জায়গা জুড়ে গোটা পঞ্চাশেক ঘর নিয়ে একটা ছোট গ্রাম। চুপচাপ, নিরিবিলি শান্ত পরিবেশ। ছোট্ট একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন এক গির্জা। কমপক্ষে দুশো বছর হবে বয়স। সরাইখানার সামনে গিয়ে থেমে গেল ঘোড়ার গাড়ি। লাল রঙের চকচকে একটা দালান। চারটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে ঘোড়া রাখার জায়গায়। লোকজন খুব কম রাস্তায়। গাড়ি থেকে নেমে এল চার আরোহী। দুই যুবক, দুই যুবতী। সবচেয়ে বেশি বয়স জেমসের, পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। স্বাস্থ্য মজবুত, চওড়া কাঁধ, শক্ত চোয়াল। রঙিন হাতাওয়ালা সার্টের ওপর জ্যাকেট পরা। লম্বা, প্রায় সাড়ে ছয় ফুটের কাছাকাছি। নিরুত্তাপ একটা ভঙ্গি মুখে।

ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে জনি। ফর্সা গায়ের রঙ, খয়েরী চোখের মণি। ছিমছাম, পরিষ্কার দামী নীল সুট পরনে। প্রশস্ত কপালে প্রতিভার ছাপ। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। জেমসের তুলনায় একটু বেঁটে। তবে স্বভাবে সম্পূর্ণ উল্টো। জেমস রাশভারী, গম্ভীর, আর জনি হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল। হাসি তামাশাকে কেউ হালকা ভাবে নিতে না পারলে রাগ লাগে ওর। আর সেজন্যেই জেমসকে তেমন পছন্দ করে না ও। যদিও জেমস ওর আপন বড় ভাই।

'জনি,' কানের কাছে ফিসফিস করে বলল শেলী গ্রে, 'ঢুকে পড়ি চলো। দারুণ খিদে পেয়েছে।'

শেরী গ্রে জনির বউ। তেইশ চব্বিশ বছর বয়স হবে। বেশ লম্বা। পরনে লাল প্যান্ট, সাদা সার্ট। ববড চুল, মুখটা গোল, চেহারায় লাবণ্য। নীল চোখে কৌতুকের হাসি সব সময় খেলা করে। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে লিলি কেইন। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কোচোয়ানের দিকে। মালপত্র নামাচ্ছে লোকটা। লিলি কেইন স্বভাবে ঠিক জেমসের মতই। স্বামী-স্ত্রী মিলেছে ভাল। বয়স পঁচিশ, সজীব ত্বক, গাল দুটো লালচে, লম্বায় পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি। মুখে সব সময় বিরক্তির ভাব। মালপত্র নামানো শেষ হতেই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল চার আরোহী। ভেতরে যথেষ্ট আলো। বেশ কিছু লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। কেউ খাচ্ছে, কেউ তাস পেটাচ্ছে, কেউ-বা স্রেফ গাল গল্প করছে। ওরা সরাইখানার ভেতরে ঢুকতেই বদলে গেল ঘরের পরিবেশ। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে নবাগত

অতিথিদের দিকে। জনি বুঝল, ওদের দামী কাপড়চোপড় সবার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। হয়তো দামী পোশাক পরা অতিথি খুব কমই আসে এই অখ্যাত গ্রামের সরাইখানায়।

মৃদু হাসল জনি, তারপর একটা টেবিলের চারপাশে চেয়ার টেনে গোল হয়ে বসে পড়ল সবাই। পরিষ্কার ঝকঝকে টেবিলে খাবার পরিবেশন করল স্বয়ং বুড়ো মালিক।

কোন কথা না বলে, খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। খাওয়া শেষ হতে সবুজ একটা ট্রে নিয়ে এল বুড়ো মালিক। ট্রেতে পাশার ছক। ইঙ্গিতে আহ্বান জানাল মালিক। ঘুটি চালল জনি। জিতে গেল। আবার চালল, আবার জিতল। তারপর কয়েক দান কেবল জিতেই গেল। হৈ চৈ পড়ে গেল সারা সরাইখানায়। সবাই উঠে এসে অভিনন্দন জানাচ্ছে জনিকে। আন্তরিক হাসি হাসছে দাঁত বের করে। শেষ দানটা জিতেই দর্শকদের দিকে ফিরল জনি, একজন বয়স্ক লোক বেছে নিয়ে বলল, 'সবাই ইচ্ছে মত মদ খান। সব খরচ আমার।'

মুহূর্তে বদলে গেল ঘরের পরিবেশ। নাচতে নাচতে, হাসতে হাসতে, কাউন্টারের দিকে ছুটল সবাই। ওখানে মদের বোতলগুলো সাজানো আছে থরে থরে।

'জনি,' ফিসফিস করে বলল লিলি কেইন। 'বলা উচিত নয়, তবুও বলছি, খামোকা গাঁটের কড়ি খরচ করে ওদের মদ খাওয়াচ্ছ। ওরা তোমাকে স্রেফ আহাম্মক ছাড়া অন্য কিছু ভাবছে না।'

খাবার ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল জনি। 'ভাবী, ভুল বুঝেছ। ওরা কে, কী ভাবছে তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই আমার। আমি ওদের খাইয়ে আনন্দ পাচ্ছি, এটাই বড় কথা। ভাইয়া, তুমি কী বলো?'

ছোট ভাইয়ের খামখেয়ালীপনা সম্পর্কে জানে জেমস। তাই মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল। আসলে সে-ও মজা পাচ্ছে এই আমোদে।

আড়চোখে শেলীর দিকে তাকাল জনি, লাল টকটকে হয়ে গেছে মুখ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে মায়াবী নেশা। মুখ টিপে হাসল শেলী। সবার নজর এড়িয়ে বাম চোখটা টিপে দিল। ওরে বাব্বা, সেরেছে, ভাবল জনি। আজ বিছানায় অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে, কোন সন্দেহ নেই।

ঠিক এই সময় দড়াম করে খুলে গেল দরজা। সরাইখানার ভেতরে দৃঢ় পদক্ষেপে ঢুকল এক বৃদ্ধ। বাঘের মত রাগী চেহারা, চোখে মুখে গভীর মনোযোগের ভাব ফুটে আছে। বয়স পঞ্চাশের ওপর। কালো আলখাল্লা গায়ে। গলায় ঝুলছে পবিত্র ক্রুশ। এই লোকের চোখের দৃষ্টি রোদ লেগে ঝিক করে ওঠা ছুরির ফলার মত, যার দিকে তাকায় চোখ ধাঁধিয়ে যায় তার। সরাইখানায় ঢুকেই কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে খেপে গেলেন বৃদ্ধ। ওখানে একগোছা রসুন ঝুলছে। টান মেরে রসুনগুলো নামিয়ে, ছুঁড়ে দিলেন অগ্নিকুণ্ডে।

'ইডিয়েট কোথাকার!' উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর বৃদ্ধার। 'কতবার বলেছি, সে আর নেই। জন্মের মত বিদায় নিয়েছে। দশ বছর আগেই শয়তানের পতন হয়েছে। তবুও রসুন ঝুলিয়ে রাখবে, কেন...এত ভয় কীসের?'

চোখ পাকিয়ে সবার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। তারপর চার জনের দিকে ফিরলেন, এগিয়ে এলেন নতুন লোক দেখে। ঝটপট চেয়ার এগিয়ে দিল সরাইখানার মালিক। তাতে জুৎ করে বসলেন বৃদ্ধ।

'আপনারা দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন?' একটু ঝুঁকে জানতে চাইলেন বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ,' বলল জনি। 'বাবা মারা যাবার সময় প্রচুর টাকা রেখে গেছেন, খরচ করতে হবে না?'

'তাই?' বিস্মিত দেখাল বৃদ্ধকে। 'তা, এদিকে এসেছেন, যাবেন কোথায়?'

'যোশেফবাদ।'

মুহূর্তে বদলে গেল ঘরের পরিবেশ। না শোনার ভান করে ওদের আলাপ শুনছে সবাই কান পেতে। প্রত্যেকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনির দিকে। সাংঘাতিক কিছুর অপেক্ষায় যেন সবাই আতঙ্কিত।

'না!' বড় বড় চোখে আশ্চর্য একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফুটিয়ে তুললেন বৃদ্ধ। 'ওদিকে যাবেন না।'

'কেন?' জানতে চাইল জনি।

চারদিকে চোখ বুলালেন বৃদ্ধ। তারপর জনির দিকে ফিরলেন। 'আমি ফাদার জ্যাকসন। বেড়াতে এসেছেন, ভাল কথা। চলুন না আমার মঠে। এই তো, কাছেই আমার মঠ, ক্রেইন বাগে। ওখানে কদিন থাকবেন, হেসে খেলে বেড়াবেন, ভালই লাগবে।'

'ধন্যবাদ ফাদার, অসংখ্য ধন্যবাদ।' প্রাণ খুলে হেসে উঠল এবার জনি। ফাদারের দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে চেয়ে আবার বলল, 'পাহাড়, খোলা প্রান্তর দেখতে বেরিয়েছি আমরা, তাই দেখে নিই ক'দিন, তারপর না হয় যাব একদিন আপনার মঠে বেড়াতে, কেমন?'

'না!' রূঢ় কণ্ঠে বললেন ফাদার। 'অনেক কিছু বলার ছিল আমার, কিন্তু কিচ্ছু বলব না। কারণ পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আপনারা আমার কথার গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। তবুও একটা উপদেশ দিচ্ছি—কখনও কেল্লার কাছে যাবেন না।' দ্রুত বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধ ফাদার সরাইখানা থেকে।

'জনি,' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল জেমস, 'ম্যাপে তো কোন কেল্লার কথা নেই? তা হলে ফাদার কোন্ কেল্লার কথা বললেন?'

জনি এগোল সরাইখানার মালিকের কাছে। 'এদিকে কেল্লাটা কোথায়?' জানতে চাইল সে।

'জানি না।' রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বৃদ্ধের চেহারা। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। একটু বিস্মিত হলো জনি। বড় বেশি নার্ভাস দেখাচ্ছে বুড়োকে।

'আচ্ছা, কেল্লাটা কি যোশেফবাদে যাওয়ার পথে পড়ে?'

'আমি জানি না বাবা, কিচ্ছু জানি না।' বিড় বিড় করে আরও কী যেন বলছে বৃদ্ধ, আর ঘন ঘন বুকে ক্রশ আঁকছে। হতাশ হলো জনি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কোন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে ওই কেল্লায়। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে মনে মনে, দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা। কেন এই রহস্যময় নীরবতা। কেল্লার প্রসঙ্গ উঠলেই কেন সবাই চুপ হয়ে যায়। কে বানিয়েছে এই কেল্লা। কী আছে ওখানে।

সব জানতে হবে তাকে।

ভরপেট খেয়ে নিজের রুমে ঢুকল জনি। পিছু পিছু এল শেলী। জামা কাপড় ছেড়ে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে টান টান হলো বিছানায়। খামোকা উদ্বেগে না ভুগে সেঁটে ঘুম দেয়ার পক্ষপাতী সে। কিন্তু আজ কেন জানি ঘুম আসছে না। বাথরুমে ঢুকে গোসল করছে শেলী, পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। মনের সুখে ঝপাঝপ পানি ঢালছে। আবোল তাবোল অনেক কথাই ভাবছিল জনি। নিজের সম্পর্কে সব সময় উঁচু ধারণা পোষণ করে সে। নিজেকে চেনে, কতটুকু যোগ্যতা রাখে জানে বলেই সম্ভব হয়েছে এটা।

শারীরিক উপযুক্ততা, চিন্তার স্বচ্ছত্ব অর্জনের জন্যে জ্ঞান হবার পর থেকেই কঠোর পরিশ্রম করেছে ও। কাজেই সহজে ভয় পাবার পাত্র নয়।

আশ্চর্য। সত্যিই আশ্চর্য।

কেল্লার ব্যাপারটা মন থেকে তাড়াতে পারছে না কিছুতেই। ম্যাপে নেই অথচ কেল্লা আছে একটা। ব্যাপারটা কী?

কে বানিয়েছে ওটা, কবে বানিয়েছে, কী আছে ওখানে, অসংখ্য প্রশ্ন জাগছে মনে, কিন্তু এসবের কোন উত্তর জানা নেই।

নাহ্, মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জনি। আগামীকাল বিকালে কেল্লা দেখতে বেরুতে হবে। উহ্, ভয়ানক ধকল গেছে কদিন।

একটু বিশ্রাম না নিলে কাজ করবে না ব্রেন। সুতরাং আগামীকাল বিকেল পর্যন্ত একটানা বিশ্রাম। কোন কাজ নয়। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।

'জনি!'

চমকে উঠল জনি। বাথরুম থেকে কখন জানি বেরিয়ে এসেছে শেলী। হালকারঙের পাতলা লাল চাদর দিয়ে শরীর জড়িয়েছে। মিষ্টি একটা সুবাস ওর দেহে। ওর বুকের ওপর শুয়ে পড়ল শেলী। একটু একটু কাঁপছে শরীর। কেল্লার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে জনি, এটা বোঝার পর থেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে সে।—শুধু উদ্বিগ্ন নয়, রীতিমত নার্ভাস বোধ করছে। জনি সম্পর্কে তার এই ভীতি নতুন নয়। দেখেছে, যেখানে ঝামেলা, সেখানেই নাক গলাবে জনি।

'কী হলো?'

'ভয় লাগছে, জনি। ভীষণ ভয় লাগছে আমার।'

'ভয়!' বিস্মিত হবার ভান করল জনি।

'কেল্লার ব্যাপারে নাক গলাবে তুমি, আমি জানি।'

'তাতে ভয় পাবার কী আছে?'

'বিপদে পড়বে। তোমাকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। হয়তো কিছুই নয়। তবু কেল্লার ব্যাপারে মাথা না ঘামালেই ভাল করবে। হয়তো মেয়েলী কুসংস্কারবশেই অনুভব করছি, সাংঘাতিক বিপদে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছ।'

অভয় দিয়ে হাসল জনি। 'মেয়েদের সব কথা শুনলে চলে না, পাগলী। অনেক সময় বুঝেও না বোঝার ভান করতে হয়। সেটাই তো সব দিক দিয়ে ভাল।'

কোন উত্তর দিল না শেলী। শুধু উপলব্ধি করল, জনিকে আসলে এতদিনেও চিনতে পারেনি সে।

চোখ দুটো ছল ছল করছে শেলীর। 'ঠিকই বলেছ, জনি,' আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল শেলী। 'মেয়ে মানুষের কথার কিইবা দাম আছে তোমাদের কাছে।' চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে এবার শেলীর। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনির মুখের দিকে।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল জনির। বুঝতে পারছে প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে শেলীর, নইলে এত তাড়াতাড়ি পরাজয় স্বীকার করার মেয়ে নয় ও। আসলে ঠিক বোধহয় অভিমান নয়, দুঃখ পেয়েছে। কথাটা ভেবেই অস্থির হয়ে পড়ল ও। হাতের আঙুল দিয়ে চোখের কোণ মুছে দিল শেলীর। আদরের স্পর্শ পেয়েই ফুঁপিয়ে উঠে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে শেলী। বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আদর করতে শুরু করল জনি। চুমো খেতে শুরু করল পাগলের মত ওর ঠোঁটে, গালে, গলায়। পিঠে হাত বুলাতে গিয়ে ব্রা'র হুকটা বারবার হাতে লাগছে—খুলে দিল ওটা।

লক্ষ করল অভিমান, দুঃখ ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে শেলী। গরম হয়ে উঠছে শরীর, নিঃশ্বাস। উঠে বসল শেলী বিছানার ওপর। চাদর ছুঁড়ে দিল, ব্রা বেরিয়ে এল মৃণাল দুই বাহু গলে।

পাশের রুম। লিলি কেইন শুয়ে আছে জেমসের পাশে। 'জেমস,' নিচু গলায় ডাকল লিলি। 'আমার অবশ্য মাথা ঘামানো উচিত না, তবুও জিজ্ঞেস করছি—তোমরা কি সত্যি কেল্লার খোঁজে বেরুবে কাল?'

'কেন বেরুব না?' পাল্টা প্রশ্ন করল জেমস। 'কেল্লার কথা শোনা অবধি দিগ্বিদিক ছুটছে আমার বাঁধনহারা কল্পনা। নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে কেল্লাকে ঘিরে। দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি—রহস্য, রোমাঞ্চ আর আনন্দই তো চাই আমাদের।'

লিলির তরফ থেকে জবাব এল না কোন। গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে সে। মৃদু হেসে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল জেমসও। ঘুমুবার আগে চিন্তাটা ঝিলিক দিল একবার মনে, আগামীকাল বেরুতে হবে কেল্লাটার খোঁজে। যদি খোঁজ পাওয়া যায়, ঢুকতে হবে ভেতরে, জানতে হবে কেল্লার রহস্য।

পথে বেরুলে ঝামেলা হবেই।

পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবু ডুবু, কেমন জানি রোগাটে মলিন দেখাচ্ছে ওটাকে। ঘণ্টাখানেক আগেই যাত্রা শুরু করেছে চার ইংরেজ। যাত্রার সময় একটা জিনিস লক্ষ করেছে ওরা, সবাই কেমন আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছে। খুব একটা পাত্তা দেয়নি ওরা এসব। এবার কোচোয়ান বদল হয়েছে—নতুন কোচোয়ান রিচার্ড। অবশ্য কোচোয়ান বদল করার কোন ইচ্ছেই ছিল না ওদের, কিন্তু কেন জানি রোজারিও কিছুতেই রাজি হলো না আসতে।

'না,' আঁতকে উঠেছিল রোজারিও। 'আপনারা অভিশপ্ত কেল্লায় গেলে...' কথাগুলো বলতে বলতে হেঁটে চলে গিয়েছিল কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, অসহায়

একটা ভঙ্গি করে।

ছুটছে, তীব্র বেগে ছুটছে গাড়ি। চারপাশের অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজেদের হারিয়ে ফেলল ওরা। বাইরের পৃথিবীর চেহারাই একেবারে পাল্টে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, আকাশটা স্লেট রঙের হয়ে গেছে। বড় বড় গাছে ঢেকে আছে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া পাহাড়ের গা। বনের ভিতর দিয়ে ছুটছে এখন গাড়ি। দু'পাশে উঁচু উঁচু গাছ।

একসময় বন পেরিয়ে এল গাড়ি। এবার দেখা গেল চমৎকার নয়নাভিরাম দৃশ্য। সবুজ ঘাসে ছাওয়া খোলা তেপান্তর। দু'পাশে, দূর বহুদূর, পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অজস্র আপেল গাছ। থোকায় থোকায় ঝুলছে লাল টকটকে আপেল। হঠাৎ করেই একপাশে কাত্ হয়ে গেল গাড়ি। একটা চাকা খুলে গেছে। বাপ মা তুলে গালি দিয়ে লাগাম টেনে গাড়ি থামাল রিচার্ড।

একলাফে নীচে নেমে মাত্র দশ মিনিটেই ঠিক করে ফেলল চাকা। আবার ছুটল গাড়ি। সন্ধ্যা নেমে আসছে, এবার ঘোড়ার গাড়ি এমন ছোটানো শুরু করল যে চার ইংরেজ আঁতকে উঠল থেকে থেকে। মিনিট বিশেক ছোটার পর গতি কমিয়ে আনল কোচোয়ান। একটা ছোট কুঁড়েঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। এক লাফে নীচে নেমেই গাড়ির ভেতর থেকে মালপত্র নামাতে শুরু করল কোচোয়ান। সূর্য ডুবছে এখন, কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর সম্পূর্ণ চোখের আড়ালে চলে যাবে। চারদিকে গাঢ় হয়ে আসছে অন্ধকার। সেই সাথে বাড়ছে তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস। চার ইংরেজ নেমে এল গাড়ি থেকে। 'কোথায় কেল্লা?' জানতে চাইল জেমস।

'এখান থেকে মাইল খানেক পুবে,' উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল কোচোয়ান। 'কাল আবার আসব, ঠিক এইখানে অপেক্ষা করবেন।'

স্থির হয়ে গেল জনি। 'এই যে লাট সাহেব। মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি? অমন কায়দা করে নামিয়ে দিলে সব মালপত্র, বলি মতলবখানা কী?'

কোচোয়ানের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠতে দেখল চার ইংরেজ। রেগে গেছে। বয়সে ওদের ছোটই হবে। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে দৃঢ়তার ছাপ। দেখেই বোঝা যায় নিজের ওপর আস্থা রাখে এ লোক। তার অবশ্য সঙ্গত কারণও আছে। প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে ওর দু'হাতের পেশীতে।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না যে?'

ঝট করে ছুরি বের করল কোচোয়ান। 'চুপ! একদম নড়বেন না!'

এগুতে যাচ্ছিল জনি। ঝট্ করে ওর হাতের কব্জি ধরে ফেলল শেলী।

'না! দেখছ না, ও বিপজ্জনক লোক!'

'বিপজ্জনক!' সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল কোচোয়ান। 'তা হলে আগামীকাল আপনাদের নিতে আসতে চাইছি কেন?'

খানিক নীরবতা।

তারপর একলাফে কোচোয়ানের সীটে উঠে বসল কোচোয়ান। চাবুকের বাড়ি খেয়েই লাফিয়ে উঠে ছুটল ঘোড়া।

কুঁড়েঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল জেমস। সন্ধ্যের আবছা ছায়ায় কেমন

অদ্ভুত দেখাচ্ছে কুঁড়েঘরটাকে। চারদিকে গা ছমছমে নীরবতা।

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল জেমস। পা রাখল ভেতরে। পিছু পিছু ঢুকল বাকি তিনজন। মেঝে ঢাকা পড়েছে। হাঁটু সমান ঘাসে। এক কোণায় প্রচুর শুকনো কাঠ জমে আছে। ভাঙা জানালা। পুরানো কাঠ এক জায়গায় খসে গেছে। যেখানে সেখানে মাকড়সার ঘন জাল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারজন। রাতের আশ্রয় হিসাবে জঘন্য একটা জায়গা।

এই সময় দূর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল।

'আমাদের ফেরত নিতে আসছে রিচার্ড।' খুশি হয়ে উঠল লিলি। বেরিয়ে এল সবাই বাইরে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ আরও কাছিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরেই তীক্ষ্ণ হ্রেষা ধ্বনিতে সবাই চমকে উঠল। যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে দুই ঘোড়ায় টানা সুন্দর একটা ফিটন। দুটো ঘোড়াই কুচকুচে কালো রঙের, বলিষ্ঠ এবং সুন্দর। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, চালকের আসনটা খালি।

'জনি, উঠো না গাড়িতে!' কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল শেলী। 'আমার সাংঘাতিক ভয় লাগছে।'

কেউ কান দিল না শেলীর কথায়। সবাই উঠে বসল ফিটনে। জনি উঠল কোচোয়ানের সীটে। লাগাম টেনে সরাইখানার দিকে মুখ ফেরাল ঘোড়ার, কিন্তু উল্টো বুঝল ঘোড়া, লাগামের টান উপেক্ষা করে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ছুটল আবার।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে ফিটন। পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ।

ঘোড়াগুলোকে আয়ত্তে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে জনি। কিন্তু কোনমতেই পারছে না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল। যাক, যেখানে খুশি নিয়ে যাক ওদেরকে হতচ্ছাড়া ঘোড়াগুলো।

একটা অত্যন্ত সংকীর্ণ পথে এসে পড়ল গাড়িটা। দু'পাশে খাড়া পাহাড়, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু এক চিলতে রাস্তা। সেটা পেরিয়ে এল গাড়ি। বিমূঢ়ের মত চালকের আসনে বসে আছে জনি। হঠাৎ গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়তেই চমক ভাঙল। বিশফুট চওড়া একটা পরিখার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি। ঠিক এমনি সময় প্রায় নিঃশব্দে নেমে এল একটা কাঠের সেতু। সেতুর ওপর দিয়ে শান্ত পায়ে এগিয়ে গেল ঘোড়াগুলো। খুলে গেল দুর্গের প্রকাণ্ড কাঠের তোরণ। ভিতরে ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল। চাঁদ উঠেছে, উঁকি মারছে মেঘের ফাঁক দিয়ে। চাঁদের আবছা আলোয় কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে বিশাল প্রাসাদ দুর্গটাকে।

একলাফে নীচে নেমে এল জনি। সাথে যোগ দিল বাকি তিন ইংরেজ। চাঁদের আলোয় দুর্গের মাথার প্রাচীন কামান বসানোর খাঁজ কাটা ভাঙা ফাঁক-ফোকরের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল জেমস। 'কোন সন্দেহ নেই, খুবই প্রাচীন দুর্গ এটা।'

দূরে বনের ভিতর থেকে ডেকে উঠল হিংস্র কোন জানোয়ার। জবাবে আরেকটা। একটু পরই ডাকাডাকি শুরু করে দিল একদল হিংস্র নেকড়ে। তোরণের বাইরে বাড়ছে কোলাহল, জেগে উঠছে বুনো জীবন। কান পেতে শুনছে চার ইংরেজ।

'বুঝে গেছি,' বলে উঠল লিলি। 'ভিতরে আছে কেউ।'

চমকে সামনের দিকে তাকাল ওরা। ভারি পাল্লার ফাঁক দিয়ে হালকা আলোকরশ্মি বাইরে বেরিয়ে আসছে।

নীরবে লক্ষ করতে লাগল ওরা। তারপর এগিয়ে গেল আলোক রশ্মি লক্ষ্য করে। ধাক্কাতে ধাক্কাতে দরজা খুলল জনি। পা রাখল ভিতরে। পিছু পিছু ঢুকল ওরা তিনজন।

ঘরের ভেতরে ঢুকেই খুশিতে নেচে উঠল চার ইংরেজ। আলোয় ঝলমল করছে বিশাল কামরা। আসলে কামরা না বলে বিশাল হলঘর বলাই যুক্তিসঙ্গত। যেমন উঁচু, তেমনি প্রশস্ত। দামী পাথর দিয়ে মোড়া ঘরের মেঝে আর চারপাশের দেয়াল। বিশাল একটা ডাইনিং টেবিল রাখা হয়েছে ঘরের মাঝখানে।

ঘরের কোণের বিরাট ফায়ার-প্লেসে জ্বলছে গনগনে আগুন।

শীতের রাতে আশ্রয়ের জন্য চমৎকার জায়গা। কিন্তু অবাক ব্যাপার, হলঘরটা ফাঁকা, একেবারে ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই।

চারদিক নীরব, নিঝুম।

'কেউ আছে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল জনি। কোন সাড়া এল না। কেবল মাত্র জনির গম্ভীর কণ্ঠস্বর দেয়ালের গায়ে গমগমে প্রতিধ্বনি তুলল। আবার চেঁচাল জনি। কিন্তু নাহ্, এবারও কেউ এল না। শেলী আর লিলি দাঁড়াল পাশাপাশি। আতঙ্কে বিস্ফারিত ওদের চোখ। কারও মুখে কথা নেই।

এমন সময় চিঁহি চিঁহি হি করে ডেকে উঠল ঘোড়া দুটো। এক ছুটে বাইরে চলে এল চার ইংরেজ। ওদের চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়ে গেল রহস্যময় ঘোড়ার গাড়ি, সাথে নিয়ে গেল ওদের সব মালপত্র। হতাশ হয়ে আবার ওরা ঢুকে পড়ল বিশাল হলরুমে। 'হায় ঈশ্বর!' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল লিলি। সবাই চেয়ে দেখল মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে বদলে গেছে হলরুমের চেহারা। বিশাল ডাইনিং টেবিলের দু'পাশে মাত্র চারটি চেয়ার। টেবিলের ওপর সাজানো চারজনের খাবার-দাবার। অথচ একটু আগেই খালি ছিল ডাইনিং টেবিল। ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ডাক শুনে ওরা বাইরে বেরিয়ে যেতেই কেউ সাজিয়ে রেখেছে এই চেয়ার আর খাবার।

কিন্তু কে?

'কেউ আছ এখানে?' চিৎকার করে উঠল জনি। শব্দগুলো আগের মতই প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। কোন্ উত্তর এল না।

'কে?' এবার চেঁচিয়ে উঠল জেমস। 'বলো, কে আছ এখানে? কে সাজিয়েছ খাবার? বলো, জবাব দাও!'

কোন জবাব এল না। জনি একটু ভেবে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। পিছু পিছু এল জেমস। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে এল দু'ভাই। লম্বা প্যাসেজ। দু'পাশে সারি সারি ঘর। প্রতিটির দরজা বন্ধ। দু'পাশের দরজা ধাক্কাতে শুরু করল ওরা।

'ভাইয়া,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জনি। দরজা ধাক্কা দিতে খুলে গেছে। ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল জনি, পিছু পিছু জেমস। বেশ বড়সড় ঘরটা। এককোণে

ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে আগুন। ঘরে আলোও আছে। দামী বিছানার ওপর স্তূপীকৃত অবস্থায় আছে সুটকেসগুলো।

'জনি,' খামচে ধরল জেমস ছোট ভাইয়ের কাঁধ। সারা শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। 'চিনতে পেরেছ? সুটকেসগুলো আমাদের। ঘোড়ার গাড়িতে ছিল। পালিয়ে গিয়েছিল ঘোড়ার গাড়ি, সুটকেস নিয়ে...অথচ...'

সত্যি ভয়ের ব্যাপার। অদ্ভুত একটা অশরীরী অতিপ্রাকৃত ঘটনা, কিন্তু ভয় পেল না জনি। এগিয়ে গেল বিছানার দিকে।

ঠিক এই সময় নীচে থেকে মেয়েলি গলায় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠছে লিলি। দু'ভাই দৌড়ে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থর থর করে কাঁপছে শেলী আর লিলি। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাকে আবৃত দীর্ঘ এক পুরুষ মূর্তি।

পায়ের শব্দে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল পুরুষ মূর্তি। ছোট্ট মুখ, গাল ভাঙা, নিস্পলক দুই চোখে ঠাণ্ডা একটা ভাব। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

পাংশু মুখে লোকটার দিকে চাইল জেমস। পুরুষ মূর্তির কালো পোশাক চেপে ধরল জনি। 'ভয় দেখাচ্ছ কেন?' জানতে চাইল সে।

'সার।' মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করল পুরুষ মূর্তি। 'আমি হ্যারি। এ-বাড়ির নগণ্য পাহারাদার, আমি কেন অতিথিদের ভয় দেখাব? ওঁরা আমাকে দেখে খামোকাই চেঁচিয়ে উঠেছেন।'

জনি শেলীর দিকে তাকাল। মুচকি হাসল শেলী, তারমানে হ্যারি সত্যি কথাই বলছে। কালো আলখেল্লা ছেড়ে দিল জনি।

'এ বাড়ির মালিক কে?'

'কাউন্ট ড্রাকুলা।' বিনীত ভঙ্গিতে বলল হ্যারি।

স্বস্তির প্রকাণ্ড হাঁফ ছাড়ল জনি। যাক, এ প্রাসাদ তা হলে একজন কাউন্টের। কাউন্ট মানে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, ধনী মানুষ। লিলি কেঁদে ফেলল ঝর ঝর করে। 'ওগো, কাউন্টই হোক আর যেই হোক, এ বাড়িতে রাত কাটাব না আমরা, চল সবাই বেরিয়ে পড়ি...'

কোন উত্তর দিল না জেমস, শুধু নিস্পলক তাকিয়ে রইল স্ত্রীর মুখের দিকে।

'ভয় পেও না, ভাবী,' শান্ত কণ্ঠে বলল জনি। 'আজ রাতে এখানে আমাদের থাকতেই হবে। বাইরে অন্ধকার, গভীর জঙ্গল, ইচ্ছে থাকলেও বাইরে যেতে পারছি না।'

চুপচাপ খেতে বসল ওরা। পরিবেশন করছে হ্যারি।

'তোমার মনিব কোথায়?' খেতে খেতে প্রশ্ন করল জনি।

'সার,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল হ্যারি, 'এসব আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না দয়া করে, সময় হলেই দেখা দেবেন তিনি।'

'বাজে বকো না!' দাঁত বের করে খিঁচিয়ে উঠল জেমস। 'ব্যাটা পাজী, বদমাশ, জলদি বল, তোর মনিব কোথায়?' একটা ধারাল ছুরি হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

'বলছি সার, বলছি!' ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল হ্যারি। 'বহুদিন আগে, বহুদিন

আগে মারা গেছেন আমার মনিব।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই। শোকাহত দেখাচ্ছে ওদের। কাউন্ট ড্রাকুলা নেই। বহুদিন আগে মারা গেছে। অথচ তার প্রাসাদ রয়ে গেছে বিপদগ্রস্ত পথিকদের আশ্রয় দিতে। আর হ্যারি, দেখতে ভয়ংকর, নিঃশব্দে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে এই প্রাসাদ। সেবা করে যাচ্ছে অসহায় পথিকদের।

নিজের দুর্ব্যবহারের জন্যে মনে মনে লজ্জিত হলো জেমস।

'আমি...আমি দুঃখিত, হ্যারি।' বসে পড়ল জেমস। খেতে শুরু করল। শুধু খেলো না একজন। লিলি কেইন।

অনেক দিন, অনেক দিন ধরে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে হ্যারি এই শুভদিনের আশায়। কতদিন, কতদিন ধরে আশায় আশায় পথ চেয়ে রয়েছে সে। বাইরের অতিথিরা আশ্রয় নেবে এই মনোরম প্রাসাদে। এবং তাদের রক্তের বিনিময়ে আবার জেগে উঠবে মৃত্যুর রহস্যময়তা ছিন্ন করে অন্ধকারের রাজা, শয়তানের পূজারী কাউন্ট ড্রাকুলা।

হ্যারি স্পষ্ট শুনছে কাউন্টের সেই বাণী, এখনও স্মৃতির পটে বেজে ওঠে—'সুযোগের প্রতীক্ষায় থেকো, হ্যারি। মনে রাখবে, সুযোগ আসবেই, তাকে চিনতে ভুল করো না। সুযোগ এলেই সদ্ব্যবহার করো।'

কাউন্টের অন্তিম নির্দেশ কখনও ভোলেনি হ্যারি। দীর্ঘ দশটি বছর কেটে গেছে ওর প্রতীক্ষায়। কিন্তু না, আসেনি অতিথিরা। কিন্তু আজ সব প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে, আশ্রয় নিয়েছে অতিথিরা। আজ রাতে, হ্যাঁ, রাতেই জাগিয়ে তুলতে হবে প্রভু কাউন্ট ড্রাকুলাকে। স্মৃতির পাতায় কত ছবি আঁকা রয়ে গেছে। যখন প্রভু ছিলেন, এই প্রাসাদের আনাচে কানাচে রক্তের কী সাংঘাতিক হোলি খেলাই না হত। আহ্‌, কী চমৎকার দিন ছিল সেগুলো, মৃত্যুপথযাত্রীর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ কী প্রবল আলোড়নই না জাগিয়ে তুলত রক্তের প্রতি কণায় কণায়। তারপর কাউন্ট ড্রাকুলার ভস্মপ্রাপ্তির পর কী দুর্দিনই না নেমে এল।

সব কেমন জানি স্তব্ধ হয়ে গেল। মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম আর্তনাদ থেমে গেল। রক্তের হোলিখেলা বন্ধ হয়ে গেল। ব্যস, সাথে সাথেই বদলে গেল তল্লাটের লোকগুলো। ওরা আর তাকে সম্মান করে না। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, লোকালয়ে গেলেই শয়তানের দোসর বলে মস্করা করা শুরু করে দিল সবাই। দূর দূর করে পিছু পিছু তাড়া করা শুরু হলো বাচ্চা ছেলেদের। নিষ্ফল আক্রোশে প্রাসাদে এসে প্রভুর কফিনের পাশে বসে কতই না কেঁদেছে হ্যারি।

আর আজ, দপ করে জ্বলে উঠল ওর দুই চোখ। আজ রক্ত দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে প্রভুকে। তারপর...তারপর কেঁপে উঠবে সারা তল্লাট। হারানো রাজত্ব ফিরে পাবে হ্যারি।

মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে ছোট্ট দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল হ্যারি। একটা ঘোরানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে নীচে পাতালপুরীতে। অন্যমনস্ক ভাবে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল সে। চারদিকে রহস্যময় আবছা অন্ধকার। এটা পারিবারিক কবরখানা। পলেস্তারা খসে গেছে ছাদের, মাটির নীচে পাতালপুরীর

আঁধারের এই ঘরে কেবল মাত্র অতি যত্নে রাখা একটি প্রকাণ্ড ডালা বন্ধ কফিন। কাউন্ট ড্রাকুলা, ওপরে লেখা একটি নাম।

প্রভু ড্রাকুলা, হে প্রভু ড্রাকুলা, সময় হয়েছে এবার ওঠো তুমি। মনে মনে প্রার্থনা করল হ্যারি। সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে উঠে এল সে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা বন্ধ দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। এই ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে লিলি এবং জেমস।

ঠক ঠক ঠক, মৃদু হাতে দরজায় টোকা দিল হ্যারি। জেগেই ছিল জেমস এবং লিলি। দরজায় টোকা শুনে এক লাফে নেমে এল জেমস। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল, হাতে মোমবাতি। দপ করে জ্বলে উঠল ওর দুই চোখ তীব্র কৌতূহলে। একটা ভারি বাক্স ঠেলে ঠেলে এগুচ্ছে হ্যারি। ওকে অনুসরণ করতে শুরু করল জেমস। কী আছে বাক্সে, দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল হ্যারি। পিছু পিছু নেমে এল জেমস। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছে সে।

ভারি কফিনটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। মাথা নিচু করে কফিনের গায়ে লেখা নামটা পড়তে শুরু করল—কাউন্ট ড্রাকুলা।

ঠিক এমনি সময় ওপর থেকে এল আক্রমণটা। জেমসকে বিন্দুমাত্র সতর্ক হওয়ার সুযোগ না দিয়েই, ওপরে ঝুলানো দামী সিল্কের পর্দা ঝুপ করে পড়ল ওর মাথার ওপর। ছিটকে মোমবাতিটা উড়ে গেল কোথায় জানি। ভারি পর্দার ঝাপ্টায় ভারসাম্য হারাল ও, সাথে সাথেই অনুভব করল কে যেন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ওকে কফিনের ওপর। পাগলের মত ভারি পর্দা মুখ থেকে সরিয়ে দিল জেমস, বিস্ফারিত চোখে দেখল হ্যারির ভয়ঙ্কর মুখ, হাতে উদ্যত ছুরি। কিছু চিন্তা করার আগে গলায় প্রচণ্ড আঘাত খেলো জেমস। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে শুরু করল গলা দিয়ে। জ্ঞান হারাল জেমস।

ওর গলায় ছুরি চালিয়ে গলাটা দু'ভাগ করে ফেলল হ্যারি। এবার গল গল করে রক্ত ঢুকে যাচ্ছে কফিনের ভেতর বড় একটা ফুটো দিয়ে। এবার জেমসের দুই পায়ে রশি বেঁধে ওপরে তুলে নিল মৃত লাশ। মুণ্ডহীন লাশ কফিনের ওপর ঝুলছে। কফিনের ডালা খুলে দিল, ফেলে দিল মাটিতে। আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে মুণ্ডহীন লাশ ছুরি দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করতে শুরু করল হ্যারি। রক্তের বন্যা শুরু হলো, তীব্র আগ্রহে সেদিকে চেয়ে আছে সে। প্রভুর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করেছে সে। এবার শুধু প্রতীক্ষা। হঠাৎ করেই বদলে গেল ঘরের শান্ত চেহারা। কোত্থেকে যেন প্রবল হাওয়া ঢুকছে সারা ঘরে তীব্র বেগে।

কফিনের মাঝে হঠাৎ করেই ধোঁয়া দেখা গেল এবার, শূন্য কফিন ভরে গেছে কালো ধোঁয়ায়, পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে ওপরে, তারপর নেমে আসছে নীচে। ঘুরপাক খেতে খেতে একসময় মিলিয়ে গেল।

সহসা একটা শীর্ণ হাত চেপে ধরল কফিনের কিনারা। মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল তীক্ষ্ণ আর্তনাদে। লাফিয়ে উঠল হ্যারির বুকের ভেতরটা। আনন্দের আতিশয্যে ভুলে গেল সব। বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করল সে। প্রভু ড্রাকুলা জেগেছে, প্রভু ড্রাকুলা জেগেছে!' কী শান্তি, আহ্, কী শান্তি।

হঠাৎ করেই নাচ থামিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল হ্যারি। টোকা দিতেই দরজা খুলে দিল লিলি কেইন। মনে করেছিল স্বামী বুঝি ফিরে এসেছে, কিন্তু দেখল সামনে দাঁড়িয়ে হ্যারি।

'ম্যাডাম,' মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল হ্যারি। 'বিশ্রী একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আপনার স্বামী পা পিছলে নীচে পড়ে গেছেন, পা-টা বোধহয় ভেঙেই গেছে। ওর সাহায্য দরকার, জলদি চলুন।'

দুই চোখ বিস্ফারিত, বোবা হয়ে গেছে লিলি। তারপরই সংবিৎ ফিরে পেল। হ্যারি হাঁটতে শুরু করেছে, ওর পিছু পিছু চলতে শুরু করল সে।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল লিলি, 'আমার স্বামী কোথায়?' চিৎকার করে জানতে চাইল। ইঙ্গিতে ওপরের দিকে তাকাতে বলল হ্যারি। ওপরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লিলি। শূন্যে ঝুলছে মুণ্ডহীন রক্তাক্ত লাশ।

মৃদু খস খস শব্দ হতেই পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল সে। ওর দিকে এগিয়ে আসছে কালো মূর্তিটা। মানুষই। কিন্তু কোন মানুষের এমন বীভৎস চেহারা দেখেনি ও। মড়া মানুষের মত ফ্যাকাসে মুখ, চোখ দুটো লাল টকটকে, যেন ছুরি চালিয়েছে কেউ চোখের ভিতর, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে।

দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল মূর্তিটা লিলির দিকে। স্তব্ধ হয়ে গেছে লিলি। আসলে সম্মোহিত হয়ে গেছে সে।

ওর গলায়, ঘাড়ের কাছে মুখ নামিয়ে আনল দীর্ঘ কালো মূর্তি। তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল লিলি। ওর গ্রীবার মাংস ভেদ করেছে তীক্ষ্ণ ধারাল দাঁত।

নিঃশব্দে হেসে উঠল দীর্ঘমূর্তি। ফিসফিস করে বলল, 'আমি কাউণ্ট ড্রাকুলা। আমাকে কোন ভয় নেই তোমার, লিলি কেইন। সব ভুলে যাবে তুমি, সব দুঃখ ভুলে যাবে।'

সত্যি সব ভুলে গেল লিলি। নিজেকে নিয়ে ভাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ও। কিন্তু মনের আড়াল থেকে একটা কণ্ঠস্বর তিরস্কার করছে ওকে, বাধা দাও লিলি, বাধা দাও শয়তানটাকে।

কিন্তু নাহ্, বাধা দিচ্ছে না আর লিলি। সব অনুভূতি হারিয়ে গেছে ওর।

ধীরে ধীরে নিটোল ঘুম থেকে জেগে উঠল জনি। সারা শরীরের অণু পরমাণুতে ছড়িয়ে রয়েছে গভীর সুখ। মাঝরাত পর্যন্ত শেলী ওর শরীর নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করেছে।

জানালা গলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে উজ্জ্বল সোনালী রোদ।

ওকে দু'হাত দিয়ে ঝাঁকাচ্ছে শেলী। আসলে ওর ঝাঁকুনিতেই ঘুম ভেঙে গেছে জনির।

'জনি, উঠে পড়,' চাপা গলা শেলীর।

'আবার কী হলো?' আধো ঘুমের মধ্যে কথা বলছে জনি। 'এই সাতসকালে বিরক্ত করছে কেন?'

বুকের ওপর দুম করে কিল পড়তেই নিমেষে তন্দ্রা ছুটে গেল জনির। ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল। দেখল ওর দিকে ব্যাকুল চোখে চেয়ে আছে

শেলী।

'কী ব্যাপার,' জানতে চাইল জনি।

'বিপদ, জনি,' মৃদু গলায় বলল শেলী। 'ভাইয়া, ভাবী দু'জনেই পালিয়েছে, আমাদের না জানিয়ে...'

'কী যা তা বলছ!' দ্রুত কাপড় পরছে জনি। 'ওরা আমাদের ফেলে রেখে যাবে কেন?'

পাশের রুমে চলে এল জনি। রুম খালি, সুটকেস নেই। ফায়ারপ্লেস নিভানো। কেউ যে রাতে এখানে ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। 'গেল কোথায় ওরা!' বিস্ময়ের ভাব ফুটল জনির চেহারায়। 'আমাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে...?' আপন মনে বিড়বিড় করছে জনি। 'ওরা কোথাও নেই। কেউ নেই প্রাসাদে।'

'হ্যারিও নেই,' বলল শেলী। সাদা হয়ে গেছে চেহারা। 'একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে শয়তানের বাচ্চাটা।'

'ঠিক আছে,' বলল জনি। 'গা ঢাকা দিয়ে আছে ব্যাটা, ওকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

চেহারায় উদ্বেগ ফুটল শেলীর। 'এখানে আর এক সেকেণ্ডও নয়। আমার মন বলছে মস্ত গোলমাল আছে কোথাও, ব্যাপারটা তুচ্ছ মনে করো না।'

'ঠিক আছে,' মেনে নিল জনি। 'কী করতে চাও তুমি?'

'বেরিয়ে যেতে চাই এই প্রাসাদ থেকে।'

'তাই?' ব্যঙ্গের সুরে বলল জনি। 'ভাইয়া, ভাবী ওঁরা নিখোঁজ, ওঁদের প্রতি কোন দায়িত্ব নেই আমাদের?'

'জানতাম,' বলল শেলী। 'ঠিক এই প্রশ্ন তুলবে তুমি। ঠিক আছে, আমাকে কুঁড়েঘর পর্যন্ত রেখে এসো।'

'তুমি সিরিয়াস, শেলী?'

'অবশ্যই।'

সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল ওরা দুজন।

কোথাও না থেমে হেঁটে চলল ওরা। ঘন জঙ্গলের মাঝে আবছা পথের সরু দাগটার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টুকটাক গল্প করল ওরা। ঠিক দুটোর সময় কুঁড়েঘরের সামনে এসে পৌঁছল।

'ঠিক আছে,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল জনি, 'এখানেই থাক। যদি কোচোয়ান আসে তা হলে ওর সাথে চলে যাবে, কেমন?' চোখে চোখে চেয়ে রইল দুজন কয়েক সেকেণ্ড। নিজের অজান্তেই এগিয়ে এল পরস্পরের দিকে। চুম্বকের মত টানছে দু'জন দু'জনকে। জনির বুকে মাথা রাখল শেলী। গা ঘষল। ওকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ আদর করল জনি। তারপর ছোট্ট চুমু খেয়ে ছেড়ে দিল।

'সাবধানে থেকো, লক্ষ্মীটি।' করুণ শোনাল শেলীর কণ্ঠস্বর। ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বেরিয়ে এল জনি কুঁড়েঘর থেকে। গভীর জঙ্গলে ঢুকেই প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল।

দম হারিয়ে ফেলেছে, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে অন্ধকার দেখছে চোখে। পরিশ্রান্ত

শরীর, অবসন্ন মন, কিন্তু প্রচণ্ড মনোবল নিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে ছুটে চলল জনি। দেরি করলে চলবে না।

ঠিক সন্ধ্যার সময় বিশাল হলঘরের ভিতর প্রবেশ করল ও। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে এল। হালকা আলোয় লম্বা প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেল সামনে। হঠাৎ করেই দেয়ালের গায়ে সাঁটা দরজাটা আবিষ্কার করে ফেলল। দরজার গায়ে জোরে ধাক্কা দিতেই কবাট খুলে গেল। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল তর তর করে। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা। জমাট নিস্তব্ধতা পাগল করে দিতে পারে মানুষকে। হঠাৎ করেই স্থির হয়ে গেল জনি। একটা দামী কফিন। ওতে শুয়ে আছে জীর্ণশীর্ণ এক লোক। ঠোঁটের কোণে রক্তের লাল ধারা। দু'পাশে বড় বড় ধারাল দাঁত। ওপরের দিকে তাকিয়েই ধক করে লাফিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। মুণ্ডহীন একটা লাশ ঝুলছে রশিতে। চারদিক চুপচাপ। পাঁচ সেকেণ্ড পার হয়ে গেল। তারপরই তীক্ষ্ণ বিকৃত কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল জনি। মুণ্ডহীন লাশটা কার, চিনতে পেরেছে সে।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কফিনের কাছে এসে দাঁড়াল সে। জ্যান্ত হতে শুরু করেছে কফিনের ভেতর লোকটা। কফিনের গায়ে সোনালী হরফে লেখা, 'কাউন্ট ড্রাকুলা'। মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে।

কাউন্ট ড্রাকুলা আনডেড। মৃত্যুর পরেও যারা বেঁচে থাকে তারাই আনডেড। কেউ মারা গেলে তার আত্মা চলে যায় সৃষ্টিকর্তার কাছে। কিন্তু কারও কারও আত্মা সেখানে যায় না। তাদের মৃতদেহে প্রাণের পুনঃসঞ্চার হয়, তারা জীবিতদের রক্ত পান করে টিকে থাকে এই দুনিয়ায়।

চমকে উঠল জনি। আশ্চর্য। এ কোন্ রাজত্বে এসে পৌঁছুল সে। লাল টকটকে চোখ মেলে তাকাল কাউন্ট ড্রাকুলা।

ঝট করে ঘুরে সিঁড়ির দিকে প্রাণপণে ছুটল জনি।

বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াবার কোন মানেই হয় না। পালাতে হবে. এই নরক থেকে পালাতে হবে।

জনি বেরিয়ে যেতেই কাজে নেমে পড়ল শেলী। চারদিকে কালো অন্ধকার আর তীব্র ঠাণ্ডা জেঁকে বসেছে। কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালতে শুরু করল সে। ঠিক এমনি সময় চিঁহিহি চিঁহিহি ঘোড়ার ডাক, বহুদূরে। আস্তে আস্তে শব্দটা এগিয়ে আসছে এদিকে। নিশ্চয় কোচোয়ান।

এক সময় কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ঘোড়ায় টানা গাড়িটা। কুঁড়েঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল হ্যারি। হতাশায় ভেঙে গেল শেলীর মন। ওর চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত।

'ম্যাডাম দেখছি ভয় পেয়েছেন,' শেলীর দিকে চেয়ে কস্টার্জিত হাসি ফোটাল ঠোঁটে হ্যারি।

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল শেলী, 'এসব কী হচ্ছে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না! তুমি কোথায় লুকিয়ে ছিলে—ভাইয়া, ভাবী কোথায়? বলো, জবাব দাও!'

'সব জবাব দেবেন আপনার স্বামী,' শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যারি। 'তিনিই

পাঠিয়েছেন আমাকে, চলুন আমার সাথে।'

হ্যারির নির্বিকার মুখটা পরীক্ষা করছে শেলী। ওকে কতটুকু বিশ্বাস করা যায়, তাই হয়তো ভাবছে।

অবশেষে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এল ও। ঘোড়ায় টানা গাড়িতে উঠে বসল। একটানা ছুটে চলল ঘোড়ার গাড়ি। প্রাসাদের সামনে এসে থেমে গেল। বিশাল হলঘরে প্রবেশ করেই আনন্দে উদ্ভাসিত হলো শেলীর চেহারা।

'এত দেরি করে এলে,' মিষ্টি করে হাসল লিলি কেইন। 'কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।'

ওর দিকে এগিয়ে গেল শেলী। 'কোথায় পালিয়েছিলে সকাল থেকে?' জানতে চাইল ও। 'জনিকে দেখছি না, কোথায় সে?'

'ও। এই ব্যাপার!' হা হা করে হেসে উঠল লিলি। 'জনির কথা ভুলে যাও।'

খপ্ করে ওর হাত ধরে ফেলল লিলি, হাত ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে বোকা বনে গেল সে। এত শক্তি পেল কোথায় লিলি! বরাবরই দুর্বল মেয়ে ও।

'এসো আমার কাছে,' ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল শেলী। সাথে সাথেই আঁতকে উঠল সে। শির শির করে ভয়ের স্রোত বইল ওর মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে। লিলির দিকে চাইল একবার, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল। গলা থেকে পা পর্যন্ত কালো আলখাল্লা পরনে, জীর্ণশীর্ণ একটা লোক। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মুখে হিংস্র হাসি। একলাফে শেলীর কাছে চলে এল সে। দু'হাতে শেলীর কাঁধ চেপে ধরল।

'ড্রাকুলা! ছেড়ে দাও ওকে!' বজ্রকণ্ঠে হুংকার শোনা গেল।

ঘুরে দাঁড়াল ড্রাকুলা। এক দৌড়ে জনির কাছে চলে এল শেলী। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল জনি। মানসিক আঘাতটা মারাত্মক। হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে সে। শেলীকে এখানে দেখবে আশা করেনি। সমাধিকক্ষ থেকে পালিয়ে একটা রুমে লুকিয়ে ছিল সে। নীচে ড্রাকুলার কণ্ঠস্বর শুনে উঁকি মারতেই পুরো দৃশ্যটা দেখতে পায়, ড্রাকুলার ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নীচে নেমে আসে।

'বেরিয়ে যাও। বাইরে গাড়ি তৈরি আছে, পালিয়ে যাও। একাই...!' চেঁচিয়ে উঠল ড্রাকুলা। 'তোমার পালা আসবে পরে।'

জনির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পিছু হাঁটছে সে, সাথে শেলী। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে শেলীর, কাঁপছে সর্বাঙ্গ। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে শেলীর কাপড় খামচে ধরল লিলি। ফরফর করে সার্টের কোণা ছিঁড়ে নীচে নেমে এল। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে দু'পা পিছিয়ে গেল লিলি কেইন।

'পেয়েছি!' জনির হাত চেপে ধরল শেলী। সার্টের কোণা ছিঁড়ে যেতেই বেরিয়ে এসেছে গলায় ঝুলানো পবিত্র রুপোর ক্রুশ। মা গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন ছোটবেলায় আদর করে। পবিত্র রুপোর ক্রুশ–ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র। আনডেডদের বিরুদ্ধে অনেক কাহিনি বলেছে মা গল্পের ছলে, আজ বাস্তব বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে নিজেই। 'জনি, ক্রুশ ধরো, জলদি!'

গলা থেকে ক্রুশটা নামিয়ে হাতে নিল জনি। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল ড্রাকুলার চোখের সামনে। মুহূর্তে জান্তব আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল ড্রাকুলা।

হিংস্র ভঙ্গিতে দাঁত বের করে ফুঁসছে ড্রাকুলা, সাদা ভয়াল দাঁত দেখে অন্তরাত্মা কেঁপে গেল জনির। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগল ওরা হলঘরের দরজার দিকে। আর আতঙ্কিত দৃষ্টিতে পবিত্র ক্রুশের দিকে চেয়ে রইল ড্রাকুলা। চাপা গর্জন বেরুচ্ছে গলা দিয়ে, কিন্তু এগিয়ে আসছে না বাধা দিতে।

শুধু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে লিলি, তাও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।

শেলীকে ছেড়ে ছোট্ট এক লাফ দিয়ে ওর বুকের কাছে পৌঁছল জনি, পবিত্র ক্রুশের ছোঁয়া বুকের ওপর লাগতেই, জান্তব চিৎকার দিল লিলি। শিউরে উঠে দিশেহারার মত পিছন ফিরেই দৌড় দিল, ড্রাকুলার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে জনির হাতে ধরা পবিত্র ক্রুশের দিকে।

হলঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল দু'জন। একলাফে উঠে বসল গাড়িতে, চাবুকের বাড়ি খেয়ে দুরন্ত বেগে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াগুলো।

থম থম করছে অন্ধকার। গাছপালা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির দু'দিকে দুটো মশাল জ্বেলে লটকে দিল শেলী। তবুও অন্ধকার দূর হলো না। কেবলমাত্র অল্প একটু জায়গা আলোকিত হলো মশালের আলোয়। গাছপালার ফাঁক দিয়ে আবছা চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে। বনভূমি পেরিয়ে সমতল ভূমির ওপর দিয়ে ছুটছে এখন গাড়ি। একটু পরই পাহাড়ের নীচে এসে পড়ল ওরা। এবার খাড়া ভাবে উঠতে লাগল গাড়ি। হঠাৎ করেই পা পিছলে গেল ঘোড়ার। চিঁহিঁহি চিঁহিঁহি করে আর্তনাদ করে উঠল। তার পরেই একপাশে কাত হয়ে গেল গাড়ি। ছিটকে ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল শেলী। দড়াম করে আছড়ে পড়ল শক্ত মাটির ওপর, ঠিক এমন সময় উল্টে গেল গাড়ি। সরাসরি ওর দেহের ওপর আছড়ে পড়ল গাড়ির একটা অংশ। মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল শেলী।

শেলী বুঝতে পারল না কতক্ষণ সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। প্রচণ্ড ব্যথা সর্বাঙ্গে। মাথার মধ্যে কেউ যেন অসংখ্য ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিচ্ছে। প্রতিটি আঘাতের সাথে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। উঠে বসবার চেষ্টা করল শেলী, কিন্তু পারল না। চিৎ হয়ে শুয়ে শক্তি সঞ্চয় করে চারপাশটা দেখতে চেষ্টা করল সে।

কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে উঠে বসল শেলী। দেখল নরম দামী বিছানায় শুয়ে ছিল এতক্ষণ। এমন সময় একজন ফাদার ঢুকলেন ঘরে। পরনে সাদা আলখেল্লা।

'ম্যাডাম,' বিনয়ের হাসি হাসলেন ফাদার, 'আপনি এখন ক্রেইন বাগ মঠে আছেন। নিশ্চিন্তে ঘুমান।'

ফাদার বেরিয়ে যেতে চোখ বন্ধ করল শেলী। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে।

'খুলে বললেই সব বুঝতে পারবেন। আসলে আমার নিজ চোখে দেখা ঘটনা। দশ বছর আগে কাউন্ট বেঁচে ছিল। তখনকার কথা কেউ ভুলতে পারবে না এ তল্লাটের লোকজন।

কাউন্টের কার্যকলাপে ভীষণ রকম ঘাবড়ে যায় আশেপাশের গ্রামবাসীরা।

নানা কুসংস্কারে বিশ্বাসী সহজ সরল লোকগুলো ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চাক্ষুস করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কাউন্টের দুর্গে শুরু হলো শয়তানের রাজত্ব। দুর্গের নানা কাহিনি এমন ভাবে ছড়াতে শুরু করল যে গাঁয়ের মানুষ ভয়ে ওটার ত্রিসীমানাতেও যেতে ভুলে গেল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনিকে এতক্ষণ লক্ষ করছিলেন ফাদার জ্যাকসন। হয়তো তাঁর গল্পটা কতটুকু বিশ্বাস করাতে পারবেন তাই ভাবছেন ফাদার। কিছুক্ষণ চুপ করে আবার শুরু করলেন তিনি। 'কিন্তু ওরা দুর্গের কাছে না গেলে কী হবে, কাউন্ট গ্রামবাসীদের ভুলতে পারল না। এখানে সেখানে লাশ পাওয়া যেতে লাগল। গলায় দাঁতের স্পষ্ট দাগ দেখে সবাই বুঝতে পারল কাজটা কার। ফলে চারপাশের গ্রামবাসীদের মনে আতঙ্কের সাথে যোগ হলো তীব্র ঘৃণা। সুযোগের অপেক্ষায় রইল গ্রামবাসী। কাউন্টকে খতম করতে না পারলে মনে শান্তি পাচ্ছিল না তারা।

'এদিকে কাউন্টের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। দিনে দিনে কেল্লা হয়ে উঠল রহস্যময় ভূতের প্রাসাদ। ভূত-প্রেতদের এক নিরাপদ আড্ডাখানা। সমস্ত প্রাসাদ তাদের দখলে, কেউ নেই তাদের বাধা দেয়। রাতের প্রথম প্রহর থেকেই শুরু হয় তাদের রক্তপান, আশেপাশের গ্রামগুলোতে হানা দিতে তারা তাদের শিকার যোগাড় করে।

'ব্যস, দিন ফুরিয়ে এল কাউন্টের। সহ্যের সীমা অতিক্রম করতেই দল বেঁধে গ্রামবাসী আক্রমণ করে বসল কেল্লা। কেল্লার সবাইকে বন্দী করে এক সাথে পুড়িয়ে মারল আগুনে। শুধু বেঁচে গেল একজন–হ্যারি। কেমন করে যেন হাত ফসকে বেরিয়ে গেল ব্যাটা। ওদের পুড়িয়ে মারার পর থেকেই বন্ধ হয়ে গেল সব অত্যাচার। গ্রামবাসীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু...' অন্যমনস্ক ভাবে গাল চুলকালেন ফাদার জ্যাকসন। 'আজ আবার জেগে উঠেছে ভয়ঙ্কর কাউন্ট। রক্ত পানের নেশা আজও তার আছে। আবার গ্রামবাসীদের চরম দুর্দিন শুরু হবে।'

শেষের কথাটা বোধহয় শুনতে পায়নি জনি, গল্পটা নিয়েই চিন্তা করছিল। স্থির গলায় বলল, 'বেশ সুন্দর গল্প। এখন মন দিয়ে শুনুন কাউন্ট জেগে উঠেছে গ্রামবাসীদের এই কথা শুনিয়ে কোন লাভ নেই। এতে শুধু শুধু আতঙ্কিত হবে ওরা, কী লাভ তাতে। তারচেয়ে চলুন আমরা দু'জনে হানা দেই কেল্লায়। খতম করে ফেলি শয়তানটাকে।

'এতই সোজা?' তিক্ত হাসি ফাদারের মুখে। 'কাউন্ট তো মড়া, মড়াকে আবার মারা খুব কঠিন কাজ।'

'হয়েছে, হয়েছে।' বিদ্রূপের হাসি হাসল জনি। 'কাউন্ট অমর, ওর বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না, এইতো? থাকুন আপনার চিন্তাধারা নিয়ে, আমি একাই যাব কেল্লায়।' ফাদারের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'আরে দয়া করে কচি খোকা ঠাওরাবেন না আমাকে। আক্রমণ করতে চাইছি যখন, তখন আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতাও আমার আছে।'

ফাদার জ্যাকসনের মুখে হাসি দেখা গেল। হয়তো খুশির। বললেন, 'তুমি খুব সাহসী, ইয়ংম্যান। কিন্তু কেল্লায় তোমার সাহসকে বাহবা দিতে কেউ এগিয়ে আসবে না, আসবে কাউন্ট। ভয়ঙ্কর রক্তভৃষ্ণায় ভুগছে সে, তোমাকে কাছে পেলে

খুশিই হবে শয়তানটা।'

'তাতে কী?' জনি রেগে গেল। 'আজ না হয় কাল, ওর মুখোমুখি কাউকে না কাউকে তো দাঁড়াতেই হবে।'

'জনি,' কাছে সরে এলেন ফাদার জ্যাকসন। 'তুমি সুস্থ তো?'

সোজা হয়ে বসল জনি। তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। ফাদারের দিকে, বলল, 'শেলীকে আমি ভালবাসি, ফাদার। ওর দিকে হাত বাড়িয়েছিল কাউন্ট, ঘুমের ঘোরেও সে কথা ভুলতে পারছি না, ফাদার,' করুণ শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

ঝোপের মত ঘন ভুরু জোড়া উঁচু করলেন ফাদার জ্যাকসন, যেন আঘাত পেয়েছেন খুব। 'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, ইয়ংম্যান, আমার নিজের অবস্থাও বেশি ভাল না,' বললেন ফাদার। 'মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছি আমি শেলীর কথা ভেবে। তুমি ঠিকই ভাবছ, কাউন্ট যদি কাউকে আক্রমণের টার্গেট করে থাকে তো হামলাটা আসছে শেলীর ওপর। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। মায়ের কোলের মত নিরাপদ এই মঠ। অশুভ শক্তির কোন ক্ষমতা নেই এখানে ঢোকে।'

'সত্যি বলছেন, ফাদার?' জানতে চাইল জনি।

একটু ইতস্তত করলেন ফাদার জ্যাকসন। 'সাধারণ ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি, কিন্তু সব জিনিসের যেমন ব্যতিক্রম আছে, তেমনি এর ব্যতিক্রম হলো—অশুভ শক্তিকে কেউ যদি স্ব-ইচ্ছায় ডাকে তবে আসতে পারে সে।'

'সেক্ষেত্রে শেলী নিরাপদ একথা ভাবা যায় না,' মৃদু কণ্ঠে বলল জনি।

'যায়,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ফাদার জ্যাকসন। 'এ মঠে যারা আছে সবাই ফাদার। শুভ শক্তির পক্ষে কাজ করছে তারা। স্বেচ্ছায় কেউ নিশ্চয় শয়তানকে ডাকবে না।'

'জানি না,' ক্লান্ত সুরে বলল জনি। 'আমি আমার স্ত্রীকে খুব ভালবাসি, ফাদার। ওর কিছু হলে পাগল হয়ে যাব আমি।' উঠে দাঁড়াল জনি। 'আমি শেলীকে দেখতে যাচ্ছি, ফাদার।' বেরিয়ে এল জনি ফাদারের রুম থেকে।

পিছু পিছু এলেন ফাদার জ্যাকসন। 'আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি, ইয়ংম্যান।'

পথ চলতে চলতেই দেখা হয়ে গেল এক সন্ন্যাসীর সাথে।

'ফাদার,' চেহারাটা বিনয়ে বিগলিত করে তুলল সন্ন্যাসী। 'আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি।'

'ও,' থতমত খেয়ে গেলেন ফাদার জ্যাকসন। 'কিন্তু কেন?'

'গ্রেগরী, ফাদার,' মৃদু কণ্ঠে বলল সন্ন্যাসী। 'আপনার সাথে দেখা করতে চায়।'

'গ্রেগরী,' আপন মনে বললেন ফাদার। জনির দিকে তাকালেন। 'জনি, এই গ্রেগরী একজন ওস্তাদ ছুতোর। কাউন্ট ড্রাকুলার কেল্লার কাছে ওকে পাই আমি, পুরোপুরি মাথা বিগড়ে যাওয়া অবস্থায়। আবোল-তাবোল বকে সারাক্ষণ। ওকে মঠে নিয়ে আসি আমি, সেবাযত্ন করে কিছুটা সুস্থ করে তুলি। কিন্তু কিছুদিন আগে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলে গ্রেগরী, হঠাৎ করেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করে বসে এক সন্ন্যাসী ভাইকে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে বাড়ি মেরে সন্ন্যাসীর মাথা

ফাটিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর সবার অনুরোধে ওকে আমি একটা কামরায় তালাবদ্ধ করে রাখি।' কথা বলতে বলতে গ্রেগরীর রুমের সামনে এসে গেল ওরা। চাবি দিয়ে তালা খুলে ভিতরে ঢুকল সবাই। ছোট্ট ঘর। দশ ফুট বাই আট ফুট। মেঝেটা নোংরা। ঘরের কোণে একটা ভাঙা টেবিল। চেয়ারের ওপর বসে আছে লোকটা। টেবিলের ওপর মরা মাছির স্তূপ জমে আছে।

'ফাদার,' কর্কশ কণ্ঠে বলল গ্রেগরী, 'মাছি খেয়ে দেখেছেন কখনও? চমৎকার স্বাদ।'

টেবিলের ওপর থেকে মরা মাছি খাবলা মেরে তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল গ্রেগরী। তারপর পরম আয়েশে চিবুতে লাগল, যেন উপাদেয় কোন খাবার খাচ্ছে। গা ঘিনঘিন করে উঠল সবার।

বিরক্তির চিহ্ন ফুটল জনির চেহারায়। কোন সন্দেহ নেই, বদ্ধ উন্মাদ ব্যাটা।

'ডেকেছিলে কেন?' ফাদার জ্যাকসন নির্বিকার। 'কোন প্রয়োজন আছে?'

'প্রয়োজন,' বিস্ময় ফুটে উঠল গ্রেগরীর কণ্ঠে। 'আপনার সাথে আমার প্রয়োজন?' অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ল গ্রেগরী।

'গ্রেগরী,' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ফাদারের, তারপর জোর করে ঠোঁটে একটু হাসির আভাস ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'বিনা প্রয়োজনে কখনও তুমি আমাকে ডাকোনি। ভাল করে চিন্তা করে দেখো, কেন ডেকেছ আজ। চিন্তা করো গ্রেগরী, ভাল করে চিন্তা করে দেখো।'

থমকে গেছে গ্রেগরী। কিছুক্ষণ চিন্তা করল নীরবে। সবজান্তার মত মুচকে হাসল, যেন মনে পড়ে গেছে। ড্রয়ার খুলে একটা পার্চমেন্ট কাগজ বের করল। মেলে ধরল টেবিলের ওপর। অসংখ্য নক্সা আঁকা তাতে। 'ফাদার,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে, 'নক্সাটা আজ শেষ করেছি। দেখুন না, পছন্দ হয় কিনা।'

মৃদু হাসলেন ফাদার জ্যাকসন, 'চমৎকার নক্সা হয়েছে তো, তা কীসের নক্সা এঁকেছ গ্রেগরী? যাই এঁকে থাক, কাজটা চমৎকার হয়েছে।'

বেরিয়ে এল সবাই। দরজায় আবার তালা লাগানো হলো।

হঠাৎ দূরে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। তারপরই আওয়াজটা থেমে গেল। কোন গাড়ি এসে থেমে দাঁড়িয়েছে মঠের বাইরে।

'দাঁড়াও জনি,' থেমে দাঁড়ালেন ফাদার জ্যাকসন। জনি দেখল, একজন সন্ন্যাসী দৌড়ে আসছে এদিকে।

'ফাদার!' হাঁপাচ্ছে সন্ন্যাসী। 'কিছু লোক রাতে থাকবে বলে আশ্রয় চাইছে।'

'হবে না,' পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন জ্যাকসন।

এমন চাঁছাছোলা উত্তর আশা করেনি সন্ন্যাসী। একটু থতমত খেয়ে গেল প্রথমে, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু ফাদার, আমাদের মঠের নিয়ম বিপদগ্রস্তকে আশ্রয় দেওয়া।'

চুপ মেরে গেলেন ফাদার জ্যাকসন। বোধহয় কিছু চিন্তা করছেন। 'ঠিক আছে,' বললেন ফাদার। 'আশ্রয় পাবে, তবে মঠের ভিতরে নয়। বাইরে থাকতে দাও ওদের।'

ঘাড় কাত করে মাথা ঝাঁকাল সন্ন্যাসী। চলে গেল।

'একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছিলাম আমি,' মৃদু কণ্ঠে বললেন ফাদার। 'বিপদগ্রস্ত অতিথিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম। কাজটা মোটেই উচিত হত না।'

'আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না,' একটু কঠোর শোনাল জনির গলা। 'অতিথিদের আশ্রয় না দিলেই ভাল করতেন, ফাদার।'

'এটা একটা আশ্রম, ইয়ংম্যান,' মৃদু কণ্ঠে বললেন ফাদার। 'আশ্রয় না দিয়ে কোন উপায় নেই আমাদের।'

রাগতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল জনি। উপলব্ধি করল ঠিক কথাই বলেছেন ফাদার। এটা একটা আশ্রম, আর এখানে বিপদগ্রস্ত সবারই আশ্রয় পাওয়া উচিত। ওরাও তো বিপদে পড়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। 'দুঃখিত, ফাদার,' বলল জনি। দম বন্ধ করে ভাবতে চেষ্টা করল। আবার ভয় পাচ্ছে, একটু কেঁপে গেল ওর গলা। 'ভাইয়া নেই, ভাবী নেই, এই অবস্থায় মাথা ঠিক থাকে?'

'ভয় কী, ইয়ংম্যান,' মৃদু কণ্ঠে বললেন ফাদার জ্যাকসন, যেন কোন ভৌতিক কণ্ঠ। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। সময় সব কিছুই ঠিক করে দেয়। সময়ের চেয়ে সেরা ওষুধ আর কিছু নেই।'

শেলীর রুমে ঢুকল ওরা। বিছানার ওপর বসে আছে শেলী। জনি শেলীর দিকে এগিয়ে গেল। শেলীর বাঁ হাত ধরল ও। 'গুড, এই তো সেরে গেছ।'

ওর চোখে কৌতুকের হাসি দেখে দারুণ লজ্জা পেল শেলী। 'যা, পাজী কোথাকার!' নিচু গলায় বলল শেলী। 'আমি কি তোমার আদর পাবার আশায় পথ চেয়ে বসে আছি।'

'তা হলে,' বিস্মিত হবার ভান করল জনি। 'আমার তো ধারণা ওসবের জন্যেই এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছ তুমি।'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ,' মিষ্টি সুরে হাসল শেলী। 'তোমাকে এতক্ষণ না দেখে, পাগল হবার দশা আমার।'

'তা হলে,' ঘোষণা করল জনি। 'তোমাকে বদ্ধ পাগল হতে হবে এবার। কালই তুমি ইংল্যাণ্ড চলে যাচ্ছ। একা। আমি থেকে যাচ্ছি এখানে। কাউন্ট ড্রাকুলার দিন ফুরিয়ে এসেছে, শেলী। ভাইয়া, ভাবী এদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে প্রথমে, তারপর ইংল্যাণ্ডে মিলিত হচ্ছি দুজনে।' মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল শেলীর মুখ। অজানা আতঙ্কে ওর হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হলো। গায়ের সমস্ত রোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

'ভয় পেয়ো না, মা,' শেলীর মাথায় হাত রাখলেন ফাদার। 'তোমার স্বামী সাহসী। ওকে ওর নিজের কাজ করতে দাও।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল শেলী। ভুল ভেঙেছে শেলীর। কেন জানি ওর মনে একটা স্থির বিশ্বাস ছিল জনি ওকে খুব বেশি ভালবাসে। এখন দেখা যাচ্ছে ভালবাসার বাঁধন ছিন্ন করে জনি পা বাড়াতে চাইছে ভয়ঙ্কর কেল্লার দিকে। মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছে রক্তৃতৃষ্ণায় অস্থির কাউন্ট ড্রাকুলার সামনে।

'ছি,' শেলীর কাঁধে হাত রাখল জনি। 'এত ভয় পাবার কী আছে?'

চোখ মুখ মুছল শেলী চাদরের কোনা দিয়ে। বলল, 'আমার কথা ভেবে কাঁদছি না, জনি। তোমার কথা ভাবছি। ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাও

তুমি...ভাইয়া ভাবী গেছে, যা হবার হয়ে গেছে। তাই বলে তুমি জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দিতে চাইছ...আমার খুব খারাপ লাগছে।'

গলাটা শুকনো ঠেকল জনির। বলল, 'কিন্তু এ ছাড়া করার কিছুই নেই আমার। আমি কী শখ করে প্রাসাদে যেতে চাইছি। প্রতিশোধ...প্রতিশোধ নিতে হবে।' একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জনি, তারপর বেরিয়ে এল ওরা শেলীর রুম থেকে।

জনি বেরিয়ে যেতেই ফাদারও বেরিয়ে গেলেন। অকস্মাৎ মৃত্যুর নীরবতা নেমে এল ঘরের ভেতর। হঠাৎ এক সময় লাফিয়ে উঠল শেলী। বিস্ময়ের ঘোরটা তখনও কাটেনি ওর, ভূতে পাওয়া মানুষের মত বিকৃত সুরে বলল, 'একী, লিলি, তুমি!' এগোতে গেল সে জানালার দিকে।

জানালার বাইরে শার্সির কাঁচে মুখ চেপে ধরে ওর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে লিলি। শুকনো পাতার মত বিবর্ণ মুখ।

'লিলি,' চাপা কণ্ঠে বলল শেলী। জানালার পাশে গিয়ে তাকিয়ে রইল লিলির করুণ মুখের দিকে। নিজেই টের পাচ্ছে, রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে ওর মুখ। বড় করুণ লাগছে লিলির চেহারা। যেন বলতে চাইছে, শেলী, প্লিজ, বড় ঠাণ্ডা বাইরে। দয়া করে জানালাটা খুলে দাও। ভিতরে আসতে দাও । ভিতরে আসতে দাও আমাকে।'

ধীর পায়ে পিছন ফিরতে গিয়েও পারল না শেলী। জানালাটা খুলে দিতেই, এক ঝটকায় শেলীর ডান হাত চেপে ধরল লিলি। দু'চোখে ফুটে উঠল হিংস্রতা। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে শেলীর মুখের দিকে। যেন চেনেই না। একটা ঝাঁকুনি, পর মুহূর্তে স্থির পাথর হয়ে গেল শেলী। ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো। কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল শেলী। আগুনের মত জ্বলছে লিলির দুই চোখ। কয়েক মুহূর্ত একভাবে শেলীর হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল লিলি, তারপর মুখটা নামিয়ে আনল নরম হাতের ওপর। ঘ্যাচ করে নরম মাংসে দাঁত ফুটতেই তীব্র আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল শেলী।

'কী হয়েছে, শেলী!' শেলীর আর্তচিৎকার কানে ঢুকতেই একলাফে রুমে ঢুকে পড়ল জনি। সঙ্গে ফাদার।

'জনি...জনি!' শেলী, জনির বুকে মাথা রেখে উন্মাদিনীর মত কাঁদতে শুরু করল।

'কী হয়েছে, শেলী?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল জনি।

'লিলি...লিলি,' খোলা জানালাটা ইঙ্গিতে দেখাল শেলী। 'আমাকে ডাকল–জানালা খুলে দিতেই দাঁত দিয়ে কামড়ে দিয়েছে।' রক্তাক্ত হাতটা পরীক্ষা করল জনি। শংকিত দৃষ্টিতে দেখল শেলীর হাতে দুটো বড় বড় ক্ষত। রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষত থেকে।

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল জনি। লিলি, পিশাচিনী লিলি। এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝল ও, সত্যি সত্যি ওর সর্বনাশ করে গেছে লিলি।

'জনি,' মৃদু কণ্ঠে বলল ফাদার জ্যাকসন। 'লিলি এসেছিল। কোথাও গুরুতর

একটা ভুল হয়ে গেছে আমাদের। ওই পিশাচিনীর এই মঠে ঢোকা নিষেধ। নিশ্চয় কেউ আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ওকে। সে যাক, আমি ওর সাথে কথা বলতে চাই।'

কিছুক্ষণ নিচু গলায় আলাপ করল ফাদার আর শেলী। 'তার মানে শুধু হাতেই কামড় খেয়েছ তুমি?' হঠাৎ সাগ্রহে জানতে চাইলেন ফাদার জ্যাকসন।

'হ্যাঁ,' বলল শেলী। ফাদার জ্যাকসন তাকালেন জনির দিকে। দু'চোখে আশার আলো। কিন্তু জনি উৎসাহ বোধ করছে না দেখে, ম্লান হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ও শেলীর দিকে, এ জগতেই যেন নেই জনি।

'ভয়ের কিছু নেই,' ঘোষণা করলেন ফাদার জ্যাকসন। 'সামান্য ক্ষত, দু'দিনেই সেরে যাবে। কিন্তু আমাদের এখন প্রথম কাজ শেলীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।' চটপট সিদ্ধান্ত নিলেন ফাদার জ্যাকসন। এগিয়ে গিয়ে কাঁচের একটা শেড তুলে নিলেন। মোমবাতির আগুনে লাল টকটকে করে ফেললেন কাঁচের শেডটা।

'জনি,' বললেন ফাদার। 'হাতটা তুলে ধর। জলদি!'

জনি বিনা বাক্যব্যয়ে শেলীর হাতটা তুলে ধরল জনি। তীব্র আতঙ্কে দুচোখ বন্ধ করে ফেলল শেলী ফাদারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে। কপালে ঘাম বেরুচ্ছে বিন্দু বিন্দু। লাল টকটকে কাঁচের শেডটা চেপে ধরলেন ফাদার ক্ষতচিহ্নের ওপর।

'উফ্, মাগো,' তীব্র ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল শেলী। চামড়া পোড়ার বিশ্রী গন্ধে ভরে গেল ঘর। দগদগে লাল মাংস বেরিয়ে এসেছে। কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ফাদার। কয়েক সেকেণ্ড পর ফিরে এলেন। সঙ্গে অন্য এক অচেনা সন্ন্যাসী। নাম মার্কার।

'মার্কার, মিসেসের দিকে খেয়াল রাখবে। এসো জনি।'

ওরা দু'জন বেরিয়ে এল শেলীর রুম থেকে। খুঁজতে হবে। লিলিকে খুঁজে বের করতে হবে। শেলীকে রক্ষা করতে হবে ওর পৈশাচিক প্রভাব থেকে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই কাজে লেগে গেল মার্কার। পরিষ্কার কাপড়ে মলম লাগিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পট্টি লাগিয়ে ফেলল শেলীর হাতের ক্ষতে।

'কেমন বোধ করছেন, ম্যাডাম?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল মার্কার।

নিজেকে সামলে নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে শেলী। জোর করে হাসার চেষ্টা করল। তবে হাসি ফুটল না মুখে।

রুমে ঢুকল গ্রেগরী।

'মার্কার' গ্রেগরী মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ফাদার পাঠালেন আমাকে, ম্যাডামকে এখনই যেতে হবে তাঁর রুমে।'

কোন উত্তর দিল না মার্কার। রুম থেকে বেরিয়ে এল গ্রেগরী। পিছু পিছু এল শেলী।

রহস্যময় একটা রাত। বেশ কয়েকটি ঘর পেরিয়ে বিশাল এক লাইব্রেরীতে প্রবেশ করল গ্রেগরী। পিছু পিছু এল শেলী। রুমে ঢুকতেই একলাফে উঠে দাঁড়াল চেয়ারে বসে থাকা জীর্ণ-শীর্ণ লোকটা।

কাউন্ট ড্রাকুলা। পরনে কালো আলখেল্লা। আগুন ঝরা চোখে তাকিয়ে আছে শেলীর দিকে। সূচালো দাঁত বেরিয়ে আছে, ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়ল শেলী। দুঃস্বপ্নের মত লাগছে ব্যাপারটা। এরকম বিদঘুটে ঘটনা ঘটতে দেখেও যেন চোখ আর কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না ও। ভাষা না বুঝলেও কাউন্ট ড্রাকুলার হাবভাব দেখে বিপদ আঁচ করতে পেরেছে শেলী, নিঃশব্দ পায়ে শেলীর সামনে এসে দাঁড়াল কাউন্ট ড্রাকুলা। শেলীর দিকে চোখ দুটো স্থির। দাঁত বের করে হাসছে। চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে উঠল একবার। ডান হাতের আঙুল দিয়ে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেলল কালো আলখেল্লা। নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলল বুকের চামড়া। প্রথমে সাদা পরে লাল হয়ে গেল বুক। গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে ওখান থেকে। অলস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট ড্রাকুলা। ইঙ্গিতটা বুঝল শেরী। সম্মোহিতের মত এগিয়ে এল, বুকের ক্ষতচিহ্নে মুখ লাগাল। রক্ত চুষতে যাবে, এমন সময় তীব্র আতঙ্কে চেঁচিয়ে একলাফে পিছিয়ে গেল কাউন্ট ড্রাকুলা। দু'চোখে তীব্র আতঙ্ক আর উদ্বেগের ছায়া। বোকার মত তাকিয়ে আছে শেলীর গলায় ঝুলানো পবিত্র ক্রুশের দিকে। আসলে ওটার স্পর্শ পেয়েই তীব্র আতঙ্কে পিছিয়ে এসেছে সে, শেলীকে ছেড়ে দিয়ে।

'শেলী... শেলী!' জনির কণ্ঠস্বর।

ক্লান্ত পায়ে দরজার কাছে চলে গেল কাউন্ট ড্রাকুলা। হাত বাড়িয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তার আগেই প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠেছে শেলী। 'জনি, জনি দরজা ভেঙে ফেলো...আমি এখানে!'

দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল কাউন্ট ড্রাকুলা। একহাতে শেলীকে জড়িয়ে ধরল শক্ত হাতে। অন্য হাতে বাড়ি মেরে ঝন ঝন করে ভেঙে ফেলল কাঁচের জানালা। জানালা গলে বেরিয়ে এল কাউন্ট ড্রাকুলা। ওর হাতে ইঁদুর ছানার মত ঝুলছে শেলী।

প্রচণ্ড লাথিতে হাট করে খুলে গেল দরজা। একলাফে ভিতরে ঢুকল জনি, পিছনে ফাদার জ্যাকসন। জানালাটা খোলা। অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল জনি। কাউন্টকে দেখতে পাচ্ছে। দৌড়াচ্ছে কাউন্ট, হাত ঝুলছে শেলীর। জানালা গলে এক লাফে নীচে নেমে এল জনি। পিছু পিছু ফাদার জ্যাকসন। কিন্তু না, ওরা ধরতে পারল না কাউন্ট ড্রাকুলাকে।

ফটকের বাইরে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসল কাউন্ট ড্রাকুলা। চাবুকের বাড়ি না খেয়েই ছুটল ঘোড়া।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল জনি। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফাদার জ্যাকসন। 'পালিয়ে গেল হারামজাদা, শয়তানটা! কিন্তু কোথায় যাবে, কতদূর যাবে। আমরা ওকে ধরে ফেলবই। ওর আয়ু শেষ হয়ে গেছে, জনি।'

কোন উত্তর দিল না জনি। এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝল ও, সত্যি সত্যি ওর সর্বনাশ করে গেছে কাউন্ট ড্রাকুলা।

'ফাদার...ফাদার!' গলার স্বরটা কোনমতেই স্বাভাবিক বলা চলে না, প্রতিটি শব্দ চিৎকার করে উচ্চারণ করছে সন্ন্যাসী মার্কার। এরই জিম্মায় ছিল শেলী। 'একটা মেয়েছেলে ধরা পড়েছে। লুকিয়ে ছিল গ্রেগরীর রুমে।'

'মেয়েটা নিশ্চয়ই লিলি,' কঠিন শোনাল ফাদারের গলা। পরমুহূর্তে নরম সুরে বললেন, 'গ্রেগরীর রুমে লুকিয়ে ছিল, তারমানে গ্রেগরীর সাহায্যেই মাঠে ঢুকেছে

ওরা। শোনো, চারদিকে ছড়িয়ে পড় তোমরা। গ্রেগরীকে চাই আমি, জ্যান্ত হোক আর মরা। ওকে ধরার চেষ্টা করবে। বাধা দিলে খতম করে ফেলবে।'

হেঁটে এগিয়ে চলল ওরা, থামল গ্রেগরীর রুমে ঢুকে।

কোন সন্দেহ নেই, মেয়েটা লিলিই। স্তম্ভিত হয়ে গেল জনি। এই কী সেই পরিচিত লিলি ভাবী। ঘামে চকচক করছে মুখ। চোখ দুটো লালচে। নাকের দু'পাশ ফুলে ফুলে উঠছে। লিলির দু'হাত শক্ত করে ধরে আছে দুই শক্ত সবল সন্ন্যাসী। পাগলের মত হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে লিলি, কিন্তু পারছে না।

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল লিলি। জনিকে চিনতেও পারছে না। তারপরই আহত বন্য জন্তুর মত চেঁচাতে শুরু করল, বেসুরো গলায়।

উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করে জনি, চাপা কণ্ঠে ডাকল, 'লিলি ভাবী।' চিনতে পারল না লিলি। না কণ্ঠস্বর, না চেহারা। কোন সাড়া না পেয়ে ম্লান হয়ে গেল জনির মুখ।

জনির কাঁধে হাত রাখলেন ফাদার জ্যাকসন। 'ভুল করছ, জনি। বৃথা চেষ্টা, ও আর এখন তোমার ভাইয়ের বউ নয়। কাউন্ট ড্রাকুলার তৈরি এক রক্ত পিপাসু পিশাচী। ওকে এখনই খতম করা দরকার।'

ফাদারের নির্দেশে লম্বা একটা টেবিলে জোর করে শুইয়ে দেওয়া হলো লিলিকে। একটা শক্ত দড়িতে কষে বাঁধা হলো টেবিলের সাথে লিলির হাত, পা, মাথা এমনকী চুল পর্যন্ত।

শিউরে উঠল জনি। ভাবল, এভাবে তার চোখের সামনে মরে যেতে হচ্ছে লিলিকে। আবার ভাবল, এইতো ভাল হচ্ছে, পিশাচী হয়ে আর ঘুরতে হবে না ভাবীকে।

একজন সন্ন্যাসী সদ্য তৈরি একটা কাঠের গোঁজ নিয়ে এল। কাঁচা কাঠের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। ছুঁচাল ফলাটার দিকে চেয়ে লিলি অপার্থিব কণ্ঠে চেঁচাতে শুরু করল। গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে বাঁধন ছিঁড়তে আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করল সে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। নরম মাংসে আরও কষে বসল শক্ত দড়ি।

শব্দ করে হাসলেন ফাদার। 'এত কাঁচা বুদ্ধি তোমার ভাবিনি। শত চেষ্টা করলেও দড়ির শক্ত বাঁধন ছেঁড়া কোন মতেই সম্ভব নয় তোমার পক্ষে, তার চেয়ে শান্ত ভাবে মেনে নাও শেষ পরিণতি...'

দু'হাতে গোঁজটাকে উঁচু করে ধরলেন ফাদার। চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন মিনিট তিনেক, তারপর দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনলেন দু'হাত, ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর, ছুঁচাল গোঁজ বুকের হাড় ভেদ করে ঢুকে গেল ভেতরে।

শিউরে উঠল রুমের সবাই। গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে বুকের ক্ষত থেকে। তীব্র আর্তনাদ করে উঠল লিলি। দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর। যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে। ধীরে ধীরে আর্তনাদ থেমে গেল। বন্ধ হয়ে গেল চোখের পাতা। শান্ত মুখ।

পাঁচ সেকেণ্ড লিলির দিকে তাকিয়ে রইল জনি। দু'চোখ জলে ভরে উঠল। ভাইয়া নেই, ভাবীও চলে গেল। হঠাৎ করেই বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো নিজেকে।

'জনি,' শান্ত কণ্ঠে বললেন ফাদার জ্যাকসন, 'ব্যাপারটা সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে তোমার, জানি। কিন্তু ভেবে দেখো, সত্যিকারের মৃত্যুই ওকে পৌঁছে দিয়েছে তোমার ভাইয়ের কাছে।'

মাথা নাড়ল জনি।

'শক্ত হও, জনি,' মৃদু কণ্ঠে বললেন ফাদার। 'কাল ভোরেই আমরা অভিশপ্ত কেল্লায় যাব। উদ্ধার করে আনব তোমার স্ত্রীকে।'

'কিন্তু,' বলল জনি, 'আজ রাতেই যদি কোন অঘটন ঘটে যায়? কাউন্ট ড্রাকুলার হাতে বন্দিনী আমার স্ত্রী এ কথা যে কোনমতে ভুলতে পারছি না আমি।'

'কিচ্ছু ভয় নেই,' অভয় দিলেন ফাদার। কেল্লা এখান থেকে বহুদূর। ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে কাউন্ট ড্রাকুলা। বিশ্রামের প্রয়োজন আছে কাউন্টের। তা ছাড়া, যতক্ষণ গলায় ঝুলছে পবিত্র ক্রুশ ততক্ষণ সম্পূর্ণ নিরাপদ শেলী। ওকে ঘাঁটাতে সাহস পাবে না কাউন্ট ড্রাকুলা।'

'ফাদার,' ঘরে ঢুকল একজন সন্ন্যাসী। 'গ্রেগরীকে পাওয়া গেছে। ওকে নিয়ে কী করব?'

'তালা দিয়ে আটকে রেখো একটা ঘরে। খবরদার, খেয়াল রাখবে যেন কোনমতেই পালাতে না পারে।' মৃদু গলায় বললেন ফাদার। বেরিয়ে এলেন রুম ছেড়ে। ওকে অনুসরণ করল জনি।

নিজের রুমে ঢুকলেন ফাদার। একটা বইয়ের তাকের ভিতর থেকে বের করলেন গুলি ভর্তি রাইফেল। এগিয়ে দিলেন জনির দিকে। 'আমি সন্ন্যাসী,' কঠিন সুরে বললেন। 'মানুষ হত্যা করা আমার কাছে মহা পাপ। কিন্তু তুমি তা পারো। এ রাইফেলে গুলি ভরা আছে। হ্যারীর মৃতদেহ দেখতে চাই আমি।'

শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জনি রাইফেলের দিকে। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল ও। শক্ত মুঠিতে ধরল রাইফেল।

রাত এখন অনেক। দুটো বালিশের ওপর মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছে জনি। সকাল হতে এখনও অনেক দেরি। মনটা দমে গেছে ওর। শেলী কোথায়? চিন্তার ঝড় উঠেছে ওর মাথায়। আচ্ছা, শেলীর ওপর কি আজ রাতেই হামলা চালাবে কাউন্ট ড্রাকুলা? আজ রাতেই কি রক্ত পান করতে চাইবে? এই আশঙ্কা মনে উদয় হতেই মুখটা কঠোর হয়ে উঠল জনির। বিছানার ওপর উঠে বসল ও।

এতক্ষণে হয়তো কেল্লায় পৌঁছে গেছে কাউন্ট ড্রাকুলা, নাকি পৌঁছয়নি?

ঘুম নেই। ঘুম নেই। উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করছে জনি। চিন্তা করতেও কষ্ট হচ্ছে ওর। ঘামে চকচক করছে মুখ। চোখ দুটো লালচে। মনে মনে বলল, 'শেলী, প্রতিশোধ নেব আমি। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ। বিশ্বাস করো, যেমন করে পারি প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব।'

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল ও। ভৌতিক নীরবতা চারদিকে। জনমানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মাথার ওপরে আবছা আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ।

একটু পায়চারী করে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করল জনি। ফিরে এল নিজের ঘরে। দরজাটা লাগিয়ে দিল। আজ রাতটা বড়ই বিশ্রী। আর কি ঘুম আসবে না?

ভোর হবার আগেই জনির রুমে ঢুকলেন ফাদার। জনির অবস্থা দেখে আঁতকে উঠলেন। মাত্র এক রাতের দুশ্চিন্তায় আগাগোড়া বদলে গেছে প্রাণবন্ত ছেলেটা। জনির চোখের দৃষ্টিতে শূন্যতা, কপালে ঘাম, চুল এলোমেলো। ফ্যাকাসে মুখ দেখে মনে হয় সারারাত জেগেই কাটিয়েছে। নাহ্, মনে মনে স্বীকার করলেন ফাদার বউটাকে সত্যি ভালবাসে ছেলেটা। 'কিছু খাবে, জনি?' মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ফাদার। মাথা নাড়ল জনি।

'এসো,' হাত ধরে টান দিলেন ফাদার। 'তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বসি। যাত্রা শুরু করি।' একটু ইতস্তত করলেন ফাদার। তারপর বলেই ফেললেন, 'তোমার জন্য একটা সুসংবাদ আছে, জনি। গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি, এখান থেকে বিশ মাইল দূরে আছে কাউন্ট ড্রাকুলা। কাল রাতে কেল্লায় যায়নি। হয়তো ওর মনে ভয় ছিল আমরা কেল্লা আক্রমণ করতে পারি, তাই আমাদের ফাঁকি দেয়ার জন্য অন্য পথ ধরেছে শয়তানটা। এখনও বিশ্রাম নিচ্ছে বদমাশটা। সাথে অবশ্য হ্যারী ব্যাটাও আছে। আমি শর্টকাট একটা রাস্তা চিনি। চলো এগুনো যাক, দেখি কী আছে ভাগ্যে।'

সামনের উঁচু কোচোয়ানের আসনে উঠে বসলেন ফাদার। চাবুক মারার সাথে সাথে উড়ে চলল ঘোড়া দুটো। শীতকালের চমৎকার দিন। পরিষ্কার নীল আকাশ।

একটা উপত্যকার মাঝখান দিয়ে উত্তর দিকে ছুটে চলেছে ঘোড়া। দক্ষ কোচোয়ান পেয়ে প্রাণ খুলে দৌড়াচ্ছে ঘোড়া দুটো। দু'পাশে তীর বেগে সরে যাচ্ছে গাছ-গাছালি, ছোটখাট পাহাড়, কখনও বা ছোটখাট মাঠ।

দিনের আলোয় চমৎকার লাগছে চারদিক। না থেমে একনাগাড়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ঘোড়া চালিয়ে গেলেন ফাদার। দু'ধারের দৃশ্য বদলাতে শুরু করেছে। সূর্য ডুবু ডুবু। আকাশচুম্বী এক পর্বতের পাশে গাড়ি দাঁড় করালেন ফাদার। 'জনি,' পাহাড়ের নীচে দিয়ে একটা সরু পথ চলে গেছে, সেদিকে ইঙ্গিতে দেখালেন ফাদার, 'আমার হিসাবে যদি ভুল না হয়, মিনিট দশেকের ভেতর এই পথে কাউন্ট ড্রাকুলার ঘোড়ার গাড়ি আসবে। তুমি বরং সামনের বড় গাছটার মগডালে উঠে, চারপাশটা দেখে নাও।'

মাথা ঝাঁকাল জনি। তর তর করে গাছ বেয়ে উঠে গেল মগডালে। চারপাশে তাকাল তীক্ষ্ণ নজরে। আসছে। পুবদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল জনি। আসছে গাড়িটা। ঠিকই অনুমান করেছেন ফাদার। তর তর করে নেমে এল জনি। 'আসছে, ফাদার। শয়তানটা আসছে।' চেঁচিয়ে উঠল জনি। ঘোড়াসহ গাড়িটা লুকিয়ে ফেললেন ফাদার, একটা বড় পাথরের আড়ালে। পাহাড়ের পাদদেশে গভীর কালো ছায়া। জনি রাইফেল বাগিয়ে ধরল। চারদিক স্থির, বাতাসের কাঁপনটুকু পর্যন্ত নেই। সামনের সরু পথ বেয়ে এগিয়ে আসবে গাড়ি, ফাদারের অনুমান। হলোও তাই। নীচের সরুপথ বেয়ে মন্থর বেগে এগিয়ে এল গাড়িটা। খুব ধীরে ধীরে চলছে। কোচোয়ানের আসনে বসে আছে হ্যারী। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে। রাইফেলের নল অনুসরণ করল হ্যারীর হৃৎপিণ্ডটাকে। কিন্তু তখনই গুলি করতে সাহস পেল না জনি। কোন কারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই বেড়ে যাবে ঘোড়ার গতি। পালিয়ে যাবে শয়তানগুলো।

আসছে...এগিয়ে আসছে...কাছে...আরও কাছে। ধারাল একটু হাসি ফুটল জনির ঠোঁটে, মিলিয়ে গেল তখুনি।

ঠিক নীচেই এসে গেছে গাড়িটা। লক্ষ্য স্থির করার জন্যে রাইফেলটা আরেকটু সামনে বাড়িয়ে দিল জনি। ট্রিগারে চেপে বসা তর্জনীটা নিশপিশ করছে।

খুব ধীরে ধীরে হ্যারীর হৃৎপিণ্ড বরাবর লক্ষ্য স্থির করল জনি। তারপর টিপে দিল ট্রিগার। গুলির শব্দ বিস্ফোরণের মত শোনাল নির্জন প্রান্তরে। শূন্যে লাফিয়ে উঠল হ্যারী হৃৎপিণ্ড বরাবর গুলি খেয়ে। দ্বিতীয় বুলেট খেলো শূন্যে থাকতেই, মাথাটা গুঁড়িয়ে গেল। সাদা মগজ বেরিয়ে এল ক্ষতস্থান থেকে। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল লাশটা।

গুলির শব্দে দু'পা শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে উঠল ঘোড়া দুটো। ছাদের ওপর বাঁধা দুটো কফিন দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

বাতাসের স্পন্দন টের পাচ্ছে না জনি, অসহ্য গরম লাগছে। দরদর করে ঘামছে সারা শরীর। কারণটা ঠিক বুঝতে পারছে না—হয়তো অতিরিক্ত উত্তেজনায় অসুস্থ হয়ে পড়ছে সে।

একলাফে নীচে নেমে এল জনি। প্রথম কফিনটা খুলে ফেলল সে। তারপরই পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল ওর শরীর। কফিনে শুয়ে আছে শেলী। দুচোখ খোলা। দু'সেকেণ্ড কথা বলল না শেলী। তারপরই তীব্র আবেগে চেঁচিয়ে উঠল, 'জনি... জনি...জনি!'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল জনির, ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। নাহ্। সম্পূর্ণ সুস্থ আছে শেলী। এই মিষ্টি হাসি শেলীরই, কোন পিশাচীর নয়। হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিতেই সটান এক লাফে খাড়া হলো শেলী। পাগলের মত জড়িয়ে ধরল জনিকে। নাক মুখ ঘষতে শুরু করল জনির বুকে।

'জনি!' আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই একলাফে ফাদারের পাশে চলে গেল জনি। অন্য কফিনটা খুলে ফেলেছেন ফাদার। ওতে শুয়ে আছে কাউণ্ট ড্রাকুলা। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়েই তীব্র ঘৃণায় রী রী করে উঠল জনির সর্বাঙ্গ। কুৎসিত হাসিতে বিকৃত হয়ে রয়েছে তার মুখ চোখ। যেন মজা পাচ্ছে। হাসি হাসি মুখ কাউণ্ট ড্রাকুলার। দু'ঠোঁটের কোণ ঠেলে বেরিয়ে আছে দুটো দাঁত।

'সাবধান, জনি,' সতর্ক করলেন ফাদার। 'জলদি সরে এসো কফিনের কাছ থেকে। সূর্য ডুবে গেছে। জেগে উঠবে কাউণ্ট।'

হঠাৎ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল শেলীর চোখ দুটো। কফিনের ভিতর থেকে সটান উঠে দাঁড়িয়েছে কাউণ্ট ড্রাকুলা। খপ করে চেপে ধরেছে জনির একটা কব্জি।

প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল জনি। কিন্তু পারছে না। রাইফেলটা ছুঁড়ে দিল জনি। সেটা খপ করে ধরে ফেলল শেলী। দৌড় দিল কাউণ্ট ড্রাকুলা। ইঁদুর ছানার মত ওর হাতে ঝুলছে জনি। সামনে উঁচু পাহাড়। থমকে দাঁড়াল কাউণ্ট ড্রাকুলা। পালাবার পথ নেই। ভয়ঙ্কর গর্জন বেরিয়ে এল কাউণ্ট ড্রাকুলার মুখ থেকে। কেঁপে উঠল চারপাশের নির্জনতা।

'শেলী,' চেঁচিয়ে উঠল জনি। 'তাকিয়ে দেখছ কী? গুলি চালাও। খতম করে

ফেলো শয়তানটাকে!'

রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করল শেলী। তারপর শুরু করল গুলি বর্ষণ।

প্রথম গুলি লাগলই না। বাতাসে শিস কেটে চলে গেল কাউন্ট ড্রাকুলার কানের পাশ দিয়ে।

'গুলি করে কাউন্ট ড্রাকুলাকে তো মারা যায় না, মা,' বিষণ্ন গলায় বললেন ফাদার। দু'সেকেণ্ড চিন্তা করেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পেয়েছি...চমৎকার একটা বুদ্ধি পেয়েছি। চালাও গুলি। পিছনে বরফের চূড়া ধসিয়ে দাও। বরফের মাঝে ডুবে মরুক শয়তানটা। পানি...পানিই ওকে মারার অন্যতম অস্ত্র।'

তাই করল শেলী। বেশ কয়েকটি গুলির আঘাত লাগতেই ওপর থেকে নেমে এল বিশাল বরফের চাঁই। সেদিকে চেয়ে আহত জন্তুর মত চেঁচিয়ে উঠল কাউন্ট ড্রাকুলা! এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জনি। ছোট ছোট দুই লাফে চলে এল শেলীর পাশে। থাবা মেরে শেলীর হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিলেন ফাদার। তারপর কোন বিরতি ছাড়াই শুরু করলেন গুলি বর্ষণ। এখানে সেখানে অসংখ্য ফাটল সৃষ্টি হলো বরফের গায়ে। ওপর থেকে নেমে এল বরফের ধস।

কলে পড়া ইঁদুরের মত ছুটোছুটি শুরু করল কাউন্ট ড্রাকুলা, সেই সাথে সমানে আর্তনাদ করছে। দৌড়ে শেলীদের কাছে চলে আসতে চাইল। কিন্তু পারল না। মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বরফের স্তর। আস্তে আস্তে চারপাশ থেকে ঝুর ঝুর করে বরফ পড়তে শুরু করল। বরফে তলিয়ে গেল কাউন্ট ড্রাকুলা। ধীরে ধীরে থেমে গেল ওর হিংস্র গর্জন। তারপর বরফের নীচে একেবারে মিলিয়ে গেল কাউন্ট ড্রাকুলা।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ফাদার জ্যাকসন। সাদা বরফে তাকিয়ে আছেন। কোথাও কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই কাউন্ট ড্রাকুলার। এখনও ওপর থেকে বরফের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাঁই নেমে আসছে। সেদিকে বিষণ্ন ভাবে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'কাউন্ট ড্রাকুলা আর ফিরবে না,' ক্লান্ত গলায় বললেন তিনি। 'সব শেষ। চলো এবার ফেরা যাক।'

কোন উত্তর দিল না জনি। বুকে জড়িয়ে ধরা শেলীর দিকে তাকাল। ভাবল, এবার ফেরার পালা। কিন্তু খচ্ করে কলজেয় ছুরির ঘা লাগছে কেন? বারে বারে স্মৃতির মণিকোঠায় কেন ভেসে উঠছে—ভাইয়া-ভাবীর মুখচ্ছবি। কারণ ওরা আর যে ফিরবে না কোন দিন।

মহসীন কবির

পুনরুত্থান

এক

সাতাশ বছর। হ্যাঁ, ঠিক সাতাশ বছর। পাপ পঙ্কিল একটি দুর্ঘটনা বিস্মৃত হবার জন্য সাতাশ বছর যথেষ্ট সময়। কিন্তু সাতাশ বছর পর যদি দুর্ঘটনার নায়ক একই সময়ে আবার সেই পুরানো জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তখন, কখনও হয়তো অতীত আবার অবিকৃত চেহারায় তার সামনে এসে উপস্থিত হয়।

রকিবুল হোসেন রাস্তার মোড়ে এসে স্থির দাঁড়িয়ে গেলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন কোনও কিছুই বদলায়নি। এই তো সেই সরু, কাঁচা পায়ে চলা পথ। একটু এগিয়ে গেলেই সেই ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা আদি এবং অবিকৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তেঁতুল গাছটার ঠিক উল্টো দিকে সেই পচা ডোবাটাও আগের মতই আছে। আর আশ্চর্য! সেদিনের মত আজও আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা। টিপটিপ বৃষ্টি। সাতাশ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও দুটি দিন হুবহু এক রকম কী করে হয়?

বহু বছর আগের সেই মেঘলা গুমোট রাতের ছবিটি দিনের আলোর মতই রকিবুল হোসেনের মনের পর্দায় ভেসে উঠল। মস্তিষ্ক তার অগণিত কোষের কোনও একটিতে সযত্নে এই স্মৃতি সংরক্ষণ করে রেখেছিল। আজ এক মোক্ষম অজুহাত পেয়ে সে তাকে উগ্‌রে দিল।

দুই

তখন রকিবুল হোসেন ছাব্বিশ বছরের যুবক। সবে বি. এ পাশ করেছেন এবং মাসিক সাড়ে সাতশো টাকা বেতনে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছেন। পরিবার বলতে কেউ নেই। গ্রামের একটি অবস্থাপন্ন গৃহস্থ বাড়িতে লজিং থাকেন।

রকিবুল হোসেনের নেশা ছিল আড্ডা দেয়া। নিয়মিত বন্ধুদের সাথে তাস পেটাতে পেটাতে আড্ডা না দিলে যেন তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসত। প্রতি শুক্র এবং শনিবার বিকেলে তিনি ছাত্র পড়াতেন না। সাইকেলে চেপে চলে যেতেন গঞ্জের বাজারে। গভীর রাত পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিয়ে তাস পিটিয়ে আবার সাইকেলে প্যাডেল মেরে চলে আসতেন বাড়িতে। এ ছাড়া আর কোনও বদভ্যাস বা নেশা তাঁর ছিল না। গ্রামের লোকে তাঁকে সম্মানই করত। আসলে তিনি ছিলেন গ্রামের একমাত্র বি.এ পাশ ব্যক্তি। ভাল শিক্ষক হিসেবেও একটা সুনাম ছিল তাঁর।

সেদিন ছিল উনিশে শ্রাবণ। সেদিনও তিনি আড্ডা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। নিশুতি রাত। ঘন, কালো, নিরেট মেঘে আকাশ ঢাকা। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই সাথে মেঘের গুরুগুরু শব্দ তো আছেই। অনিয়মিত বিরতিতে কলজে কাঁপানো শব্দে বাজ পড়ছে। বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে মেঠো পথ। রকিবুল হোসেনকে সাইকেল চালাতে হচ্ছে অত্যন্ত সাবধানে। তাঁর একহাতে দু'ব্যাটারির একটা টর্চ টিমটিম করে জ্বলছে। ব্যাটারি ডাউন। 'দুত্তোরি!' মনে মনে আফসোস করলেন তিনি। বন্ধুদের কথামত আজ রাতটা গঞ্জে কাটিয়ে এলেই হত।

ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার তলায় পৌঁছাতেই কে যেন করুণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'এই যে, শুনতেছেন?'

রকিবুল হোসেন সাইকেল থামিয়ে টর্চের আলো ফেললেন এবং হতভম্ব হয়ে দেখলেন সতেরো-আঠারো বছর বয়সী একটি মেয়ে গাছের নীচে জুবুথুবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত অসহায় ভঙ্গি তিনি আগে কখনও দেখেননি। মেয়েটির পরনে লাল ডুরে শাড়ি। খালি পা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বৃষ্টিতে ভিজে চুপ্‌সে গেছে। কাঁপছে হি হি করে।

রকিবুল হোসেনের পরোপকারী হিসেবে পরিচিতি আছে। তিনি সাইকেল রেখে মেয়েটির দিকে এগোলেন। আলো ফেললেন মেয়েটির মুখে। এক আশ্চর্য স্নিগ্ধতা মেয়েটির নিষ্পাপ চেহারায়। কোনও মানুষের চোখে এত অসহায়ত্ব কী করে থাকে! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে? নাম কী তোমার? একা মেয়েমানুষ এত রাতে এখানে কী করছ?'

মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি মালা। বাড়ি থেইকা পলাইয়া আসছি। আমার দুলাভাই আমারে...। এই গেরামে আমার মামাবাড়ি। আমারে একটু সেইখানে দিয়া আসেন। একটু দয়া করেন।'

একজন মানুষের দুটি সত্তা থাকে। একটি তার বিবেক, অপরটি কামনা। নিতান্ত মহাপুরুষ ছাড়া অধিকাংশ সাধারণ মানুষেরই দ্বিতীয় সত্তাটি বেশি প্রকট হয়।

রকিবুল হোসেনের তখন তরুণ বয়স। অবিবাহিত। আর সেদিন বন্ধুদের সাথে আড্ডাতেও উঠে এসেছে যৌনতা। বন্ধুরা তাস পেটাতে পেটাতে একে একে তাদের নারীঘটিত রগ্‌রগে অভিজ্ঞতাগুলো বলে যাচ্ছিল। রকিবুল হোসেনের এ ধরনের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি শুধু শুনছিলেন আর ভেতরে ভেতরে অস্থির হচ্ছিলেন।

সেদিন সেই দুর্যোগের রাতে একটি অসহায় নারীকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পেয়ে তাঁর কামনা যেন বিবেককে সপাটে চপেটাঘাত করল। টর্চের টিমটিমে আলোয় তিনি দেখলেন লাল সুতির শাড়িটি বৃষ্টিতে ভিজে লেপ্টে গেছে মেয়েটির শরীরে। যথাস্থান থেকে অনেকটাই সরে গেছে সেটা। মেয়েটির ফর্সা গ্রীবা, বুক, নাভি, উরু এবং আরও কিছু বিপজ্জনক এলাকা উন্মুক্ত। ঘনঘন বিদ্যুতের চমক যেন ক্ষণে ক্ষণে সেই বিপজ্জনক অঙ্গগুলোকে আরও প্রকট করে তুলছিল রকিবুল হোসেনের চোখে। মেয়েটির অসহায় চোখের আকুতি ভুলে গেলেন তিনি। তাঁর

ভিতরের আদিম সত্তাটি যেন শরীর ফুঁড়ে বাইরে চলে এল। বুভুক্ষু কুকুরের মত তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন মেয়েটির উপর।

ছায়াছবির পর্দার মতই পরবর্তী দৃশ্য রকিবুল হোসেনের মনের পর্দায় ভেসে উঠল। মেয়েটি বসে ছিল উবু হয়ে। নগ্ন। কাঁপছিল। গুঙিয়ে উঠছিল একটু পরপর। তার গালে, বুকে, তলপেটে এবং উরুতে ক্ষতচিহ্ন।

রকিবুল হোসেনের সংবিৎ ফিরল। এ তিনি কী করলেন? গ্রামে যদি একথা জানাজানি হয়, তখন? পাপ নাকি কখনও চাপা থাকে না! গ্রামে তাঁর এত সম্মান! বয়স্করা পর্যন্ত তাঁকে দেখে সালাম দেয়। তাঁর এই সম্মান ধুলোয় মিলিয়ে যাবে? তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন সাইকেলের দিকে। যত দ্রুত সম্ভব সরে পড়া দরকার।

মেয়েটি পেছন থেকে তাঁর প্যান্ট খামচে ধরল। রকিবুল হোসেন পেছন ফিরে তাকালেন এবং দেখলেন এক অপার্থিব মিনতি মেয়েটির চোখে-মুখে। যেন সে নিঃশব্দে বলছে, 'আমায় ফেলে যেয়ো না। যা নেবার তা তো নিয়েছ। এখন আমাকে আমার মামাবাড়িতে পৌঁছে দাও।'

কিন্তু সেই মিনতি বোঝার মত অবস্থা তখন রকিবুল হোসেনের ছিল না। তিনি তখন ব্যস্ত তাঁর সম্মান নিয়ে। এই ঘটনা জানাজানি হলে সর্বনাশ! সম্মান তো যাবেই, নির্ঘাত জেল। তিনি সজোরে পা ঝাড়া দিলেন। বৃষ্টিতে ভিজে মাটির রাস্তা তখন পিচ্ছিল। মেয়েটি ছিটকে গেল এবং পিছলে সোজা ডোবার মধ্যে গিয়ে পড়ল। বোধহয় সে সাঁতার জানত না। কিছুক্ষণ বুদ্‌বুদ্‌ তুলে স্থির হয়ে গেল ডোবার পানি।

রকিবুল হোসেনের মাথা খারাপের মত হয়ে গেল। শোঁ শোঁ করে বয়ে চলা বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে চিন্তা চলতে লাগল তাঁর মাথায়। একে ধর্ষণ, তার উপরে খুন। তাঁর ফাঁসি কেউ ঠেকাতে পারবে না। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি। এক ধাক্কা দিয়ে সাইকেলটাকেও ফেলে দিলেন ডোবায়। এই জায়গায় তাঁর অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ রাখা যাবে না। তিনি উদভ্রান্তের মত ছুটে চললেন স্টেশনের দিকে। সে রাতেই ভোর পাঁচটার ট্রেন ধরে চলে এলেন ঢাকায়।

তাঁর পকেটে তখন সদ্য বেতন পাওয়া সাতশো টাকা। জীবিকার তাগিদে তাই দিয়ে তিনি প্রথমে ফুটপাতে কাঠের পুতুলের ব্যবসা শুরু করেন। ধীরে ধীরে সেই ব্যবসা একসময় ফুলে ফেঁপে উঠল। ঢাকায় কাঠের ফার্নিচারের সবচেয়ে বড় ব্যবসাটা এখন তাঁর। স্কুল শিক্ষক রকিবুল হোসেন এখন ডাকসাইটে ব্যবসায়ী।

সাতাশ বছর পর আজ এই গ্রামে তিনি আবার এসেছেন। তবে সেটা ব্যবসার কাজে। কাঠ সংগ্রহের জন্য একটা বড় বাগান কিনতে চাচ্ছেন তিনি। আজ তিনি বাগানটা দেখতে এসেছেন।

তিন

রকিবুল হোসেন এগোতে ভয় পাচ্ছেন।

কেন? তিনি কি ভূত বিশ্বাস করেন? না, কস্মিনকালেও করেন না। তবে? তবে কি তার অপরাধও পুরনো পাপবোধ জেগে উঠেছে?

রকিবুল হোসেন মাথা থেকে এসব ফালতু চিন্তা ঝেড়ে ফেললেন। সাতাশ বছর আগের ঘটনা নিশ্চয়ই কেউ মনে রাখেনি। সেই রকিবুল হোসেনের সাথে আজকের রকিবুল হোসেনের এক চুলও সাদৃশ্য নেই। তখন রকিবুল হোসেন ছিলেন সাড়ে সাতশো টাকার স্কুল মাস্টার, আজ তিনি বিজ্‌নেস্ ম্যাগনেট। তাঁর চেহারায়ও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কানের পাশে রূপোলি ছোঁয়া, মাথার সামনে সুখ-টাকের আভাস, শরীরও ভারী। আর যদি কেউ চিনে ফেলেও, তিনি পরোয়া করেন না। টাকা দিয়ে তিনি সম্মান কিনেছেন, প্রয়োজন হলে আইনকেও কিনে নিতে পারবেন। টাকার আছে প্রবল সম্মোহনী শক্তি।

ট্রাভেল ব্যাগটা কাঁধে ঝোলালেন রকিবুল হোসেন। হাতের শক্তিশালী ইলেকট্রিক টর্চটা জ্বেলে এগোলেন সামনে। দুনিয়া কাঁপিয়ে বাজ পড়ল কোথাও।

তেঁতুল গাছটার কাছাকাছি এসে পড়েছেন তিনি। আশপাশে কোথাও তাকাচ্ছেন না। না গাছটার দিকে, না ডোবাটার দিকে। বৃষ্টিতে ব্যাঙের কোরাস্ চলেছে একটানা। রকিবুল হোসেন দ্রুত এগিয়ে চলেছেন টর্চের ফোকাস অনুসরণ করে। একটু আগের ভয়টা আর ততটা নেই এখন। মালা নামের মেয়েটির কথা মনে পড়তে তিনি যুগপৎ অপরাধবোধ এবং আত্মতৃপ্তি বোধ করলেন। অপরাধবোধ এই কারণে যে একটি নিষ্পাপ মেয়ের সম্ভ্রম ছিনিয়ে নেয়ার মত অমার্জনীয় অপরাধ তিনি করেছেন। আর আত্মতৃপ্তির কারণটা হচ্ছে, ওই কর্মটি করেছিলেন বলেই আজ তিনি কোটিপতি।

হঠাৎ ব্যাঙের ডাক থেমে গেল। বুঝি বা কারও অস্তিত্ব টের পেয়েছে তারা। এক অপার্থিব নীরবতায় থমকে গেল যেন প্রকৃতি। শুধু ঝিরিঝিরি বৃষ্টির একটানা শব্দ। সেই শব্দ ছাপিয়ে রকিবুল হোসেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন, 'এই যে, শুনতেছেন?'

রকিবুল হোসেন স্থির দাঁড়িয়ে গেলেন। কে ডাকছে! তাঁর পাপ পংকিল অতীত? সঙ্গে সঙ্গে পায়ে যেন শেকড় গজিয়ে গেল তাঁর। আস্তে আস্তে টর্চের ফোকাস ঘোরালেন তিনি। যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর হৃৎপিণ্ড গলার কাছে উঠে এল।

টর্চের তীব্র আলোয় তিনি দেখলেন একটি মেয়ে তেঁতুল গাছ থেকে নেমে আসছে। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। মাথা নীচের দিকে দিয়ে টিকটিকির মত গাছ বেয়ে নেমে এল সে। উবু হয়ে বসল গাছের নীচে। রকিবুল হোসেনের কণ্ঠনালী শুকিয়ে এল। কে? মালা না! সাতাশ বছর আগের সেই মালা। সেই মায়াবী মুখ। মিনতি

ভরা চোখ। কিন্তু মালাকে তো তিনি...

তেঁতুল গাছের নীচে উবু হয়ে বসে ফোঁপাচ্ছে মেয়েটি। অবিকল সাতাশ বছর আগের সেই দৃশ্য। তার শরীরের ক্ষতচিহ্নগুলো একেবারে টাটকা। টর্চের আলোয় চক্‌চক্ করছে বুক, তলপেট এবং উরুর তাজা রক্তচিহ্ন। রকিবুল হোসেন স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছেন। এ কী করে হয়? টাইম ডাইমেনশনে কি কোনও সমস্যা হয়েছে? অজানা কোন উপায়ে কি সাতাশ বছর আগের সেই রাতকে প্রকৃতি তাঁর সামনে উপস্থিত করেছে? মেয়েটি হঠাৎ মিহি কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমারে একটু আমার মামাবাড়ি রাইখা আসেন।' পরমুহূর্তে ঝট্ করে চোখ তুলে সে সরাসরি তাকাল রকিবুল হোসেনের দিকে।

রকিবুল হোসেনের হৃৎপিণ্ড এবার গলা থেকে আলজিহ্বায় এসে ঠেকল। সেই মুখ, চোখ। অথচ এখন এই চোখে মিনতি নেই। আছে শুধু প্রতিহিংসা। লাফ দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেলেন রকিবুল হোসেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, 'কে? কে তুমি?'

মালা এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। একটি নগ্ন মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। টর্চের আলোয় রকিবুল হোসেন এই দৃশ্য দেখলেন এবং নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর নড়াচড়া করার ক্ষমতা যেন কেড়ে নেয়া হয়েছে। মালা গলার স্বর টেনে টেনে বলতে লাগল, 'তুমি এত রাইতে একা একা যাইতেছ। বড় দরদ লাগে গো! আমারে তুমি চিনছ? আমি মালা গো, মালা! তুমি কি আমারে চিনছ?'

রকিবুল হোসেন নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন। কোনও কিছুই তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটাই তাঁর কাছে অপার্থিব মনে হচ্ছে। মালা আরও এগিয়ে এসেছে। তার দু'চোখে তীব্র প্রতিহিংসা। রকিবুল হোসেন কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি...তুমি এখানে কী করছ?'

'আমি তো এই তেঁতুল গাছেই থাকি। কুলটা মাইয়ারে কে জায়গা দিব, কও। এহানেই থাকি, আর তোমার সাইকেল পাহারা দেই। এত বড় বোঝা লইয়া তুমি হাঁটতেছ। বড় দরদ লাগে গো! আমি জানি তুমি আইজ আসবা। তোমার সাইকেল পানি থেইকা তুইলা রাখছি। সাইকেল লইয়া যাও!'

রকিবুল হোসেন দেখলেন তাঁর যৌবনের ফিনিক্স সাইকেলটা তেঁতুল গাছে ঠেস্ দিয়ে রাখা আছে। ওটাকে বরং সাইকেলের ফসিল বলা যেতে পারে। কোনও রকমে চেনা যায়। সাতাশ বছর পানিতে চোবানো থাকলে যা হয়। রকিবুল হোসেনের কাঁধ থেকে ট্রাভেল ব্যাগটা পড়ে গেল। মাখামাখি হয়ে গেল কাদায়। প্রাণান্ত চেষ্টায় একটা ঢোক গিললেন তিনি। কিন্তু সেই ঢোকে তাঁর শুকিয়ে খস্‌খসে হয়ে যাওয়া গলা খুব একটা ভিজল না। শরীর বেয়ে দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে। সেই ঘাম বৃষ্টির পানিতে ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

'কিন্তু তুমি তো...মরে গেছ!'

'হ।' ঘাড় কাত করে বলল মালা। 'মইরা গেছি তো! মেলা কষ্ট হইছে। দম বন্ধ হইয়া চক্ষু বাইর হইয়া গেছে। এক হাত জিহ্বা ঝুইলা পড়ছে।'

'পানিতে ডুবে মরলে আবার চোখ বের হয় নাকি?' জোর করে বললেন

রকিবুল হোসেন। 'জিভও বেরোয় না।'

তখনই মালার চোখ কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এল। মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল মাছের চোখের মত। রকিবুল হোসেন দেখলেন, একহাত জিভ বেরিয়ে আসাটা মালার কথার কথা না। কুকুরের জিভের মতই বিঘৎখানেক লম্বা একটি জিভ মালার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়েছে। কালসিটে পড়া দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে বীভৎস ভঙ্গিতে।

এবার মালা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার চোখের বদলে সেখানে এখন দুটি অন্ধ গহ্বর। এ অবস্থাও মালা তাঁকে দেখতে পেল। সে তার হাত দুটি তুলে ধরল রকিবুল হোসেনের দিকে। আশ্চর্য! চোখ ছাড়াও তা হলে দেখা যায়!

রকিবুল হোসেন নির্বোধ হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন আর মালার শীর্ণ, শীতল দুটি হাত এসে তাঁর কণ্ঠনালীতে চেপে বসল। রকিবুল হোসেন আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টা করতে পারলেন না। স্রেফ পঙ্গু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মালার শীর্ণ আঙুলগুলো যেন তাঁর গলার চামড়া ভেদ করে বসে যাচ্ছে। উফ্! এত শক্তি মালা কোত্থেকে পেল? কোথায় ছিল এই শক্তি সাতাশ বছর আগে? তখন কেন সে এই শক্তি প্রয়োগ করেনি। তা হলে তো রকিবুল হোসেনের আজ এই পরিণতি হত না। আচমকা এক ধাক্কা খেয়ে সোজা ডোবার মধ্যে পড়লেন তিনি।

অত্যন্ত পাকা সাঁতারু রকিবুল হোসেন। যৌবনে গ্রামের সবচেয়ে বড় দীঘিটা তিনি একটানা তিনবার এপার ওপার করতে পারতেন। কিন্তু আজ তিনি সাঁতরাবার চেষ্টাও করলেন না। অদৃশ্য কোনও দড়ি দিয়ে যেন তাঁর হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। ধীরে ধীরে তাঁর শরীর ডোবার তলায় গিয়ে ঠেকল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ঢুকে যাচ্ছে ডোবার পচা পানি। টর্চটা পড়ে আছে একপাশে। জ্বলছে এখনও। রকিবুল হোসেনের ডান হাতে শক্ত একটা কিছু ঠেকল। তিনি দেখলেন সেটা একটা কংকালের মাথার খুলি। আইনকে কিনে নিতে পারতেন রকিবুল হোসেন। কিন্তু একটি ধর্ষিতা মেয়ের প্রতিহিংসাকে তিনি কী দিয়ে কিনবেন?

মৃত্যুর আগের মুহূর্তে রকিবুল হোসেন জীবনে শেষবারের মত বিস্মিত হলেন। আশ্চর্য! মানুষের স্মৃতিশক্তি এতটা প্রখর হয় কী করে! শেষ নিঃশ্বাস নেবার আগে রকিবুল হোসেনের নির্ভুলভাবে আজকের তারিখটা মনে পড়ে গেল। উনিশে শ্রাবণ।

ইমরান খান

রহস্যময় অতিথি

চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোর সম্ভবত এটা আমার ৬ষ্ঠ মাস চলছে। এ ছ'মাসে আমি তেমন কিছুই করতে পারিনি। চাকরির জন্য অসংখ্য জায়গায় গিয়েছি। ইন্টারভিউ দিয়েছি, সে-ও অনেক। কিন্তু কোয়ালিফিকেশন মোটেও কাজে লাগছে না। অভিজ্ঞতার দুঃসহ বোঝা নিয়ে কত জায়গায় না ঘুরে বেড়ালাম। এ ব্যাপারে এখন আমার অবস্থা একেবারে হতাশার চরম পর্যায়ে। ঠিক এ সময় একটি ইন্টারভিউ কল পেয়ে আমার মনে আরও একবার আশার শিহরণ খেলে গেল। বরাবরের মত ভাবলাম এবার বুঝি চাকরি হবে।

তিনদিন পর ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য আমাকে কাশ্মীর যেতে হবে। ভাবছি চাকরিটা না পেলেও ভ্রমণ-বিনোদন ঠিকই হবে। এ সুযোগে কাশ্মীরও দেখে নেব। আমার এক বন্ধু কাশ্মীরে একটি ছোট্ট বাড়ি বানিয়েছিল। তখন সেটা ছিল তালাবন্ধ। আমাকে তার কাছে যেতে হবে ঘরের চাবি নিতে। ইচ্ছা বন্ধুর সেই বাড়িটাতেই থাকব।

ইন্টারভিউ'র একদিন আগে আমি কাশ্মীর পৌঁছালাম। এসে সবার আগে বাড়িটা খুঁজে বের করলাম। দুটি বেড রুম, একটি বাথ ও একটি রান্নাঘর। ছোট্ট একটি লনও আছে, যার অপর দিকে গ্যারেজ বানানো হয়েছে। মোটকথা বাড়িটা বেশ চমৎকার।

আমি ক্লান্তি জড়ানো দেহে শুয়ে পড়তেই চোখে ঘুম এল। ঘুম থেকে জেগে দেখি বিকেল চারটা বাজে। শরীরটাকে চাঙ্গা করতে এক কাপ চা বানিয়ে খেলাম। এরপর আমার প্রোগ্রাম, বাইরে একটু ঘুরে বেড়ানো। তখন শীতকাল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তাই আমি দূরে কোথাও না গিয়ে বাসার আশপাশেই পায়চারী করছিলাম। আর প্রাণভরে উপভোগ করছিলাম ভূ-স্বর্গের সৌন্দর্য।

আমার সাথে ক্যামেরা ছিল। কিছু ছবি তুললাম। বন্ধু আমার অত্যন্ত মনোরম জায়গায় বাড়িটা বানিয়েছে। সড়কের পাশে একটা ঢালের ওপর আমি বসলাম। জানি না কতক্ষণ সেখানে বসে ছিলাম। এক সময় হিম শীতল বাতাস আমাকে ঘরে ফিরতে বাধ্য করল। আগুনদানী জ্বালিয়ে আমি তার পাশেই বসলাম। কিছুক্ষণ হাত-পা গরম করে একটা বই পড়তে শুরু করলাম।

খানিক পর শুরু হলো তুষারপাত। আমি জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়েছিলাম। ছেঁড়া তুলোর গুচ্ছের মত বরফ পড়ছে। যা দেখে দূরের পাহাড়ে বিক্ষিপ্ত বাড়িগুলোর জ্বলন্ত বাতিগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন অসংখ্য জোনাক পোকাকে যাদু দিয়ে নিজস্ব জায়গায় স্থির করে দেয়া হয়েছে। জোনাকগুলো যেখানে উড়ছিল সেখানেই যেন আটকে রয়েছে। আমি জানি না কতক্ষণ এই অপরূপ দৃশ্যের মাঝে ডুবে ছিলাম। অবশেষে প্রচণ্ড খিদে পেলে রাতের খাবার খেলাম। এ ছাড়া চা বানিয়ে ফ্লাস্কেও ভরে রাখলাম। উপন্যাস পড়ার ফাঁকে চায়ে চুমুক দিতে বেশ

মজাই লাগছিল।

রাত দশটা। বরফপাত প্রথমবারের মত কিছুক্ষণ থামল। আমি উপন্যাসের পাতায় মগ্ন ছিলাম। হঠাৎ গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে আমি চমকে উঠলাম। এই যান্ত্রিক শব্দে আমার চমকে ওঠার কারণ হলো, যখন থেকে এসেছি এটাই প্রথম গাড়ি যা এই সড়ক অতিক্রম করছিল। শুধু তাই নয়, গাড়ির শব্দ কমতে কমতে একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেল। খানিকটা সামনে গিয়ে যেন থেমে গেল অথবা বন্ধ হয়ে গেল। কেননা এরপরই গাড়িটাকে স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। আমি বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম গেট থেকে সামান্য দূরে একটি গাড়ির হেডলাইট। বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল কিন্তু গাড়ি স্টার্ট হলো না। আমি কোট পরে পকেটে হাত রেখে বাইরে বেরিয়ে এলাম। গাড়ির ইঞ্জিনের ঢাকনা খোলা এবং একটা লোক মাথা ঝুঁকিয়ে ইঞ্জিন পরখ করছে। রাতের গাঢ় আঁধারের মাঝেও গাড়ির আলোয় আমি লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। লোকটা বিশালদেহী, কিংবা হয়তো মোটা কাপড় পরার জন্য ওরকম দেখাচ্ছে। ওভার কোটে আচ্ছাদিত গোটা দেহ। পায়ে উঁচু বুট জুতো। মাথায় গরম টুপি। ঘাড়ে একটা মাফলারও পেঁচানো।

সালাম জানিয়ে নিজের প্রতি আমি লোকটার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলাম।

'ওয়া আলাইকুম সালাম,' বলে সোজা হয়ে সে আমার দিকে তাকাল।

'মনে হচ্ছে আপনার গাড়ি নষ্ট হয়েছে।'

'জ্বী, হ্যাঁ। জানি না কী হয়েছে। অসময়ে কেন যে খারাপ হলো।' লোকটি নিজের গাড়ির প্রতি দৃষ্টি ফেরাল।

'সম্ভবত আপনি অনেক দূর থেকে আসছেন।'

'হ্যাঁ, অনেক দূর থেকে আসছি। আরও বহুদূরে যেতে হবে। সমস্যা হলো, আমি গাড়ি সম্পর্কে কিছুই জানি না। কীভাবে যে ঠিক করব... এবার নিশ্চিত আমার দেরি হয়ে যাবে।'

'গাড়ি সম্পর্কে আমার জ্ঞানও একেবারে সীমিত। কেবল চালাতে পারি মাত্র। তবু চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'এ ছাড়া উপায় কী।'

দীর্ঘক্ষণ আমরা গাড়ি নিয়ে মাথা ঘামিয়েও স্টার্ট করাতে পারলাম না।

'আরে, একটা গাড়ি আসছে।'

আমি সেদিকে তাকালাম। দূরে গাড়ির হেডলাইটের আলো নজরে পড়ল।

'হয়তো বা ওটার ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করতে পারবে। আমার মাথায় তো কিছুই খেলছে না।'

'আমার জীবনে এ ধরনের দুর্ঘটনা এটাই প্রথম। আগে কখনও এরকম হয়নি।'

ইতিমধ্যে অপর গাড়িটা যথেষ্ট কাছে এসে পড়েছে। দুজনই হাত নেড়ে থামতে ইশারা করলাম। গাড়িটা একটা ট্রাক। মাল নিয়ে কোথাও যাচ্ছে। আমরা ট্রাক ড্রাইভারকে সমস্যাটা জানালাম। তিনি ভালমত গাড়িটা পরখ করে বললেন,

'না ভাই, কিছুই বুঝতে পারছি না। কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে।'

'তবে কী করা যাবে?' নষ্ট গাড়ির লোকটি বলল।

'মেকানিককে দেখাতে হবে।'

'আশপাশে কোথাও মেকানিক পাওয়া যাবে?' লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'জানি না, ভাই। এখানে আজই এলাম। কাজেই কিছুই বলতে পারছি না।'

'উহ্, কী বিপদেই না পড়লাম।'

'আপনি না হয় রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিন। সকালে কিছু একটা করা যাবে,' আমি বললাম।

'তা হয় না। আমাকে এখনই যেতে হবে। আপনার আপত্তি না থাকলে গাড়িটা আপনার বাড়িতে রেখে যাই। সকালবেলা আমার লোক এসে নিয়ে যাবে। এখন এ ট্রাকে চেপেই আমি চলে যাচ্ছি। এ লোক আমাকে সামনে নামিয়ে দেবে।'

ট্রাক ড্রাইভার সম্মত হলো। আমরা ধাক্কা মেরে গাড়িটা গ্যারেজে ঢোকালাম।

'ঠিক আছে,' লোকটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। 'এবার আমি যাই। অনেক সময় নষ্ট হলো।'

'এক কাপ চা খেয়ে যান। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা...'

'না না, কোনও প্রয়োজন নেই।' লোকটি আমার কথা এড়িয়ে গেল। 'এবার যাবার অনুমতি দিন।'

'না, সাহেব। এ সময় চা পাওয়া গেলে বড়ই ভাল হয়। আমি চায়ের ভীষণ প্রয়োজন বোধ করছি,' ট্রাক ড্রাইভার সাথে সাথে বলল।

'অলরাইট। ফ্লাস্কে চা তৈরিই আছে। মাত্র পাঁচ মিনিট।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোকটি আমাদের সাথে গেল। আমি তাকে সে রুমটায় নিয়ে এলাম যেখানে আগুনদানী জ্বলছিল। ঘরে যথেষ্ট উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে। আমি গায়ের কোট খুলে চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখলাম। এরপর দু'জনের সামনে রাখা পেয়ালায় চা ঢেলে দিলাম। সেই লোকটি দ্রুত চায়ের কাপ নিঃশেষ করল। কিন্তু ড্রাইভার ধীরে ধীরেই খাচ্ছিল। লোকটির বিপাকে পড়ার যন্ত্রণা আমার চোখেও গোপন থাকেনি। অবশেষে ড্রাইভারের পেয়ালা খালি হলে আমি দু'জনকেই বিদায় জানালাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর শোবার আগে আমি গ্যারেজে তালা দেয়ার কথা ভাবলাম। চাবি নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আবারও তুষারপাত শুরু হয়েছে। গ্যারেজ খুলে দেখলাম ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। দরজার সাথেই সুইচবোর্ড ছিল। একটু হাতড়েই সেটা পেয়ে গেলাম। বালব জ্বালালাম ঠিকই, কিন্তু আলো একেবারেই কম। গ্যারেজটার আয়তনও বেশি নয়। তা ছাড়া গাড়িটা অধিকাংশ জায়গা দখল করে রেখেছে। গাড়ির জন্য গ্যারেজ যথেষ্ট সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। অথচ গাড়িটাও তেমন একটা বড় নয়।

আমি আনমনে গাড়ির পিছনের দরজা খোলার জন্য হ্যাণ্ডেলে হাত দিতে নিজে থেকেই দরজাটা খুলে গেল। খানিকটা অবাক হলাম, কারণ নিজে থেকে

দরজাটা খুলে গেল কীভাবে? আমি তো কেবল হাত লাগিয়েছি। খোলার চেষ্টাও করিনি। শুধু তাই নয়, দরজার ধাক্কায় আমার পিঠ রীতিমত দেয়ালে ঠোকর খেয়েছে।

কম্পিত হৃদয়ে আমি গাড়ির ভেতরে তাকিয়ে দেখলাম একটি লাশ পড়ে আছে। ভয়ে আমার কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেল। আমি দ্রুত বাইরে বেরিয়ে থাকা লাশের রক্তাক্ত মাথা ভেতরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এরপর গ্যারেজের লাইট অফ করে তালা লাগিয়ে দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে এলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মাঝেও আমার শরীর থেকে ঘাম ছুটছে।

এরপর বিছানায় শুয়ে দীর্ঘক্ষণ কাটল দুশ্চিন্তায়। নানা রকম দুর্ভাবনাও আমাকে দংশন করছে। এ অবস্থায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। পরদিন ঘুম থেকে খুব তাড়াতাড়ি জেগে গেলাম। গতরাতের ঘটনা এক ভয়ঙ্কর স্বপ্নের মতই আমার মনে পড়তে লাগল। ভাবলাম হয়তো বা এটা সত্যিই এক স্বপ্ন। সম্ভবত সেটা লাশ নয়, অন্যকিছু হবে। তখন আমার ঘুমও পাচ্ছিল ভীষণ, আবার অন্ধকারও ছিল গাঢ়। হয়তো বা কোনও গাড়িই আসেনি। গোটা ব্যাপারটাই ছিল স্বপ্নের মত।

আমি টেবিলে চাবি রেখেছি, কিন্তু চাবি সেখানে নেই। পকেট হাতড়ে দেখলাম, সেখানেও পাওয়া গেল না। এরপর সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু চাবি পেলাম না। ভাবলাম রাতে সম্ভবত তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে গ্যারেজের তালার সাথেই চাবিটা আটকে রয়েছে। অতএব বাইরে এলাম। রাতে প্রচণ্ড তুষারপাত হলেও এখন আবহাওয়া পরিষ্কার।

চাবি সত্যি সত্যি গ্যারেজের তালার সাথে আটকে ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে গ্যারেজের দরজা খুললাম। কিন্তু গ্যারেজ শূন্য। গাড়িটার অস্তিত্ব নেই। আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। এক্ষেত্রে দু'ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। প্রথমত সেই লোকটি গাড়িটা নিয়ে গেছে। নয়তো এটা বাস্তবেই এক স্বপ্ন ছিল। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।

এ রকম অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করতেই থমকে গেলাম। সামনে তিনটি শূন্য পেয়ালা পড়ে আছে। যা একথাই প্রমাণ করে যে, এটা কোনও স্বপ্ন নয় বরং বাস্তব সত্য।

আমি সেই রহস্যময় লোকটির পেয়ালা অত্যন্ত সাবধানে তুললাম। নিশ্চয় এতে লোকটির আঙুলের ছাপ থাকবে। ভাবলাম পেয়ালাটা সংরক্ষণ করা দরকার। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ অফিসার আমার পরিচিত। আমার ইচ্ছা পেয়ালাটা তাঁর কাছে নিয়ে যাব।

সেদিন আমি ইন্টারভিউ দিয়েছি। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকায় ইন্টারভিউ ভাল হয়নি। চাকরি পাবার ন্যূনতম আশাও শেষ হলো। এরপর আরও সপ্তাহখানেক আমি সেখানে ছিলাম। এই ক'দিন খুব ঘুরে বেড়িয়েছি। ফিরে আসার পর বাড়ির লোকেরা প্রথমেই আমার হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে দিল। এটা ছিল নিয়োগপত্র। চাকরিটা আমার হয়েছে।

আমি ভীষণ আনন্দিত। কিন্তু সেই পেয়ালাটাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাইনি। সবার আগে বন্ধুর কাছে পেয়ালাটা হস্তান্তর করে তাকে এ থেকে

ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়ার কথা বললাম। পরদিন আমার বন্ধু আমাকে জানাল, 'এটা এক বড় অপরাধীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট, যার ছিল অসংখ্য খুনের রেকর্ড।'

'ছিল মানে?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। 'তুমি কি বলতে চাইছ, সে মরে গেছে?'

'হ্যাঁ। তার মৃত্যুটা বিস্ময়কর। এক রাতে সে কাউকে খুন করে তার লাশ গাড়িতে করে কোথাও নিয়ে যাচ্ছিল। পথে এক নির্জন সড়কে তার গাড়ি নষ্ট হয়। এরপর গাড়িটা সে অদূরেই কারও বাড়িতে রেখে এক ট্রাকে লিফট নিয়ে চলে যায়। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর ট্রাক মোড় ঘুরবার সময় এক গভীর গিরিখাতে ছিটকে পড়লে সাথে সাথে তারা দু'জন অর্থাৎ ট্রাক ড্রাইভার ও সেই অপরাধী নিহত হয়।'

'ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে?'

'সঠিক মনে নেই। তবে কাশ্মীরের কোনও উপত্যকা যে হবে সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারি।'

'পেয়েছি, পেয়েছি!' আমি চিৎকার করে বললাম। 'তুমি কি জানো সে কার বাড়িতে গাড়িটা রেখেছিল?'

'কার বাড়িতে?'

আমি তার কাছে পুরো ঘটনা খুলে বললাম।

সে অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল: 'এ তুমি কী বলছ, বন্ধু?'

মূল: ইসরারুল হক

ভাষান্তর: ওয়ারেসুল হক

মূর্তি

শফিকের আজ কয়েকদিন অফুরন্ত অবসর। রিজিয়া গত কয়েকদিন আগে বাপের বাড়ি গেছে, ফলে পাঁচটায় অফিস ছুটির পর বাজার করার ঝামেলা নাই। তাই অফিস থেকে বাসায় ফিরেই কাপড় পাল্টে আবার বের হয়ে যায়।

চট্টগ্রাম শহরটা এখনও ঢাকার মত অতটা ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। পাহাড়ের আড়ালে-আবডালে শুয়ে থাকা শহরটা ঢাকার তুলনায় অনেক শান্ত। ইদানীং শফিক অফিস ছুটির পর একা একা উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটে আর দু'চোখ ভরে দেখে শহরের শান্ত সৌন্দর্য।

ওয়াসার মোড় থেকে আলমাস সিনেমার দিকে যেতে পথে সি.এন.জি স্টেশনের পাশেই দোকানটা। অনেকদিনের পুরাতন রঙ চটে যাওয়া সাইনবোর্ডে বড় করে লেখা **'পুরাতন সামগ্রীর দোকান'**, নীচে ছোট করে লেখা 'এখানে বিভিন্ন প্রকার পুরাতন সৌখিন সামগ্রী পাওয়া যায়।'

শফিক হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার অপর পার থেকে সাইন বোর্ডটা পড়ল। এই পথ দিয়ে অনেকবার আসা-যাওয়া করেছে, তখন দোকানটা চোখে পড়লেও কখনও ঢুঁ মেরে দেখা হয়নি। আজ কৌতূহলী হয়ে রাস্তা পার হয়ে দোকানটাতে ঢুকল।

দোকানে ঢুকতেই পুরানো জিনিসের গন্ধটা নাকে লাগল। শফিক গন্ধটা সামলে নিয়ে দোকানের মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল। বেশ বড় দোকান। দোকানে বেশিরভাগই আসবাবপত্র। নকশা করা চেয়ার, টেবিল, পালংকে ভর্তি। বেশ বড় কয়েকটা আলমারিও আছে। দোকানের কাউন্টারে পিছনের তাকে সারি সারি সাজানো কাঁচের জিনিস-পত্র। কয়েকটি কাঠের তৈরি মুখোশও আছে। মুখোশগুলো অদ্ভুত সুন্দর।

শফিক কাউন্টারের সামনে গিয়ে মুখোশটা চাইল। কাউন্টারে বসা মধ্যবয়স্ক সেলসম্যান মুখোশটা শফিকের হাতে দিল। শফিক মুখোশটা উল্টেপাল্টে দেখে মুখে লাগাল, এরপর আয়নার সামনে এসে দেখতে লাগল। আয়নায় মুখোশ পরা চেহারা দেখতে দেখতে হঠাৎ আয়নার ভিতর দিয়ে ওর পিছনে একটা মূর্তি দেখতে পেল। অপূর্ব সুন্দর একটা নারী মূর্তি। মুখোশটা খুলে পিছনে ফিরে দেখল ছোট একটা আলমারির উপর মূর্তিটা। মুখোশটা সেলসম্যানের হাতে দিয়ে, মূর্তিটার সামনে এসে দাঁড়াল। প্রায় এক ফুট লম্বা অপূর্ব সুন্দর চেহারার নারী মূর্তি। পরনে নীল রঙের শাড়ি। কপালে গোল হালকা লাল টিপ, সামনে, বামদিকে বুকের উপর চুলগুলো কোমর পর্যন্ত ছড়ানো। ত্রি-ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো, মুখে এক চিলতে মিষ্টি হাসি, কেমন যেন রহস্যময়।

মূর্তিটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল।

'নেবেন নাকি মূর্তিটা?'

সেলসম্যানের কথায় শফিকের ধ্যান ভাঙল। জিজ্ঞেস করল, 'মূর্তিটা কোথাকার?'

'তা বলতে পারি না। পুরাতন ভাঙা জিনিস-পত্র বেচে এমন দোকান থেকে এনেছি।' সেলসম্যান মূর্তিটা আলমারির উপর থেকে নামিয়ে শফিকের হাতে দিয়ে বলল, 'যাই বলুন, মূর্তি যে কারিগর বানিয়েছে সে খুব দক্ষ শিল্পী।'

শফিক মূর্তিটা কিনে নিয়ে এল। এনে বেডরুমে ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে দেখতে লাগল। মূর্তিটা এক ফুট না হয়ে যদি চার ফুটের বেশি হত, তা হলে যে কেউ একে জীবন্ত নারী ভেবে ভুল করত।

কাল রিজিয়া বাপের বাড়ি থেকে আসবে। ঘরে কিছু নেই, বাজারে যেতে হবে। শফিক মূর্তিটা রেখে বাজার করতে বের হয়ে গেল।

বাজার করে ফিরে এসে রান্না করে খেতে অনেক রাত হয়ে গেল। খাওয়া সেরে বিছানায় শুতে শুতে রাত বারোটা। শোয়ার আগে মূর্তিটার কথা ভাবতে লাগল। কাল রিজিয়া এলে ঘরের শো পিস হিসাবে মূর্তিটা দেখে খুব খুশি হবে। এরকম শো পিস হাজারে একটা যে পাওয়া যায় না একথা রিজিয়ার মত মেয়েও বলতে বাধ্য হবে।

শফিকের ঘুম পাতলা, একটু শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়। গভীর রাতে ঘরের মধ্যে ধুপ করে শব্দ হতে তার ঘুম ভেঙে গেল। তন্দ্রা চোখে ডিম লাইটের আলোয় ডুবে থাকা রুমটার চারদিকে তাকাতেই চমকে উঠল। ঘরের মধ্যে ড্রেসিং টেবিলের পাশে জলজ্যান্ত এক যুবতী নারী দাঁড়িয়ে আছে। শফিকের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। সে যথেষ্ট সাহসী পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও ভয় পেয়ে শোয়া থেকে উঠে বসল। আর্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কে? কে তুমি?'

নীল রঙের শাড়ি পরা, সামনের দিকে ছড়ানো চুলগুলো পিছনে ছড়িয়ে দিয়ে, মেয়েটি বিছানায় উঠে বসল। মেয়েটি নড়াচড়া করতেই সারা ঘরে বেলী ফুলের তীব্র ঘ্রাণে ভরে গেল। বেলী ফুলের ঘ্রাণে শফিকের মাথার ভিতরটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে সম্মোহিত হয়ে পড়ল। মেয়েটি সুরেলা কণ্ঠে বলল, 'আমি কুন্তলা। ভাওয়াল জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের প্রিয়তমা স্ত্রী।'

শফিক কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে কেন এসেছ? কী করে এলে?'

মেয়েটি কোমল হাতে শফিকের হাত দুটি ধরে বলল, 'আমি আসিনি, তুমিই আমায় এনেছ। আজ যে মূর্তিটা কিনে এনেছ সেই-ই আমি।'

শফিক হাঁ হয়ে গেল।

'আমি এখানে কেন এসেছি জানতে চাও? শোনো তা হলে। আমি আজ থেকে চারশো বছর আগে এই দেহে এই রূপে ভাওয়ালের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলাম। জমিদার আমাকে খুব ভালবাসত, আমিও জমিদারকে খুব ভালবাসতাম। তখন পৃথিবীটাকে মনে হত স্বর্গ। সে আমাকে ছাড়া এক দণ্ডের জন্য কোথাও যেত না। এই কারণে ওর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সব দূরে সরে গেল। জমিদার এতে এতটুকু বিচলিত হলো না। তার রাত দিনের ধ্যান-

ধারণা ছিলাম আমি।

কিন্তু এত ভালবাসা এত সুখ বেশি দিন থাকল না। হঠাৎ করে আমায় পেয়ে বসল দুরারোগ্য ব্যাধিতে। সেই অসুখে আমার রূপ-লাবণ্য সব বিলীন হয়ে যেতে লাগল। আমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দুয়ারে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এই অবস্থায় জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় পাগলের মত হয়ে গেল। দেশ-বিদেশের যত হেকিম-কবিরাজ আছে সবাইকে এনে দেখাতে লাগল। ওরা এসে সবাই নিরাশার কথাই বলত। এর মধ্যে একদিন কে যেন বলল মুণি-ঋষিদের দেখাতে। জমিদার তাও করল। পীর-দরবেশের কাছ থেকেও পানি পড়া তাবিজ আনা হলো। কিছুতে কিছু হলো না। আমার জন্য এসব করতে যেয়ে সে তার জমিদারির বেশিরভাগ অংশ বিক্রি করে ফেলল। তার নিজের শরীরেও রোগ বাসা বেঁধেছে। তবুও সারাদিন আমার চিকিৎসার জন্য ছুটাছুটি করে। রাত হলে আমার পাশে বসে আমায় সান্ত্বনা দিত আর বলত, তোমাকে আমি যেভাবে হোক বাঁচাব। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তুমি চলে গেলে আমি কী নিয়ে বাঁচব?'

এসব শুনে আমি কাঁদতাম।

এর মধ্যে একদিন জমিদারের এক দারোয়ান বলল, 'কর্তা যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি?'

জমিদার বলল, 'নির্ভয়ে বল।'

'আমাদের গ্রামে এক কাপালিক আছে। তার হাতে অনেক রোগী ভাল হতে দেখেছি। যদি বলেন তো ওকে একবার ডাকি?'

'এতদিন বলোনি কেন?'

'ওর চিকিৎসার ধরনটা একটু অন্যরকম তো, তাই বলিনি।'

সে রাগতকণ্ঠে বলল, 'যে রকমই হোক, এখনই নিয়ে এস।'

সেদিনই কাপালিককে নিয়ে আসা হলো। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, কালো রঙের বিশাল দেহের কাপালিকের চোখ দুটো ছিল টকটকে লাল। পরনে লাল রঙের কাপড়। কাপালিককে আমার কাছে নিয়ে আসা হলো। সে আমার সামনে এসে মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর আমার দু'চোখের মাঝখানে ডান হাতের বৃদ্ধ আঙুল চেপে ধরে, দুই চোখ বন্ধ করে অনুচ্চ স্বরে কিছুক্ষণ মন্ত্র পড়ে বের হয়ে গেল। জমিদার পিছে পিছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, কাপালিক, কেমন দেখছ?'

'কর্তা, এই রোগীকে পৃথিবীর কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

কাপালিকের কথা শুনে জমিদার বাচ্চাদের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। সে রাতে আমার কাছে এল না সে। চাকরানিদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, 'কর্তা বাবু চিলেকোঠায় বসে কাঁদছে। এই কথা শুনে আমিও কাঁদতে লাগলাম।'

সেদিনই মধ্য রাতে আবার দারোয়ানটা এল। 'কর্তা, কাপালিক আপনার সাথে একান্তে কথা বলতে চায়।'

দারোয়ানের কথা শুনে জমিদার খুশি হয়ে গেল। ভাবল কাপালিক হয়তো এমন ওষুধ পেয়েছে যার দ্বারা আমাকে বাঁচানো যাবে। 'যাও, ওকে এখানে নিয়ে এস।'

কাপালিক এল। দারোয়ানকে চলে যেতে বলে কাপালিককে বলল, 'বলো কাপালিক কোন আশার বাণী আছে কিনা?'

'না কর্তা, তেমন কোন আশার বাণী নেই। তবে আপনি যদি চান তা হলে বৌ-ঠাকরুনকে অন্য ভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়।'

জমিদার কাপালিকের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল, 'অন্যভাবে মানে?'

'অন্যভাবে মানে, বৌ-ঠাকরুন বেঁচে থাকবেন, তবে এই দেহে নয়, অন্য জায়গায়।'

'কাপালিক, বুঝিয়ে বলো। আমি তোমার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কর্তা, প্রথমে নিয়ম মত ঠিক বৌ-ঠাকরুনের মত একটা মূর্তি বানাতে হবে। তারপর সেই মূর্তিতে বৌ-ঠাকরুনের আত্মা দেহ থেকে বের করে অধিষ্ঠান করাব।'

'কিন্তু তাতে কী হবে? আমি তো ওকে জীবন্ত পাচ্ছি না।'

'না, কর্তা, পাবেন, একে বারো বছর পর একবার করে ঠিক সেই রকম যে রকম সুস্থ অবস্থায় ছিলেন, এবং তাও শুধু এক রাতের জন্য। সেই রাতে বৌ-ঠাকরুনের জন্য এক সুস্থ যুবক লাগবে যার রক্ত সে পান করবে। রক্ত পান করলেই আগামী বারো বছর পর আবার দেহ ধারণ করতে পারবে, এক রাতের জন্য।'

কাপালিকের কথা শুনে জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় হতভম্ব হয়ে গেল। কাপালিক জমিদারের অবস্থা দেখে বলল, 'কর্তা, এ ছাড়া বৌ-ঠাকরুনের বেঁচে থাকার অন্য কোন রাস্তা নেই। আপনি চিন্তা-ভাবনা করে আমাকে খবর দেবেন।'

জমিদার সারারাত আর ঘুমাতে পারল না। সকালেই কাপালিককে ডেকে পাঠাল। কাপালিক জমিদারের আদেশ পেয়ে দুই দিনের মধ্যে ঠিক আমার মত দেখতে এক ফুট লম্বা এই মূর্তিটা বানায়। তারপর অমাবশ্যার রাতে দুইটি পাঁঠা ছাগল, একটি কালো, একটি সাদা, পূজার উপকরণ ও একটি খাটিয়ায় করে আমায় শ্মশানে নিয়ে এল।

অমাবশ্যার মধ্য রাত। চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বিরাট শ্মশানের ঠিক মধ্যিখানে খাটিয়ার উপর শুয়ে আমি মৃত্যুর প্রহর গুনছি। খাটিয়ার চারপাশে চারটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপগুলো শিয়ালের চর্বিতে জ্বলছে। আমার মাথার দিকে মাটির মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে। কাপালিক খাটিয়া থেকে অনেকটা দূরে, মন্ত্র পড়তে পড়তে মাটিতে একটা গোল দাগ দিয়ে জমিদারকে বলল, 'কর্তা, আপনি এই গোল দাগের ভিতর বসে থাকবেন। যাই ঘটুক না কেন, এই দাগ থেকে বের হবেন না, মনে রাখবেন, এই দাগ হতে বের হলেই আপনার মৃত্যু হবে।'

জমিদার কাপালিকের কথা মত বসে পড়ল। এবার কাপালিক প্রথমে কালো ছাগলটার মাথাটা কেটে ফেলল। ছাগলটার রক্ত একটা মাটির পাত্রে নিল। তারপর সাদা ছাগলটার মাথা কেটে অন্য একটা মাটির পাত্রে রক্ত নিল। কালো ছাগলটার রক্তে ভরা মাটির পাত্রটা আমার পায়ের দিকে রাখল। সাদা ছাগলের রক্ত ভরা মাটির পাত্রটা আমার মাথার দিকে রাখল। এরপর তেঁতুল গাছের কাঁচা একটা ডাল দিয়ে আমার গায়ে বাড়ি দিতে লাগল আর উচ্চ স্বরে মন্ত্র পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম আমার চারপাশে অশরীরী আত্মারা ভিড় করতে লাগল। এর মধ্যে ওরা ছাগলগুলোর মৃতদেহ খেয়ে ফেলল। এরপর জমিদারের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু কাপালিকের দেওয়া গোল দাগের জন্য ওর ধারে কাছেও যেতে পারল না। কাপালিক মন্ত্র পড়তে পড়তে এক পর্যায়ে কালো ছাগলের রক্ত আমার দেহের উপর ঢেলে দিল। রক্ত আমার গায়ে পড়তেই ছয়মাসের রোগী আমি খাটিয়ার উপর সটান দাঁড়িয়ে গেলাম। প্রায় ছয় ফুট লম্বা কাপালিক সাথে সাথে আমার মাথার চুল ধরে মাটি থেকে কয়েক হাত উপরে তুলে ফেলল। আমি কাপালিকের হাত থেকে ছোটার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগলাম। এই সময় কাপালিক গলার স্বর নিচু করে মন্ত্র পড়তে পড়তে বলল, 'কুন্তলা, বের হয়ে আয়। কুন্তলা, বের হয়ে আয়।' এরপরই আমি স্পষ্ট দেখলাম আমি আমার দেহ থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। আমি বের হয়ে যেতেই আমার শরীরটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। আমার দেহটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথে অশরীরী আত্মাগুলো ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়ে ফেলল। আমি রয়ে গেলাম কাপালিকের হাতের মুঠোয়। কাপালিক এবার উচ্চ স্বরে মন্ত্র পড়তে পড়তে তার বাম পা দিয়ে আমার আত্মাটাকে মূর্তির উপর চেপে ধরল। তারপর সাদা ছাগলের রক্ত মূর্তির উপর ঢেলে দিতেই আমার আত্মা মূর্তির ভিতর অধিষ্ঠান হয়ে গেল।

আমি মূর্তির ভিতর প্রবেশ করতেই অশরীরী আত্মাগুলো সব চলে গেল। কাপালিক কাজ শেষ করে জমিদারের দিকে তাকাতেই দেখল জমিদার গোল দাগের ভিতর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। এরপর কাপালিক মূর্তিটা একহাতে নিয়ে জমিদারকে কাঁধে নিয়ে শ্মশান থেকে বের হয়ে গেল।

সকালে মূর্তিটা জমিদারের হাতে দিয়ে বলল, 'কর্তা, এই নিন বৌ-ঠাকরুনকে। মনে রাখবেন, ঠিক বারো বছর পর বৌ-ঠাকরুন এক রাতের জন্য দেহ প্রাপ্ত হবেন, তখন কিন্তু তার জন্য একজন সুস্থ যুবকের রক্ত লাগবে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরই জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় পাগল হয়ে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুনে সারা বাড়ি পুড়ে গেলেও আমার কিছুই হলো না, কারণ, তখন আমি জমিদারের হাতে ছিলাম। আমার জন্য বারো বছর অপেক্ষা করতে যেয়ে কয়েক বছর পর জমিদার মারা গেল। এরপর এক লোক আমায় কুড়িয়ে পায়। সে তার ছোট মেয়েকে দেয় খেলার পুতুল হিসাবে। বড় হওয়ার পর ওর বিয়ে হয়ে গেলে সে আমাকে তার সাথে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যায়। সেখানে বছর খানেক পর এক রাতে দেহ ধারণ করে তার স্বামীর রক্ত পান করি।

সেই হতে চারশো বছর ধরে এরকম চলছে। বারো বছর পর আমি জেগে উঠে সুস্থ কোন যুবকের রক্তপান করি। আজ এসেছি তোমার ঘরে। বারো বছর পর আজই আমার দেহ ধারণের রাত, তাই আজ যেভাবেই হোক আমার জীবিত মানুষের রক্ত পান করতে হবে। আজ যদি রক্ত পান করতে না পারি তা হলে বারো বছর পর আর দেহ ধারণ করতে পারব না।'

রিজিয়া সকালে বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসে বেডরুমে ঢুকেই শফিকের রক্তাক্ত লাশটা দেখতে পেল।

• **এস এম সালাউদ্দীন**

তিন নম্বর চোখ

'কেয়ারটেকারটা কেমন অদ্ভুত না গো?' সেদিন বিকেলে বাইরে থেকে ফিরে বলল মৌসুমী।

মুখ তুলে চেয়ে দেখি টেবিলের ওপর দুটো শপিং ব্যাগ নামিয়ে রাখছে ও। কম্পিউটারে গল্প লিখতে ব্যস্ত তখন আমি।

'তাই? লোকটাকে তোমার অদ্ভুত লাগে?' অন্যমনস্ক সুরে বললাম।

'লাগেই তো,' বলল মৌসুমী। 'কেমন পা টিপে টিপে হেঁটে বেড়ায়। মনে হয়—মনে হয় যেন একটা—'

'ইয়া বড় বাঘ,' বাক্যটা সম্পূর্ণ করে দিয়ে কী বোর্ডে মন দিলাম।

'ঠিক বলেছ,' বলল ও। 'ওকে যখনই দেখি কেমন জানি একটা অস্বস্তি লাগে। এমন হবে কেন? ব্যাপারটা আমার একদম ভাল লাগে না।'

সিধে হয়ে বসলাম আমি। 'আসলে ওকে তোমার পছন্দ নয়। কিন্তু কী করবে ও বেচারা? ও তো এভাবেই জন্মেছে। দোষ দিলে ওর মাকে দিতে হয়।'

আমার টেবিলের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসল ও। তারপর শপিং ব্যাগ দুটো খালি করতে লাগল। নানা সাইজের ক্যান নামছে টেবিলের ওপর। 'শোনো,' গলা খাদে নামাল মৌসুমী। ভঙ্গিটা আমার অতি পরিচিত। গোপন কথাটা শোনার অপেক্ষা করছি। 'শোনো,' পুনরাবৃত্তি করল ও।

'বলো,' বললাম আমি, চোখ রাখলাম ওর আয়ত চোখে।

'ওভাবে তাকাচ্ছ কেন?' ঈষৎ ক্ষোভের সুরে বলল ও। 'তোমার চোখ দেখে বুঝতে পারছি আমার কথা পাত্তা দিচ্ছ না তুমি।'

হাসলাম আমি। দুর্বল হাসি।

'এজন্যে পস্তাতে হবে তোমাকে,' বলল ও। 'দেখবে এক রাতে ও কুড়াল নিয়ে হাজির হয়ে গেছে আমাদের ফ্ল্যাটে—'

'বেচারা গরীব মানুষ, এ বাড়ির সব কটা ফ্ল্যাটে তার যাতায়াত। কই আর কেউ তো কিছু বলছে না। মানুষের মেঝে ধুয়ে দিচ্ছে, দেয়াল পরিষ্কার করে দিচ্ছে। আমি শব্দ বেচে খাই আর ও খায় শ্রম বেচে। এতে দোষের কী দেখলে?'

খুশি হতে পারল না মৌসুমী। 'বেশ,' বলল ও। 'তুমি যখন জানতে চাও না কী করার আছে আমার!'

'কী জানতে চাইব তাই তো জানি না,' বললাম আমি। মৌসুমীর মাথায় সব সময় রাজ্যের সব পোকা কিলবিল করতে থাকে। সেগুলো চটজলদি বের করে নেয়াই মঙ্গল। তাতে দু'জনেরই পরিত্রাণ মেলে।

চোখজোড়া বিস্ফারিত এ মুহূর্তে ওর। 'আমি বলে দিচ্ছি ওই ব্যাটা কিছু একটা ঘটিয়ে ছাড়বে। ও তক্কে তক্কে আছে—জানি আমি। ও আসলে কেয়ারটেকার না। আমার ধারণা—'

'ভয়ঙ্কর এক খুনী। এ বাড়িটা ক্রিমিনালদের আখড়া। বাইরে থেকে মনে হয় আর দশটা ফ্ল্যাটবাড়ির মত এটাও একটা। কিন্তু আসলে এর ভেতরে রয়েছে গভীর রহস্য। হয়তো নকল টাকা বানাচ্ছে এরা। কিংবা বউদের মেরে মেঝেতে পুঁতে ফেলছে। বলা যায় না হয়তো বাচ্চাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে খাচ্ছে...'

ইতোমধ্যে কিচেনে চলে গেছে ও। টেবিলের ওপর ক্যানগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলল, ওর আমি-পরোয়া-করি-না সুরটা চিনতে পারলাম। 'পরে বোলো না আমি সাবধান করিনি।'

ওকে জড়িয়ে ধরলাম উঠে গিয়ে, চুমু খেলাম ঘাড়ের কাছে।

'ছাড়ো ছাড়ো,' বলে উঠল ও। 'আমি এখনও বলছি ওই কেয়ারটেকারটা—' ঘুরে দাঁড়াল ও।

'তুমি সত্যিই এসব কথা বিশ্বাস করো?' বললাম আমি।

চেহারা থমথম করছে ওর। 'নিশ্চয়ই নিজের মুখেই তো বললাম।'

'তুমি আজকাল বেশি বেশি সিনেমা দেখছ,' মৃদু অনুযোগ আমার।

'এখন, বিশ্বাস করছ না, কিন্তু পরে আফসোস করবে দেখো,' ওর একই কথা।

ওর ঘাড়ে চুমু খেলাম আবারও। 'রাশেদ আর রিয়া কখন আসছে?'

'আটটায়,' বলল ও। 'মাংসটা চড়িয়ে ফেলি।'

'ঠিক হ্যায়,' খোশমেজাজে বললাম। 'আমি দেখি গল্পটা কদ্দূর এগোনো যায়।'

একটু পরে, কিচেনে ওকে একা একা কথা বলতে শুনলাম। পুরোটা শুনতে পাইনি। তবে ভয়ঙ্কর কিছু শব্দ কানে এল।

'বেঘোরে মারা পড়ব আমরা।'

'না, কিছু একটা গড়বড় আছেই,' নাছোড়বান্দার মত বলল মৌসুমী। সে রাতে রাশেদদের দাওয়াত করেছি আমরা।

আমি রাশেদের উদ্দেশে মুচকি হাসতে ও-ও পাল্টা হাসল। আমার ছেলেবেলার বন্ধু ও, কাকতালীয়ভাবে একই বাড়িতে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি আমরা।

'আমারও কিন্তু তাই মনে হয়,' সায় জানাল রিয়া। 'মাসে মাত্র বারো হাজার টাকা ভাড়া, এত সুন্দর একটা ফ্ল্যাটের। অন্যান্য আরও মানুষও তো ভাড়া বাড়িতে থাকছে, না কী? এত সুন্দর সুন্দর চেয়ার-টেবিল, কিচেনে ইলেকট্রিকাল জিনিসপত্র—সে তুলনায় ভাড়াটা খুবই কম হয়ে গেল না?'

'মেয়েদের খুঁতখুঁতে স্বভাবটা আর গেল না,' বললাম আমি মৃদু হেসে। 'কোথায় খুশি হবে তা না—'

'একটু খটকা কিন্তু থেকেই যায়, সেলিম,' বলল রাশেদ। 'নিজেই ভেবে দেখ।'

ভাবলাম আমি। পাঁচটা বড়সড় বেডরুম। সব কিছু ঝাঁ-চকচকে। ভিশগুলোও...এটা একটু হয়তো অবাক ব্যাপারই। মন থেকে ওদের সাথে একমত আমি। কিন্তু মুখে স্বীকার করলাম না। এত সহজে রণেভঙ্গ দেব? কভি নেহী!

'আমার কিন্তু মনে হয় এরা ভাড়া বেশি নিচ্ছে,' বললাম হাসি চেপে।

'ওহ, খোদা!' মৌসুমী যথারীতি সায় দিল আমার কথায়। 'বেশি নিচ্ছে! পাঁচটা রুম! লাইট! হীট! আর কী চাও? আস্ত একটা প্লেন দিতে হবে তোমাকে?'

'ছোটখাট হলেও চলবে,' বললাম আমি।

অতিথিদের দিকে চাইল মৌসুমী। 'ওর কথা বাদ দিন। আমরা আলোচনা করি আসুন। বাড়িঅলা হয়তো এ বাড়িটাতে কিছু লুকিয়ে রাখতে চায়। আর দশটা বাড়ির মত দেখায় এটাকে। বাইরে থেকে কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না। আমার মনে হয় এদের আসলে ঢাল হিসেবে লোকজন দরকার। আমাদের মত ভাড়াটেদের বসিয়েছে সবার চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে। কম ভাড়ার এটাই কারণ। ভাড়া দেয়া শুরু হলে কী পরিমাণ ভিড় হয়েছিল মনে নেই?'

আমার পরিষ্কার মনে আছে। আমি আর মৌসুমী দৈবাৎ হেঁটে যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে। বাইরের দেয়ালে টু-লেট নোটিশ ঝোলাচ্ছিল ওই কেয়ারটেকারটা। আমরা সোজা ভেতরে ঢুকে পয়লা মাসের ভাড়া মিটিয়ে দিই। আমরাই প্রথম। তার পরের দিন থেকে তো রীতিমত আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। হবেই তো, আজকাল সস্তায় বাড়ি ভাড়া পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

'আবারও বলছি আমি কিছু একটা গোলমাল আছে এ বাড়িতে,' বলে শেষ করল মৌসুমী। 'কেয়ারটেকারটাকে লক্ষ করেননি?'

আড়ষ্ট হাসল রিয়া। 'হ্যাঁ। হরর ফিল্মের পিশাচের মত লাগে আমার লোকটাকে। চোখ দুটো কীরকম, বাপরে! ও আশপাশে থাকলে কেমন গা ছমছম করে।'

'করে না?' সোৎসাহে বলে উঠল মৌসুমী। 'আমিও তো ওকে তাই বলি। দেখলে এবার?' শেষের অংশটুকু আমার উদ্দেশে বলা।

'মেয়েরা!' বললাম আমি, একটা হাত তুললাম। 'এখানে যা হয় হোক। আমাদের কী? আমাদের তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না। আর আমরা কোন অন্যায়ও করছি না। সস্তায় ভাল জায়গায় থাকতে পারছি। ব্যস, আর কী চাই?'

'আমাদের ভয়ানক কোন বিপদ হতে পারে,' বলল মৌসুমী।

'কীভাবে? কেনই বা?' প্রশ্ন করলাম।

'তা জানি না,' বলল ও। 'তবে আমার মন বলে।' কিচেনে এঁটো ডিশগুলো নিয়ে যাচ্ছে মৌসুমী।

'মেয়েরা অনেক কিছু টের পায় যেটা পুরুষরা পায় না,' বলে ওকে সাহায্য করতে গেল রিয়া।

'কী রে,' একা পেয়ে রাশেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'তোর মনেও কী কোন সন্দেহ আছে নাকি?'

'ব্যাপারটা উদ্ভট না, তুইই বল,' বলল ও। 'এরকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে অথচ ভাড়া কত কম।'

'হুঁ,' বললাম আমি। শেষমেশ ঘুম ভাঙল আমার।

বড়ই উদ্ভট, কোন সন্দেহ নেই।

পরদিন সকালে আমাদের পুলিসম্যানের সাথে কুশল বিনিময় করতে থাকলাম। আশপাশের রাস্তাগুলোয় আকরামের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা। গাড়ি আর বাচ্চারা ওর একমাত্র সমস্যা। খুব আমুদে লোক। বাইরে বেরোলে ওর সাথে দু'দণ্ড গল্প করার সুযোগটা আমি ছাড়ি না।

'আমার বউয়ের ধারণা আমাদের বিল্ডিংটায় নাকি মারাত্মক সব কাণ্ড-কারখানা ঘটছে,' বললাম ওকে।

'তাই মনে করেন বুঝি উনি,' গম্ভীর মুখে বলল ও। 'আমি কিন্তু করি। কেন জানি মনে হয় বাড়িটার ভেতরে বাচ্চাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে জোর করে কাজ করানো হয়। সারা রাত ধরে ঝুড়ি বানাতে হয় তাদের। আমার অন্তত তাই ধারণা।'

'নিষ্ঠুর এক মহিলা বসে থাকে পাহারায়। হাতে মস্ত এক লাঠি,' জুগিয়ে দিলাম আমি।

বিষণ্ণ চিত্তে সায় দিল ও। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কাউকে বলবেন না কিন্তু। আমি নিজে রহস্যটা ফাঁস করতে চাই।'

ওর বাহুতে একটা হাত রাখলাম আমি। 'আকরাম, আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। কেউ জানবে না।'

'বাঁচালেন,' হেসে উঠে বলল ও। 'ভাবী কেমন আছেন?'

'ভাল। আনাচে কানাচে সবখানে রহস্য দেখতে পাচ্ছে।'

'লেটেস্ট কোন্‌টা?'

'ফ্ল্যাটের ভাড়া। ওর ধারণা পানির দামে ভাড়া থাকছি আমরা। ও বলে, এরকম একটা ফ্ল্যাটের ভাড়া নাকি অন্যখানে প্রায় ডবল।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' বললাম। 'কথাটা যাতে চাউর না হয় দেখবেন, ভাই। ধাঁ করে ভাড়া বেড়ে যেতে পারে।'

'আমি জানতাম,' আমি বাসায় ফিরতে না ফিরতে বলে উঠল মৌসুমী। 'তখনই বলেছিলাম।' কঠোর চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে ও, এক বালতি ভেজা কাপড়ের ওপাশ থেকে।

'কী জানতে?'

'এই বাড়িটার কথা,' বলল। একটা হাত ওঠাল ও। 'কোন কথা নয়,' বলল। 'শুধু শুনে যাও।'

অগত্যা বসে পড়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। 'বলো।'

'এ বাড়ির নীচে অনেকগুলো এঞ্জিন দেখেছি আমি,' বলল ও।

'কী ধরনের এঞ্জিন? গাড়ির?'

মুখটা শক্ত হয়ে গেল ওর। 'বিশ্বাস হচ্ছে না, না?'

'আমিও তো গেছি ওখানে,' বললাম। 'কিন্তু কই আমার চোখে তো কিছু পড়েনি।'

চারধারে নজর বুলিয়ে নিল মৌসুমী জবাব দেয়ার আগে। 'নীচতলার কথা

বলছি না। তারও নীচে। বিল্ডিংটার নীচে।'
মুখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেললাম।
সটান উঠে দাঁড়াল ও। 'বেশ! চলো আমার সাথে, দেখিয়ে দিচ্ছি।'
প্যাসেজে বেরিয়ে এলাম স্বামী-স্ত্রী। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামার সময় আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে রইল ও।
'কখন দেখেছ?' আন্তরিক সুরে প্রশ্ন করলাম।
'আজ সকালে। রাস্তা থেকে ঢুকে দেখি, দরজাটা খোলা।'
'ভেতরে ঢুকেছিলে?' জিজ্ঞেস করলাম।
আমার দিকে কেমন চোখে চাইল ও। 'না ঢুকলে জানলে কী করে?' তড়িঘড়ি সামাল দিলাম আমি।
নীচে নেমে এসে মৌসুমী দরজাটা খুলতে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম আমরা।
'সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি একটা আলো জ্বলছে–' বলল মৌসুমী।
'আর এঞ্জিনও দেখেছ।'
'হ্যাঁ।'
'কেমন, অনেক বড় নাকি?'
তলদেশে পৌঁছে গেছি আমরা। আমাদের সামনে একটা নিরেট দেয়াল।
'এই যে এখানে,' বলল ও।
দেয়ালে দু'তিনবার কিল-ঘুসি মেরে ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলাম।
'ড্যাবড্যাব করে কী দেখছ?' দাবড়ে উঠল ও। 'দেয়ালে দরজা থাকে জানো না নাকি?'
'এটায় দরজা কই?'
দেয়ালটার গায়ে আঙুল বোলাল ও, তারপর দুমাদুম কিল মারতে লাগল দু'হাতে। ঠায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছি ওকে।
'আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?' নিচু আর ভারী শোনাল কেয়ারটেকারের কণ্ঠস্বর।
দ্রুত শ্বাস টানতে শুনলাম মৌসুমীকে। আঁতকে উঠেছি আমি নিজেও।
'আমার স্ত্রীর ধারণা—' বলতে শুরু করেছিলাম।
'আমি ভেবেছিলাম এখান দিয়ে বুঝি রাস্তায় যাওয়া যায়,' কথা কেড়ে নিয়ে বলল মৌসুমী। 'কিন্তু এখন দেখছি দরজাই নেই।' উজ্জ্বল হাসল ও।
স্মিত হাসি কেয়ারটেকারের মুখে।
'আসি, কেমন,' দুর্বল কণ্ঠে বলতে পারলাম আমি।
ওপরে উঠে গেলাম দু'জনে। ফ্ল্যাটে পৌঁছনোর পর শুরু হলো ঝড়; 'আমি নিজের চোখে ওখানে এঞ্জিন দেখেছি!'
'বাহ্, আমি কী অস্বীকার করছি নাকি?' বীর পুরুষের মত বললাম।
'বড় বড় অনেকগুলো এঞ্জিন। ওই লোকটা সবই জানে। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করেছ কিনা বলো। হ্যাঁ-না একটা কিছু জবাব চাই।'
'তুমি আসলে অতিরিক্ত সিনেমা—' মিনমিন করে বলতে চাইলাম।

'থামো!' তড়পে উঠল মৌসুমী। 'নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস করবে তো? আজ রাতে আবার ওখানে যাচ্ছি আমরা। কেয়ারটেকার যখন ঘুমিয়ে থাকবে। লোকটা আদৌ যদি ঘুমায় আর কী।'

'বেশ, যাওয়া যাবে,' সায় দিলাম আমি। এবার শান্ত হলো ও।

গোটা বিকেলটা মাটি করলাম মনিটরের দিকে চেয়ে থেকে। একটা বর্ণও লিখতে পারলাম না। মাথায় কোন আইডিয়া আসছে না। বুদ্ধি গেছে ঘোলা হয়ে। আচ্ছা, ধরে নিলাম মৌ কিছু একটা দেখেছে। কিন্তু কী সেটা? খালেদ মোশাররফ সরণীর অত্যাধুনিক এক ফ্ল্যাট বাড়ির নীচে, একগাদা বিশাল বিশাল এঞ্জিন।

কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? নাকি এসবই ২০৭১ সালের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কুফল?

'ওগো, শুনছ, কেয়ারটেকারটার না তিনটে চোখ!'

মুখের চেহারা ফ্যাকাসে ওর, সত্যিকার ভয় পেয়েছে বোঝা যায়। বাচ্চাদের মত অসহায় দেখাচ্ছে ওকে।

'ওহ, মৌ,' বললাম। জড়িয়ে ধরলাম ওকে দু'হাতে। ওর শরীরে কাঁপুনি টের পাচ্ছি। প্রথমটায় চুপ করে রইলাম। বউ ভয়ে কাঁপলে কী করতে পারে মানুষ? দীর্ঘক্ষণ পর কাঁপুনি থামল ওর।

এবার ক্ষীণ, শান্ত স্বরে বলল ও, 'আমি জানি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না।'

আরেকটু শক্ত হলো আমার আলিঙ্গন।

'আজ রাতে ওখানে নামতেই হবে আমাদের,' বলল মৌসুমী। 'ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী।'

'আচ্ছা, ঘটনাটা কী বলো তো?' বললাম আমি নরম সুরে। 'চোখের কথা জানলে কীভাবে?'

'নীচতলার প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম,' বলল ও। 'কেয়ারটেকারটা ছিল ওখানে।'

'হ্যাঁ, তারপর?'

'আমাকে দেখে মুচকি হাসল ও,' বলল মৌসুমী। 'জানোই তো ওর হাসিটা কেমন। আন্তরিক অথচ নিষ্ঠুর।'

তর্কাতর্কি করার প্রবৃত্তি হলো না। বেচারার চেহারাটাই অমন তো করবে কী? মায়া হলো লোকটার জন্যে।

'ওর পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার পরও, তুমি কী বলবে জানি না—কেন জানি মনে হলো ও আমার দিকে চেয়ে আছে।'

ওর একটা হাত তুলে নিলাম হাতে। 'হুঁ,' বললাম।

'মুখ ফিরিয়ে দেখি, চলে যাচ্ছে লোকটা। ওর মুখটা সামনের দিকে, কিন্তু ও চেয়ে আছে আমার দিকে।'

পিনপিনে একটা কণ্ঠস্বর কানে বাজল। কণ্ঠটা আমার নিজেরই। 'তা কী করে হয়?'

'একটা চোখ আছে ওর মাথার পেছনে।'

কাঠ হয়ে বসে রইলাম। বলার কীই বা আছে?

শক্ত করে চোখ বুজে ফেলল মৌসুমী। খাঁজে খাঁজে বসানো ওর দু'হাতের আঙুল দৃঢ়বদ্ধ। মড়ার মত রক্তশূন্য মুখের চেহারা।

'চোখের ভুল না,' ফিসফিস করে বলল ও। 'আমি কসম খেয়ে বলছি।'

কেয়ারটেকার—এঞ্জিন—চোখ, সব কিছু মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। 'চোখটা আগে দেখিনি কেন আমরা, মৌ?' বললাম। 'লোকটার মাথার পেছনটা তো কতবারই চোখে পড়েছে।'

'ওর চুল হঠাৎ করে ফাঁক হয়ে যায়,' বলল মৌসুমী। 'কিন্তু আমি ছুটে পালিয়ে আসার আগেই আবার চোখটা ঢাকা পড়ে।'

কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

'তুমি যাও শুয়ে থাকোগে,' বললাম শেষমেশ। 'রাতে উঠতে হবে না?'

একটু পরে, বেডরুমে এসে ঢুকলাম। ছাদের দিকে চেয়ে শুয়ে ছিল মৌসুমী। কথাবার্তা হলো না দু'জনের মধ্যে। ওর কথা বলার আগ্রহ আছে বলেও মনে হলো না।

'কী করা যায় বল্ তো?' রাশেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম।

মৌসুমী ঘুমিয়ে পড়েছে। এই ফাঁকে রাশেদের ফ্ল্যাটে এসেছি আমি।

'ভাবী সত্যিই হয়তো এঞ্জিনগুলো দেখেছে,' বলল ও। 'অসম্ভব কী?'

'তুইও?' আমি বিস্মিত। 'তোদের সবার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'সেলিম, তোর কিন্তু নীচে গিয়ে কেয়ারটেকারের সাথে দেখা করা উচিত। তোর অবশ্যই—'

'না,' বললাম আমি। 'এব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই।'

'তুই ভাবীর সাথে তলকুঠুরিতে যাচ্ছিস না?'

'ও গেলে আমাকেও যেতে হবে। এবং ও যাবে।'

'তা হলে যাওয়ার সময় আমাদেরকেও ডেকে নিস।'

অবাক চোখে চাইলাম ওর দিকে। 'তোরাও যাবি?'

চারপাশে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল ও, 'রিয়াও আমাকে একই কথা বলেছে। কেয়ারটেকারটার নাকি তিনটে চোখ।'

ডিনারের পর কফি কিনতে বেরোলাম আমি। আশপাশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল আকরাম।

'পুলিসদের খুব কষ্ট,' বললাম মুচকি হেসে। 'অনেক রাত পর্যন্ত ডিউটি দিতে হয়।'

'ভাবী কেমন আছেন?'

'ভাল,' মিথ্যে বললাম।

'উনি বিল্ডিংটার নতুন আর কোন রহস্য খুঁজে পেলেন?' হাসি মুখে জানতে

চাইল ও।

'নাহ,' বললাম। 'বহুত কষ্টে ওর মাথা থেকে রহস্যের ভূত তাড়ানো গেছে। আপাতত আর ওসব কথা বলছে না।'

মৃদু হেসে, মোড়ের কাছে আমাকে ছেড়ে গেল আকরাম। বাড়ি ফেরার পথটুকু থরথর করে হাত দুটো কাঁপছিল আমার।

'এই, ওঠো,' ডাকল মৌসুমী।

একপাশে কাত হলাম আমি। আধো ঘুম তখনও আমার চোখে। আমার বাহুতে চাপড় মারল ও। চটকা ভেঙে পিটপিট করে দেয়াল ঘড়িটার দিকে চাইলাম। প্রায় চারটে।

'এখন যেতে চাও?' বললাম। সম্মতি জানাল ও।

উঠে বসে, আধো অন্ধকারে ওর দিকে চাইলাম। ধুপধাপ বাড়ি পড়ছে আমার হৃৎপিণ্ডে। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ।

'আমি কাপড়টা পরে নিই,' বললাম। ও ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে। কিচেনে চলে গেল কফি বানাতে। আর এদিকে ঠাণ্ডা পানিতে মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে নিলাম আমি।

মৌসুমী কাপ নিয়ে এলে গরম, কড়া কফি পান করলাম। ও নিজে খেলো না।

'চলো,' বললাম এবার।

আমার বাহুতে ওর হাত। প্যাসেজে যখন বেরিয়ে এলাম, গোটা বিল্ডিংটায় তখন যেন গোরস্থানের নিস্তব্ধতা। সিঁড়ির কাছাকাছি প্রায় এসে গেছি, এসময় রাশেদের কথা মনে পড়ল। বললাম মৌসুমীকে।

'দেরি হয়ে যাবে,' বলল ও। 'একটু পরেই আলো ফুটবে।'

'একটু দাঁড়াও। জাস্ট দেখে আসি ওরা জেগে আছে কিনা।'

ও কিছু বলল না। প্যাসেজের ওমাথায় গিয়ে মৃদু টোকা দিলাম রাশেদের ফ্ল্যাটের দরজায়। সাড়া পেলাম না। এমাথায় চেয়ে দেখি মৌসুমী নেই।

ধক করে উঠল হৃৎপিণ্ড। বিপদের তেমন কোন আশঙ্কা আছে বলে মনে না হলেও, কেন জানি বুকটা ঢিবঢিব করছে।

'মৌ! নিচু কণ্ঠে ডেকে সিঁড়ির উদ্দেশে দৌড়ে গেলাম।

'একটু দাঁড়া!' রাশেদের জোরাল গলা ভেসে এল দরজার ওপাশ থেকে।

কিন্তু আমার তখন দাঁড়াবার উপায় নেই, তরতর করে নীচে নেমে এসে ছুট দিলাম অন্ধকার প্যাসেজ ধরে।

'মৌ!' খাটো গলায় ডাক দিলাম। মৌ, কোথায় তুমি?'

দেয়ালের একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ও। দরজাটা খোলা।

'ওই দেখো,' বলল ও। হ্যাঁ, সত্যিই আছে–বড় বড় এঞ্জিন। চিনতে পারলাম, এ ধরনের জিনিস ছবিতে দেখেছি। মাথাটা হালকা হয়ে গেছে টের পাচ্ছি। বিশাল এক পাওয়ার স্টোরহাউজ খালেদ মোশাররফ সরণীর একটা ফ্ল্যাটবাড়ির ভূগর্ভে।

সময়ের কথা বেমালুম ভুলে গেছি, কিছুই আসলে এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না

আমার। কিন্তু হঠাৎ উপলব্ধি করলাম এখান থেকে শীঘ্রি বেরিয়ে যেতে হবে। পুলিসে রিপোর্ট করতে হবে এ ব্যাপারে।

'এসো,' বললাম জরুরী কণ্ঠে।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠছি, এঞ্জিনের মত কাজ করতে লাগল আমার মগজ। রাজ্যের কল্পনা জট পাকিয়ে রয়েছে ভেতরে—ভয়ঙ্কর সব আইডিয়া।

এবার লক্ষ করলাম কেয়ারটেকারটা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তখনও আঁধার কাটেনি, এক কোণে টেনে সরিয়ে আনলাম মৌসুমীকে। শ্বাস বন্ধ করে নিথর দাঁড়িয়ে রয়েছি।

আমাদের পাশ কাটাল লোকটা। খোলা দরজাটার উদ্দেশে সোজা হেঁটে চলেছে। দরজার আলোটার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। মুখটা ওদিকে ফেরানো ওর।

কিন্তু তারপরও আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে সে।

কাঠ-পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলাম যেমন ছিলাম, ওর মাথার পেছনের তিন নম্বর চোখটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কিনা টের পাচ্ছি না। চোখটা কোন মুখের অংশ নয়, কিন্তু ওটা...ব্যঙ্গের হাসি হাসছে কি? ভাবখানা এমন আমাদের দেখতে পেয়েছে সে কিন্তু পরোয়া করছে না।

দরজাটা দিয়ে ও ঢুকে পড়তে ওটা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে। পাথুরে দেয়ালের একাংশ সরে এসে ঢেকে দিল জায়গাটাকে। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছি আমরা দু'জন। একহাতে জড়িয়ে ধরলাম মৌসুমীকে। 'দেখলে তো?' বলল ও। মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে নিয়ে ওপরে চলে এলাম। এঞ্জিনগুলোর কার্যকারিতা খুব ভাল করেই জানা আছে আমার।

'কী করবে ভাবছ?' মৌসুমী প্রশ্ন করল।

'এখান থেকে বেরিয়ে যাব,' বললাম। 'যত জলদি সম্ভব।'

'কিন্তু কিছুই তো গোছগাছ করা নেই।'

'করে নেব,' বললাম। 'সকালের আগেই এবাড়ি ছাড়ব আমরা। আমার মনে হয় না ওরা—'

'ওরা' বললাম কেন—নিজেও বুঝে পাচ্ছি না। কিন্তু নিশ্চয়ই একটা দল আছে এদের। ওই কেয়ারটেকারটার সাধ্য হবে না একা একা অতগুলো এঞ্জিন বানানোর।

রাশেদ-রিয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্যে থামলাম আমরা, আমি কী ভাবছি জানালাম ওদের।

'আমার বিশ্বাস এবাড়িটা একটা রকেট শিপ,' বললাম।

হেসে উঠল রাশেদ, কিন্তু আমি যোগ না দেয়ায় গিলে নিল হাসিটা।

'কী বললেন?' রিয়া ফ্যাকাসে মুখে বলে উঠল।

'আমার কথা যত অদ্ভুতই শোনাক,' বললাম আমি। 'ওগুলো রকেট এঞ্জিন। অত বড় বড় ভারী এঞ্জিন চাঁদে চালান করে দিতে পারে পুরো বাড়িটাকে।'

'ওখানে ওগুলো গেল কীভাবে?' রাশেদ জানতে চাইল।

'জানি না।' আমার নিজের কাছেও আইডিয়াটা জুতসই মনে হচ্ছে না। 'কিন্তু

আমি নিশ্চিত, ওগুলো রকেট এঞ্জিন।'

'তুই বলতে চাইছিস বাড়িটা একটা...রকেট শিপ?' ক্ষীণ কণ্ঠে শেষ করল রাশেদ।

'হ্যাঁ,' বলল মৌসুমী।

আমার হাত দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে আবারও।

'কিন্তু—' বলল রিয়া। 'কেন?'

মৌসুমী চাইল আমাদের দিকে। 'আমি জানি,' বলল।

'জিজ্ঞেস করতে ভয় হলেও করলাম।'

'ওই কেয়ারটেকারটা,' বলল ও। 'মানুষ না। ওর তিন নম্বর চোখটা...'

জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে চাইল রাশেদ।

'আমি নিজের চোখে দেখেছি,' বললাম আমি।

'ওহ, খোদা।' ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল ও, চুলে আঙুল বুলাচ্ছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে ওরা স্বামী-স্ত্রী।

শীঘ্রিই সকাল হবে। আকরামকে পুরোটা ঘটনা তখন খুলে জানাব আমি।

'ওরা অন্য দুনিয়া থেকে এসেছে,' অমোঘ নিয়তির মত শোনাল এ সময় মৌসুমীর কথাগুলো।

'বলেন কী?' ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল রিয়া।

'ঠিকই বলছি,' দৃঢ় শোনাল মৌসুমীর কণ্ঠ। 'ওরা পৃথিবীতে এসেছে নমুনা হিসেবে কিছু মানুষ-জন নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমাদের নিয়ে ওরা গবেষণা করবে।'

শিউরে উঠল আমার সর্বাঙ্গ। ভিনগ্রহের তিনচোখো প্রাণীরা আমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে ভাবতেই পারছি না আমি।

'আর কীভাবে নেবে?' বলছে মৌসুমী। 'একটা রকেটশিপ ফ্ল্যাটবাড়ি বানিয়েছে। কম ভাড়ায় থাকার জন্যে পতঙ্গের মত ছুটে এসেছে সবাই। তারপর একদিন সকালে, সবাই যখন ঘুমিয়ে কাদা...বিদায় জানাবে পৃথিবীকে।'

যতই ভাবছি মাথাটা কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে আমার। ওর কথা আর অবিশ্বাস করতে পারছি না। করি কীভাবে? তিন তিনবার সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে ওর সন্দেহ। বাড়িটার মধ্যে ও রহস্য আঁচ করেছে, এঞ্জিন দেখেছে, কেয়ারটেকারের তিনটে চোখ আবিষ্কার করেছে—কোন্‌টা মিথ্যে? ওহ্, খোদা, এবারও কি ফলে যাবে মৌসুমীর কথাটা?

'কিন্তু তাই বলে আস্ত একটা দশতলা বিল্ডিং?' বলছে রাশেদ। 'এটাকে তুলবে কী করে ওরা...আকাশে?'

'ভিনগ্রহ থেকে এসে থাকলে ফিরতেও পারবে।'

রাশেদ বিশ্বাস করতে পারছে না কিছুতেই। 'কিন্তু এটা দেখতে তো মোটেই স্পেসশিপের মত নয়।'

'পাথরের দেয়ালগুলো হয়তো আড়াল করে রাখে শিপটাকে,' বললাম আমি। 'হয়তো শুধু বেডরুমগুলো ওটার অংশ। অন্য ঘরগুলো ওদের প্রয়োজন নাও হতে পারে। শোবার ঘরেই তো রাতদুপুরে ঘুমিয়ে থাকে মানুষ—'

'মোট কথা,' কথা কেড়ে নিয়ে বলল মৌসুমী। 'আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এখুনি।'

সবাই আমরা একমত হলাম ওর সঙ্গে। অশুভ এই বাড়িটা ছেড়ে বেরোতে পারলেই বাঁচি।

'বাড়ির আর সবাইকেও জানানো দরকার,' বলল মৌসুমী। 'ওদেরকে আমরা এভাবে ফেলে যেতে পারি না।'

'তাতে অনেক সময় নষ্ট হবে,' বলল রিয়া।

'কিছু করার নেই,' বললাম আমি। 'মৌ, তুমি গুছিয়ে নাও। আমি সবাইকে জানাচ্ছি।'

দরজার কাছে ছুটে গিয়ে হ্যাণ্ডেলে মোচড় দিলাম। কিন্তু শক্ত হয়ে রইল ওটা, এক ইঞ্চি নড়ল না।

'কী হলো?' কেঁপে গেল রিয়ার কণ্ঠ।

'খুলছে না,' বললাম। 'বাইরে থেকে কেউ আটকে দিয়েছে।'

'হায়, খোদা, এখন কী হবে!' কান্নার মত শোনাল মৌসুমীর কথাগুলো।

জানালার কাছে দৌড়ে চলে এলাম। হঠাৎ করে কাঁপতে শুরু করল মেঝে। বাসন-কোসন লাফিয়ে উঠে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। শব্দ পেলাম একটা চেয়ার উল্টে পড়ে গেল কিচেনে।

'একী গজব পড়ল, খোদা!' চেঁচিয়ে উঠল রিয়া। ও কেঁদে উঠতে রাশেদ এগিয়ে গেল সান্ত্বনা দিতে। মৌসুমী দৌড়ে এল আমার কাছে। পায়ের নীচে মেঝেতে তখন প্রচণ্ড কম্পন।

'এঞ্জিনগুলো স্টার্ট নিচ্ছে!' মৌসুমী চিৎকার করে বলল।

একটা চেয়ার তুলে নিলাম। কেন জানি মনে হলো, জানালাগুলোও এঁটে বসেছে। কাঁচের জানালায় সজোরে চালিয়ে দিলাম চেয়ারটা। জোরাল হয়েছে ইতোমধ্যে কম্পনটা।

'জলদি!' শব্দ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'ফায়ার এসকেপ। ওটা দিয়ে আমরা নেমে যাব নীচে।'

কম্পমান মেঝের ওপর দিয়ে দৌড়ে গেল রাশেদ আর রিয়া। জানালার বিশাল ফোকরটার মধ্য দিয়ে প্রায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিলাম ওদের।

রিয়ার ম্যাক্সি ছিঁড়ে গেল, আঙুল কেটে গেল মৌসুমীর। সবার শেষে বেরোলাম আমি। ক্ষুরধার কাঁচ পায়ে আঁচড় বসিয়ে দিল, কিন্তু পরোয়া করলাম না।

ফায়ার এসকেপের ধাপ বেয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছি আমরা। এক পাটি স্যাণ্ডেল খসে পড়ল রিয়ার, কমলা রঙা ধাতব সিঁড়িতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও। আতঙ্কের ও বিস্ময়ের মিশ্র অনুভূতি ওর মুখের চেহারায়। মৌসুমী আর রাশেদ রয়েছে ওর পেছনে, আর সবার শেষে আমি।

অন্যান্যদের লক্ষ করলাম যার যার জানালায়। ওপরে-নীচে কাঁচ ভাঙার শব্দ। ওরা হয়তো মনে করেছে ভূমিকম্প হচ্ছে, আসল ব্যাপার টের পায়নি। দু'জন বয়স্ক নারী-পুরুষ জানালা গলে নীচে নামতে শুরু করলেন। ভয়ানক ধীর তাঁদের

গতি।

ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে তাঁদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে গেল রিয়া। আতঙ্ক মাখা চোখে ওর দিকে চাইলেন বুড়ো মানুষ দু'জন।

মৌসুমী ঝট করে পেছনে এক ঝলক চাইল। 'তুমি আসছ তো?' মুখখানা বিবর্ণ ওর, গলা কাঁপছে।

'হ্যাঁ। থেমো না,' শ্বাসের ফাঁকে বলতে পারলাম। সিঁড়িটার কি কোন শেষ নেই নাকি? কখন মাটি ছোঁব আমরা?

বৃদ্ধা মহিলা এসময় পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর স্বামী বসে পড়ে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। বিপজ্জনকভাবে দুলছে এখন বিল্ডিংটা। ইঁটের ফাঁক গলে উড়ে আসছে ধুলোর মেঘ।

সবাই আমরা তারস্বরে চেঁচাচ্ছি: 'জলদি করো!'

মাটিতে লাফ দিতে লক্ষ করলাম রাশেদকে। তারপর ক্যাচ লোফার মত করে লুফে নিল ও রিয়াকে। হাউমাউ করে কাঁদছে রিয়া। কান্নার ফাঁকে ওর ভাঙা ভাঙা কথাগুলো কানে আসছে: 'আল্লা বাঁচিয়েছে!'

বাড়িটার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে, রাশেদ একবারের জন্যে থেমে পেছনে চাইল, কিন্তু রিয়া হ্যাঁচকা টান দিতে আবারও ছুটল।

'আমি আগে নামি,' ত্বরিত বললাম। একপাশে সরে দাঁড়াল মৌসুমী, লাফিয়ে মাটিতে পড়লাম আমি। পায়ের নীচে যেন হাতুড়ি পিটল পাথুরে জমি। ওপরদিকে চেয়ে, দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম মৌসুমীর উদ্দেশে।

এক লোক পেছন থেকে ঠেলে সরাতে চাইছে ওকে।

'ওই, সর্!' বাঘা গলায় গর্জে উঠলাম আমি। হাতে পিস্তল থাকলে রক্ষা পেত না লোকটা। ওকে আগে ঝাঁপানোর সুযোগ দিতে দাঁড়িয়ে রইল মৌসুমী। লোকটা মাটিতে পড়েই খিঁচে দৌড় দিল।

দেয়াল থেকে খসে পড়ছে ইঁট। এঞ্জিনের গর্জনে কান পাতা দায়।

'মৌ!' হাঁক ছাড়লাম। ও ঝাঁপ দিতে লুফে নিলাম আমি। শ্বাস নিতে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছে, আর পেটের একটা পাশে অসহ্য যন্ত্রণা।

রাস্তায় দৌড়ে গিয়ে উঠতে আকরামকে লক্ষ করলাম। রাস্তা ধরে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মত তখন ছোটাছুটি করছে মানুষ। তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করে চলেছে আকরাম। 'আপনারা ছোটাছুটি করবেন না, শান্ত হোন। ভয়ের কিছু নেই! সব ঠিক আছে!' আশ্চর্য নির্বিকার দেখাচ্ছে ওকে। পুলিসের লোকেরা বুঝি এমনই হয়।

আমরা ধেয়ে গেলাম ওর কাছে। 'আকরাম।' হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম। 'রকেটটা স্টার্ট...'

'কীসের রকেট?' অদ্ভুত চোখে আমার দিকে চাইল ও।

'বাড়িটা। ওটা একটা রকেটশিপ! ওটা...'

ভূমিকম্পের প্রবল কাঁপুনি এখন চারদিকে। আকরাম হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কার যেন বাহু চেপে ধরল। দম বন্ধ হয়ে এল আমার, আর দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল মৌসুমী।

আকরাম তখনও চেয়ে আছে আমাদের দিকে—তার মাথার পেছনের তিন নম্বর চোখটা দিয়ে।

'না,' ফ্যাসফেঁসে শোনাল মৌসুমীর গলা। 'না।'

ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক। ঝট করে ঘাড় ফেরালাম আমি। জান্তব আতঙ্কে আর্তচিৎকার করছে মহিলারা। চারপাশে দৃষ্টি বুলালাম। ভয়ানক দুলুনি এখন রাস্তার ওপর।

আমাদের আর আকাশের মাঝখানে খাড়া উঠে গেছে অনেকগুলো দেয়াল।

'হায়, খোদা,' ককিয়ে উঠল মৌসুমী। 'পালাতে পারব না আমরা। শুধু বাড়িটা না, রাস্তাটাও।'

গোঁ গোঁ শব্দে এবার শূন্যে উঠতে শুরু করল রকেট শিপটা।

কাজী শাহনূর হোসেন

মরা মানুষের মুখ

আমি তখন উত্তরবঙ্গের এক বড় রেলওয়ে শহরে। এবং এ কাহিনির নায়ক ছিলেন ভিনসেন্ট গোমেজ। আমি যখনকার কথা বলছি সে সময় রেলওয়েতে বহু সাদা চামড়ার সাহেব কাজ করতেন। সেই সাথে ছিল অনেক দেশী খ্রিস্টান। বস্তুত, একসময়, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে রেলওয়েতে সাদাচামড়ার সাহেব ও দেশী খ্রিস্টানদের একাধিপত্য ছিল। পাকিস্তানের প্রথম আমলেও তাই এদেরই দেখা যেত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে। ভিনসেন্ট গোমেজকে আমি প্রথমে রেলওয়ের পদস্থ কর্মকর্তা বলে ধারণা করেছিলাম, কিন্তু পরে জেনেছিলাম ভদ্রলোক আসলে রেলওয়ের বড় কণ্ট্রাক্টর। সেই সাথে মানুষজনের মৌখিক আলাপআলোচনায় অনেককিছুই জেনেছিলাম এই রহস্যময় ভদ্রলোক সম্বন্ধে। বছর দশেক আগেও এ অঞ্চলে কেউ তাঁর নামও শোনেনি। শহরের প্রান্তসীমায় নদীর ঠিক ওপারেই সোনাঝরা গাঁয়ের এক দরিদ্র ছুতার পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান। দিন আনা দিন খাওয়াই ছিল তাদের অবস্থা। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে প্রথম লেখাপড়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তার। কিন্তু তার বড়ভাইয়ের সেটুকুও ভাগ্যে জোটেনি। ছুতার পরিবারের বড় ছেলে হাঁটতে শেখা মাত্র যা হয় আর কী। পিতার সাহায্যকারী হিসাবে কাজে লেগে গিয়েছিল।

তার পরের ঘটনা অত্যাশ্চর্যও বটে। ছাত্রাবস্থায় গোমেজ শহরে কী এক খেয়ালে পাঁচ লাখ টাকার এক লটারির টিকিট কেনে দু'টাকায়। আর ভাগ্যক্রমে মাস তিনেকের মধ্যেই সেই টিকিটের নম্বর প্রথম স্থান লাভ করায় প্রথম পুরস্কার পাঁচ লক্ষ টাকা লাভ করে সে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় এই যে সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে সে রাতেই মারা যায় তার বাপ। তারপরের ঘটনা অঙ্কের হিসাবের মত। পাঁচ লাখ টাকার মালিক বনে যায় গোমেজ ও তার বড় ভাই। কিন্তু এই সৌভাগ্য ভোগে লাগেনি গোমেজের বড় ভাইয়ের ভাগ্যে। বুড়ো বাপ মারা যাওয়ার একমাসের মধ্যে পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরতে দেখা যায় তাকে। তাও বেশিদিন নয়। পদ্মা নদীর সেই বিশাল সারার পুলের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে সলিল সমাধি লাভ করে সে। এরপর পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী ভিনসেন্ট গোমেজকে শহরে দেখা যায়। সেও কী যেন এক রোগের শিকার। মুখের বামদিকের ঠোঁট বেঁকে কুঁচকে থাকে সবসময়—অস্বাভাবিক বিকৃতি ঘটেছিল তার মুখে। এবং সবচে' বিস্ময়কর বিষয় এই যে ধীরে ধীরে গোমেজের মুখ তার মৃত পিতার মুখের আকার ধারণ করেছিল—একই ছাঁচে যেন ঢালা।

শুনেছি বহু চিকিৎসা করিয়েছেন ভিনসেন্ট গোমেজ। ঢাকা, কলিকাতা, করাচি, লণ্ডনের বড় বড় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখিয়েছেন। অস্ত্রোপচারও হয়েছে বহুবার। সবই সাময়িক। কিছুদিন পর যা ছিল তাইই। পুনরায় বেঁকে গেছে ঠোঁট। চিকিৎসার পাশাপাশি রেলওয়েতে ক্যারিং কন্ট্রাকটরের কাজ করে গেছেন

নিয়মিত। উপার্জন করেছেন অঢেল টাকা পয়সা, ধনসম্পদ। এত থেকেও সুখ হয়নি বেচারীর। মুখের এই খুঁতের জন্যে ভদ্রসমাজে অবাধ মেলামেশার সুযোগ ছিল না। লুকিয়ে বেড়াতে হত, মানুষজনের সামনে বিব্রত হতে হয়, হীনম্মন্যতা বোধে ভুগতে হত, বের হতে হত রাতের অন্ধকারে। নিতান্ত নিরুপায় না হলে দিনে তিনি বের হন না। হলেও মুখের বামদিক রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখতেন।

সে যাই হোক, এই ভিনসেন্ট গোমেজের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল এক পার্টিতে। এবং তারপর সেই আলাপ পরিণত হলো গভীর অন্তরঙ্গতায়। ভিনসেন্ট গোমেজের বিত্তবান জীবনের গভীরে যে ট্রাজেডি লুকিয়েছিল, তা ধীরে ধীরে জানতে পারি লোকমুখে। ভদ্রলোকের দ্বিতীয়া স্ত্রী, তার স্বজাতীয় এক অ্যাংলো মহিলা তাকে প্রতারণা করে ছেড়ে গিয়েছিল। প্রথমা স্ত্রী তার এই মুখের বিকৃতির জন্য তাকে সহ্য করতে পারতেন না। মানসিক যন্ত্রণায় একসময় সে পাগল হয়ে যায়। পরে আত্মহত্যা করে। বর্তমানে তাঁর অল্পবয়স্কা রূপসী তৃতীয়া স্ত্রীর সঙ্গেও সম্পর্ক ভাল নয়। সবই একই কারণে। ভিনসেন্ট গোমেজের মুখের বিকৃতিই এর কারণ।

সময় সুযোগ মত একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'ঠিকমত চিকিৎসা করেছেন তো, মি. গোমেজ?'

গোমেজ উত্তর দিয়েছিলেন, 'করাইনি আবার। ঢাকা, কলকাতা, করাচি, লণ্ডন—কোথায় না চিকিৎসা হয়েছি? বড় বড় নামজাদা চিকিৎসক দেখিয়েছি; কিন্তু কিছুদিন ঠিকঠাক থাকলেও—পরে যা, তাই।'

'অপারেশনে যাননি?'

'তাও করিয়েছি, কিন্তু সবই সাময়িক। প্রথম প্রথম ঠিক থাকে, পরে আবার বিকৃতি দেখা দেয়, তারপর আবার সেই আগের অবস্থা। আসলে এ আমার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। নয়তো গ্যাব্রিয়েল যখন কবরে আমার বাবার হিসাব-নিকাশ নিচ্ছিলেন, তখন আমি সেই কবরে ঢুকব কেন? এ আমার পাপ—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। আজীবন করে যাব।' দু'হাতে মুখ চেপে ভিনসেন্ট গোমেজ কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আমি হতবাক!

পাপ! কীসের পাপ? কে জানে?

অল্পসময় পরে ভিনসেন্ট গোমেজ নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তাহলে খুলেই বলি, মিস্টার। আমাদের গ্রাম নদীর ঠিক ওপারেই—সোনাঝরা নাম। ব্রিটিশ আমলে ফাদারদের আনাগোনার ফলে অনেকেই খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করে। আমরাও। বাবা ছুতোর মিস্ত্রি। আমরা দুই ভাই। বড়ভাই মহেশের লেখাপড়া হলো না। বারো বছর বয়সেই তাকে নিজের সহকারী করে নিল বাবা। আমি লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম। প্রাইমারি স্কুলে বৃত্তি পাওয়ায় শহরে এসে হাইস্কুলে বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ পেলাম। প্রতিদিন খেয়া নৌকায় এপার-ওপার করতে হত আমাকে। এরপর তিন চার মাইল হাঁটতে হত। আমরা গ্রামের মানুষ—ওটুকু কোন কষ্টই মনে হত না আমার।

এভাবেই চলছিল জীবন। আমি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখনই ঘটল

ঘটনাটা। সেবার কোনরকমে কষ্টেসৃষ্টে দুটো টাকা বাঁচিয়ে শহর থেকে দু'টাকার লটারি টিকিট কিনলাম একখানা। প্রথম পুরস্কার পাঁচ লক্ষ টাকা। কথাটা কাউকেই বলিনি। কারণ এই অপব্যয়ের জন্য—বাপের কাছে বকা খেতে হত। টিকিটটা গোপনে বাড়িতে এনে তোরঙের নীচে বাবার পুরনো কোটের চোরা পকেটে রেখে দিলাম। ওই কোটটা যেহেতু বাবা ব্যবহার করত না, সেহেতু সেটাই ছিল নিরাপদ জায়গা। তা ছাড়া তোরঙটা কেউই ব্যবহার করত না সাধারণত। সুতরাং নিশ্চিন্ত ছিলাম।

টেস্ট পরীক্ষার পর কয়েকজন পয়সাওয়ালা বন্ধুর সঙ্গে, তাদেরই আগ্রহে ও খরচে জীবনে প্রথমবারের মত কলকাতা শহরে গেলাম। আমার মত গ্রামের ছেলের চোখে কলকাতা আশ্চর্য এক মোহময় নগরী। বেশ কয়েকদিন ঘুরে বেড়ালাম, দর্শনীয় স্থান ও দ্রষ্টব্য বস্তু দেখে। এরই মাঝে খবরের কাগজে হঠাৎ দেখলাম লটারির ফলাফল। টিকিট নম্বরটা যেহেতু আমার স্মরণে ছিল, তাই সেই নম্বরটাকে যখন প্রথম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে দেখলাম, তখন আমার চোখ দুটো যেন কপালে উঠে গেল। ভাগ্য ভাল যে সেসময় বন্ধুরা কাছে ছিল না, তাই সম্পূর্ণ বিষয়টা গোপন করে আমি সেদিন সন্ধ্যার গাড়ি ধরে ফিরে এলাম শহরে। সেখান থেকে রাতেই গ্রামে। এবং তখনই জানলাম আমার জন্যে কী প্রচণ্ড শক্ অপেক্ষা করছে!

সমস্ত বাড়ি অন্ধকার থমথমে। প্রচণ্ড শোকে সবাই কাতর। কারও মুখে কথা নেই। সর্বপ্রথম বৌদি নীরবতা ভাঙলেন। জানলাম দু'দিন আগে বাবা কাজ করতে করতে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। চিকিৎসার সময় পর্যন্ত দেয়নি। আমার ঠিকানা জানা না থাকায় শহরে গিয়েও কেউ খবর দিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত গতকাল দুপুরে সবরকম ক্রিয়াকর্ম শেষ করে বাবাকে কবর দেওয়া হয়েছে শহরের খ্রিস্টান পাড়া কবরখানায়। আচমকা এই শোকের ধকলে আচ্ছন্ন থাকলাম সে রাত। পরদিন বাবার তোরঙ কাপড়চোপড় সহ উঠানের রৌদ্রে শুকোতে দেওয়া দেখে মুহূর্তে কোটের কথা মনে পড়ে গেল। সেটা সেখানে নেই। বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করাতে বলল সে কোটটা যেহেতু বাবার খুব পছন্দের, তাই সেটা পরিয়ে কফিনে দেওয়া হয়েছিল লাশ।

ব্যস্, এই এক খবরে মাথা খারাপ। পাঁচ লক্ষের টিকিটটা এখন বাবার সঙ্গে কবরে এবং আমি ছাড়া এই গূঢ় রহস্য কেউ জানে না। এখন কী করি? বহু ভেবেচিন্তে কোন কূল পেলাম না। শেষকালে ঠিক করলাম, টিকিটটা চাইই। তাতে কবর খুঁড়ে, কফিন ভেঙে যদি সেটা কোটের পকেট থেকে বের করে আনতেও হয়, তাই করব। কোন উপায় নেই! কারণ এত টাকা আমরা কোনদিন পাবার স্বপ্ন দেখিনি, আর হাতছাড়া করার মত অবস্থাও আমাদের নেই। কিন্তু কাজটা করতে গেলে প্রচণ্ড সাহস প্রয়োজন। নির্জন কবর স্থানে গভীর রাত ছাড়া কবর খোঁড়া সম্ভব নয়। অতঃপর কফিন খোলা। সেখানে বাবার মৃতদেহ কী অবস্থায় আছে কে জানে! কবরে মৃতের সওয়াল জবাব হয়ে থাকে। কারা সেখানে থাকবে, না থাকবে; কী দেখব না দেখব। মৃতের পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গ করা কতদূর সঠিক হবে কে জানে। এইসব ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠল। আমি খুব

সাহসী না হলেও ভীরু নই। তাছাড়া পাঁচ লাখের একটা প্রলোভন আমাকে সম্ভবত দুঃসাহসী করে তুলেছিল। কিন্তু একাজ তো একার পক্ষে সম্ভব নয়। কমপক্ষে দু'জন প্রয়োজন। কোদাল, শাবল, দড়ি দড়া নিতে হবে সঙ্গে। একজন সাহায্যকারী দরকার।

শেষ পর্যন্ত সব কথা খুলে বললাম বড়ভাইকে। প্রথমটায় সে চমকে উঠল। কিছুতেই রাজী নয়। শেষে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে, অর্ধেক ভাগ দেবার শর্তে রাজী হলো সে। প্রয়োজনীয় কোদাল, শাবল, অন্যান্য দ্রব্যাদি চটের ছালায় মুড়ে বিকালের দিকে আমরা দুই-ভাই বাবার কবর দেখার নাম করে বাড়ি থেকে বের হলাম। শহরে পৌঁছে ছালাটা রাখলাম পরিচিত এক মুদির দোকানে। তারপর খ্রিস্টানদের কারখানায় ঢুকলাম কবর দেখতে। ভাঙা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা পুরাতন কবরখানা। লম্বা লম্বা ঘাস, গুল্ম—বড় বড় কতকগুলো গাছ জায়গাটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভাঙাচোরা বাঁধানো কবরে কিছু কিছু মার্বেল ফলকে কবরবাসীদের পরিচয় লেখা। তারই একধারে নতুন মাটি তোলা কবর—কাঠের একটা ক্রুশ মাথার দিকে। আমরা দু'জন মৃত বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে কবরটা ভালভাবে নিরীক্ষণ করে ফিরে গেলাম শহরে। প্রকৃত পক্ষে জনহীন এলাকা এটা। সুতরাং সবার অগোচরে কাজটা ঠিক মত করা যাবে ভেবে উল্লসিত হলাম।

দ্রুত সন্ধ্যা নামল। শীতের দিন। নদী থেকে কুয়াশা উঠে দ্রুত ছেয়ে গেল শহর। আমরা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরলাম এদিক ওদিক পরিচিতদের নজর এড়িয়ে। রাত আটটার দিকে এক ঝোপড়া হোটেল থেকে খেয়েদেয়ে, মুদীর দোকানে গেলাম। যন্ত্রপাতি ভরা ছালাটা নিয়ে সময় কাটানোর জন্যে রাত ন'টার শো'তে ঢুকলাম রূপালী সিনেমায়। মোটামুটি রাত বারোটা পার।

শো যখন ভাঙল, সারা মফঃস্বল শহর গভীর নিদ্রামগ্ন। হলের দর্শকরা দ্রুত যে যার আশ্রয়ে ফিরছে। আমরা দু'জন শুধু চলেছি কবরস্থানের দিকে। ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে পেন্সিল টর্চের আলোয় পথ দেখে বাবার কবরের সামনে দাঁড়ালাম। মাথার উপর কোন ছাতিম গাছে পেঁচার হুম হুম ডাক পিলে কাঁপিয়ে দিল প্রথমেই। ঝোপঝাড়ে জোনাকি জ্বলছে দপ্‌দপ্ করে। আশপাশে সড়সড় শব্দ শোনা গেল—হয়তো শিয়াল হবে। বড়ভাই সাহস করছিল না। তাই আমি প্রথম কোদাল দিয়ে মাটি সরানো শুরু করলাম। তারপর সেও হাত লাগাল। অত্যন্ত দ্রুততায় মাটি প্রায় সরিয়ে ফেলেছি, তখন এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ল। জ্যোতির্ময় এক লম্বা আলখেল্লাধারী আলোর পুরুষ কবরের ভিতর থেকে মুহূর্তে অদৃশ্য হলো। প্রথমটায় চমকে গিয়েছিলাম। পরে ভাবলাম, এ আমার চোখের ভুল। ভাগ্য ভাল বড়ভাই পিছনে থাকায় এ দৃশ্য সে দেখেনি, নয়তো সে দৌড় দিত তখুনি।

যা হোক, কফিন খোলা হলো কবরের মধ্যেই। সঙ্গে সঙ্গে পচা দুর্গন্ধ ভেসে এল নাকে। পেন্সিল টর্চের আলোর সঙ্গে পূর্ণিমার পরিষ্কার এক ঝলক আলোও পড়ল কবরে। সেই আলোয় দেখলাম আমার বৃদ্ধ বাপের কুঞ্চিত মুখ ভয়ঙ্করভাবে বেঁকে আছে। দ্বিতীয়বার সেদিকে তাকানোর মত সাহস ছিল না। আমি কোনরকমে মৃতের কোটের চোরা পকেট থেকে টিকিটটা বের করে পুনরায় বন্ধ

করে দিলাম কফিন। তারপর দ্রুত হাতে দু'জনে কবরটা মাটি ফেলে ভরাট করে দিলাম। পেন্সিল টর্চের আলোয় দেখলাম টিকিটটা। সেই নম্বরই বটে। উত্তেজনায় আমার হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছিল। যন্ত্রপাতি সব গুছিয়ে চটের ছালাতে ভরে দু'জনেই নদীর ঘাটে চলে এলাম। সেরাতে নৌকা ছিল না। ঘাটে চালার নীচে বসে দুইভাই শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। টিকিটের বিষয়ে প্রশ্ন করায় বড়ভাইকে মিথ্যা করে জানালাম যে টিকিট পেয়েছি বটে, তবে সেটি ভুল নম্বরের। মাত্র এক নম্বরের জন্য আমরা পাঁচ লক্ষ টাকা মিস করেছি। শুনে হাউহাউ করে বড়ভাইয়ের সেকি কান্না! এত কষ্ট করেও যদি ফল না খাওয়া যায়, কষ্ট হয় বৈকি! তা ছাড়া, বড় ভাই মাথামোটা ধরনের মানুষ। সব কথা বিশ্বাস করে ও সহজেই যেকোন বিষয়ে ভেঙে পড়ে।

এই ঘটনায় হতাশ হয়ে পড়ে সে। মাথায় গোলমাল দেখা দেয়। পরে একদিন নদীর উঁচু রেলওয়েব্রিজের উপর থেকে নীচে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে। ফলে তার আত্মহত্যার জন্য প্রকারান্তরে দায়ী হই আমি। কিন্তু তখন এসব বিষয় নিয়ে ভাবার সময় ছিল না আমার। হাতে অঢেল টাকা। রেলওয়ের বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে দহরমমহরম। দু'হাতে ভেট দিচ্ছি—চার হাতে বড় বড় কাজের কণ্ট্রাক্ট পাচ্ছি। টাকায় দু'টাকা লাভ। পানির মত টাকার স্রোত ঢুকছিল আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

এইসময় প্রথম বিয়ে করি। আমার স্ত্রী কলকাতার ফিরিঙ্গি পরিবারের এবং তাকে বিয়ে করার পরপরই মুখের রোগ দেখা দেয় আমার—বেঁকে যায় বাম দিকের উপরের ঠোঁট। ফলে দুটো দাঁত বের হয়ে আসে উপরের মাড়ির। বিশ্রী আকার ধারণ করে মুখটা। সবচে' আশ্চর্য যে আমার মুখটা বেঁকে ধীরে ধীরে আমার মৃত বাবার মুখের মত আকার ধারণ করে—ঠিক যেন মরা মানুষের মুখ হয়ে যায়। ফলত স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা বাধাগ্রস্ত হয়। জোর করে আমি তাকে বিছানায় নিতে চেষ্টা করি। তাতেই মনোমালিন্য। শুরু ঝগড়াঝাঁটির। শেষ পর্যন্ত বেচারী আত্মহত্যা করে আমাকে নিস্কৃতি দেয়।

ভেবেছিলাম আর ওপথে যাব না। কিন্তু কী যে হয়ে গেল জানি না। আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীর সঙ্গে করাচীতে আলাপ। সেও আমাদের ঘয়ানার—দেশী খ্রিস্টান, তবে কনভেন্টে পড়া মেয়ে। তুখোড় ইংরেজি জানা। চমৎকার দেখতে। ফলে আবার আমি ট্র্যাপড হয়ে গেলাম। সে নিজেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। আমার মুখ সংক্রান্ত ত্রুটিকে আমল না দিয়ে একদিন গির্জায় নিয়ে গেল আমাকে। বিয়ে হলো করাচিতেই। সেখানেই হানিমুন সেরে ফিরে এলাম দেশে। তখনও জানতাম না যে আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী শুধুমাত্র টাকার লোভে এসেছিল আমার ঘরে। যখন জানলাম তখন সে তার জাতের এক তরুণ রেলওয়ে গার্ডের হাত ধরে দামী গহনাপত্র, কাপড়চোপড় ও তার অ্যাকাউন্টে রক্ষিত মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে সরে পড়ল ফাঁকি দিয়ে।

এরপর দীর্ঘকাল আমি একাই ছিলাম। কিন্তু মানুষে থাকতে দিল কোথায়? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত এক পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলাম কিছুদিন। তারাই তাদের প্রথমা কন্যাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে সম্ভবত ঋণ শোধ করেছিল।

ব্যস্, সেই থেকে ও আছে এখানে। ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, আমাদের সমাজের এটিকেট, ম্যানার, পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান সহ সবই শিখিয়েছি বাসায় গভর্নেস রেখে। যদিও তাদের পরিবার সহ সকলেই আমার কাছে ঋণী, এবং সেও বলে; তবুও আমি জানি কোন তরুণী মহিলাই আমার মত পঞ্চাশোত্তীর্ণ কুৎসিত মুখের স্বামী প্রত্যাশা করে না। আর ঠিক এ কারণেই আমি শেষবারের মত চেষ্টা নিতে চাই, অন্তত ঠোঁটটা যদি স্বাভাবিক করা যেত।'

ভিনসেট গোমেজের জীবন ইতিহাস শোনার পর আমি নিরুত্তর। বাস্তবিক পক্ষে আমার কিই বা বলার ছিল যে বলব? তবে ভদ্রলোকের ট্রাজিক জীবন যে গভীর ভাবে আমাকে নাড়া দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আমি সেদিন গোমেজকে কোন সান্ত্বনার কথা বলতে পরিনি। চুপচাপ চায়ের টেবিল থেকে উঠে এসেছিলাম। এবং গোমেজ তাঁর মৃত পিতার মুখের ছদ্মবেশে স্থির, নিস্পলক চোখে করুণভাবে তাকিয়েছিল সুদূরে দৃষ্টি মেলে।

এরপর ভিনসেন্ট গোমেজ সম্পর্কে নতুন কোন খবর কানে আসেনি বা গোমেজের সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি। তবে মাস দুয়েক পর হঠাৎ করে ভিনসেন্ট গোমেজের আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মৃতদেহ দেখার জন্য তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। নিজের লাইসেন্স করা রিভলভার দিয়ে ঠিক হৃদপিণ্ডে গুলি করেছিলেন গোমেজ। এ ধরনের আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির লাশের সাধারণত মুখের বিকৃতি থেকে যায়, কিন্তু মৃত গোমেজের মুখে কোন বিকৃতি দেখা যায়নি, বরং সে মুখে ছিল প্রশান্তির আমেজ। যে মুখের বিকৃতির জন্য তাঁর আফসোসের অন্ত ছিল না, সেই মুখ ছিল আশ্চর্যরকম নিখুঁত। জানি না এর পিছনে কী কারণ। তবে পরবর্তীকালে জেনেছিলাম, তাঁর অল্পবয়সী স্ত্রীকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে; আর তাঁর সমস্ত সম্পদ তাঁর সমাজের মানুষ ও গির্জার উন্নতির জন্য উইল করে দান করে গেছেন। সম্ভবত, এভাবেই মি. ভিনসেন্ট গোমেজ তাঁর কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছিলেন।

এহসান চৌধুরী

এক সে

তার সাথে আবার দেখা হবে কোনও দিন, স্বপ্নেও ভাবিনি আমি। তারপরও যখন দেখা হয়েই গেল, মন চাইছিল তাকে একটু ছুঁতে, তার একটু পরশ পেতে। কিন্তু তা যে আর সম্ভব নয়। সে যে আজ অন্য কারও।

ওর নিষ্পলক চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না, সরিয়ে নিলাম চোখ। বুকের ভিতর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অনেক কিছু থেকেও যেন কিছুই নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একই ইয়ারের স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা। ক্লাস শেষে ক্যাম্পাসের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা, হাতে হাত রেখে কথা বলা, দুজনে মিলে সুখের স্বপ্ন দেখা। আরও কত কী!

ওর সাথে আমার প্রথম পরিচয় 'স্টাডি ট্যুরে'। সেবার আমরা গিয়েছিলাম রাঙ্গামাটি আর কুয়াকাটা দিয়ে কক্সবাজার। মিষ্টি গানের গলা ছিল ওর। আসবার পথে ছেলেমেয়ে দু'দলে ভাগ হয়ে গানের লড়াই খেললাম। তবে শেষ পর্যন্ত ফল অমীমাংসিতই ছিল। ও-ই সবচেয়ে বেশি উত্তর দিয়েছিল।

বাসায় ফিরলাম বটে, কিন্তু মনটা বাঁধা পড়ে রইল তার কাছে। যে আমি ক্লাস করতে চাইতাম না, সেই আমি নিয়মিত ক্লাসে আসতে শুরু করলাম। অন্তত একটিবার তার দেখা পাব বলে।

ধীরে ধীরে আমাদের সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে থাকল। আমরাও এলাম কাছ থেকে আরও কাছে।

সেবার আমাদের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা চলছিল। শেষ পরীক্ষার দিন হল থেকে বের হতেই ওর এক বান্ধবী এসে ওকে জানাল গ্রামের বাড়ি থেকে লোক এসেছে আর ওর জন্য অপেক্ষা করছে। হন্তদন্ত হয়ে তখনই সে চলে গেল।

সেকেণ্ড, ঘণ্টা, দিন পেরিয়ে সপ্তাহ পেরোল। তবুও তার কোনও দেখা না পেয়ে ছুটলাম ওর সেই বান্ধবীর কাছে। সে জানাল বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে দেরি না করে গ্রামের সেই লোকটার সাথেই গ্রামে চলে গেছে ও।

এতদিন দেখা না করার জন্য মনে মনে যে অভিমান জমা হয়েছিল তা একমুহূর্তে গলে ভালবাসায় পরিণত হলো। কিন্তু অপেক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে সহ্যের শেষসীমায় পৌঁছে গেছিলাম, তাই ঠিকানা চাইলাম আমি। কিন্তু কেউই তা পারল না দিতে। নিজের উপর রাগ হলো, এতদিনেও ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিইনি কেন বলে। কী আর করা, শুরু হলো আবার প্রতীক্ষার পালা।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে একদিন ওর একখানা চিঠি পেলাম। প্রথমে চাঁদ হাতে পেলেও মুহূর্তেই সব আনন্দ উবে গেল কর্পূরের মত। কারণ চিঠিতে লেখা আছে, ওর বাবার শরীর খারাপের খবর আসলে মিথ্যা। ওকে গ্রামে নিয়ে

যাবার জন্য বাহানামাত্র। গ্রামে যাবার কয়েক দিনের মাথায় ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ওর স্বামী একজন ব্যবসায়ী। তা ছাড়া প্রচুর সম্পত্তিরও মালিক। মোটামুটি জমিদার। কোনও সুযোগই ছিল না যোগাযোগের। সেই কারণে যোগাযোগ করতে পারেনি।

চোখে অন্ধকার দেখলাম আমি। সমস্ত পৃথিবীটাকে খুব স্বার্থপর মনে হলো। মনে মনে নিজেকে তৈরি করলাম চরম মুহূর্তের জন্য। কিন্তু পারলাম না বাবা-মায়ের কথা মনে করে। এরমধ্যে সুযোগ এল বাংলাদেশ পুলিশে চাকরি করার। চলে গেলাম সেখানে। আজ আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর। আছি মতলব থানায়, আজ অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও, ওকে সম্পূর্ণরূপে ভুলতে পারিনি।

লাশবাহী গাড়ি আসতেই, ডেড্‌বডি গাড়িতে তুলে নিতে বলে আমি আমার গাড়িতে এসে বসলাম। চলে আসলাম বললে একটু মিথ্যেই বলা হবে। সত্যি বলতে কী, পালিয়েই এলাম। একদিন যে চোখে আমি আমার জন্য ভালবাসা দেখেছি, দেখেছি নানান স্বপ্নের জাল, সেই চোখ নিথর হয়ে আছে। একদম মেনে নিতে পারছিলাম না।

এক কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দিলাম ওর বাড়িতে খবর দিতে।

ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে এসে বসলাম থানায়। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে একলোক দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ঢুকল থানায়, আরেকটু হলে আমার গায়ের উপরেই এসে পড়ত। লক্ষ করতেই দেখলাম, চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। বুঝলাম কোনও কারণে রাতে ঘুমাতে পারেনি, তার উপর কান্নাকাটি করার জন্য এই অবস্থা।

পরিচয় নিয়ে জানলাম, ইনিই তারানার স্বামী সাজিদ খান। অত্র এলাকার অঘোষিত জমিদার। আর এও বুঝলাম ইনি স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। তা না হলে স্ত্রীর জন্য শরীরের অবস্থা এরকম করতেন না। সত্যি তারানা বড়ই ভাগ্যবতী।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমি বললাম, 'পোস্টমর্টেম হয়ে গেলে কাল বিকেলনাগাদ আপনি তারানার লাশ নিয়ে যেতে পারবেন।'

অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল সাজিদ খানের গলা থেকে। অনেকটা অনুনয় করে বললেন, 'পোস্টমর্টেম না করলেই কি নয়।'

'এটা একটা ফর্মালিটি মাত্র।'

'কিন্তু ওটা না করার কোনও উপায় নিশ্চয় আছে। মৃত্যুর পরে ওকে আর যন্ত্রণা না দিলেই কি নয়?'

'আমরা এক্ষেত্রে অপারগ, মিস্টার সাজিদ। দায়িত্ব আর কর্তব্যের কাছে ইমোশনের কোনও মূল্য নেই।'

সাজিদ খান আর কোনও কথা বললেন না, সোজা বেরিয়ে গেলেন। কেউ যেন আমার ঘাড়ের উপর হাত রাখল, আমি মাথা ঘোরালাম। কিন্তু এ কী! কেউ নেই পিছনে। কিন্তু আমি নিশ্চিত কেউ একজন আমার ঘাড়ে হাত রেখেছিল। আমি আপসেট হয়েছি বটে, তবে এতটা নয় যে জেগেই স্বপ্ন দেখব। কেন এমন হলো?

দুই

কিছুক্ষণ আগে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পেয়েছি। সাধারণ মৃত্যু। সিম্পলি সড়ক দুর্ঘটনা। গাড়ির ধ্বংসাবশেষ যা পাওয়া গেছে এক্সপার্টরা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোনও রকম গরমিল নেই।

ওর স্বামী আজ সকালে এসে ওর লাশ নিয়ে গেছে। আজ বাদ মাগরিব ওর দাফন করা হবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো ওর ওখানে আমাকে যেতেই হবে, তবে সত্যি বলতে একদম ইচ্ছে করছিল না।

সামনে পড়ে থাকা ফাইলটা টেনে নিলাম। এটা তারানার ফাইল, বন্ধ করতে হবে। সিম্পল রোড অ্যাক্সিডেন্ট মাত্র। তদন্তের কোনও প্রয়োজন নেই।

ফাইলটা মেলতেই, আমার চোখ স্থির হয়ে গেল। কারণ ফাইলের পাতায় রক্ত দিয়ে বড় করে লেখা—'না।'

মনে মনে প্রচণ্ড রাগ হলো। এরকম ফাজলামি করার মানে কী? আসাদকে ডাক দিলাম।

একটা লম্বা সেলাম দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল আসাদ।

বেশ রাগত স্বরে বললাম, 'কী ব্যাপার, আসাদ, আজকাল নেশাটেশা করছ নাকি?'

'কেন, সার? এ কথা বলছেন কেন?'

'আমার কাছে ফাইলটা পাঠানোর আগে ঠিকমত দেখে নিয়েছিলে তো?'

'হ্যাঁ, সার। খুব ভাল করেই দেখেছি।'

'তা হলে এসব কী?' বলে ফাইলটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। একবার ভাল করে দেখে মুখ কাঁচুমাচু করে আসাদ বলল, 'সার, সবই তো ঠিক আছে।'

রাগটা এবার শেষ সীমায় এসে পৌঁছাল। বলে কী ছেলেটা? আমি কি জানি না কোন কাগজগুলো লাগবে। তাই রাগের সাথেই এক ঝটকায় ওর হাত থেকে ফাইলটা নিয়ে নিলাম। আর সাথে সাথেই একটা ধাক্কা খেলাম। সেই রক্তে লেখা পাতাটা নেই, বরং প্রয়োজনীয় সব কাগজই রয়েছে।

আমাকে এভাবে হতভম্ব হতে দেখে আসাদ তাড়াতাড়ি বলল, 'সার, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

আমি ওকে হাত ইশারায় চলে যেতে বললাম। কী করে ওকে কথাগুলো বলব! হয়তো আমাকে পাগলই ধরে নেবে, নয়তো মনে করবে থানাতেই বসে আজকাল আমি নেশা করছি। কিন্তু কী করে বোঝাব আমি কাগজটা সত্যি দেখেছি।

মোবাইল ফোনের মেসেজ টোন বেজে উঠতে আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। বের করে দেখতেই আরও একবার ধাক্কা খেলাম। মেসেজ অপশনে লেখা আছে, 'আমি দুর্ঘটনায় মরিনি। আমাকে খুন করা হয়েছে। তুমি এর একটা ব্যবস্থা

করো। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই, আরেফিন।'

তারানা।

পড়া মাত্র শেষ হয়েছে, সব লেখা মুছে গেল।

এবার সত্যিই একটু ভয় পেলাম। আমার সাথেই কেন এমন হচ্ছে ভেবে পেলাম না। নিজেকে বোঝাতে চাইলাম—যা দেখেছি তা আমার কল্পনা। অলীক ধারণা। তারানাকে বেশি ভালবাসতাম, এজন্যই এমন হচ্ছে।

যতই বুঝ দিই না কেন, মন মেনে নিতে পারল না। অবশেষে মনের সাথে যুদ্ধে যখন আর পারলাম না তখন গাড়ি নিয়ে বের হলাম।

তিন

আমি যখন 'খান মঞ্জিল'-এ পৌঁছালাম তখন লাশের সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম শেষে বাড়ির সামনে জানাজার জন্য রাখা হয়েছে। জানাজায় অংশ নিতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে। কারও কারও চোখের পাশ বেয়ে অশ্রুর চিকন রেখাও দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত লাগছিল সাজিদ খানকে। চোখ দুটো এত লাল, যেন পানি অশ্রু হয়ে নয়, বরং রক্তই অশ্রু হয়ে ঝরছিল দু'চোখ বেয়ে। খুব খারাপ লাগছিল লোকটাকে দেখে। একবার দেখেই অনুমান করা যায়, তারানাকে সে কত ভালবাসত।

লাশকে ঘিরে অনেক লোবান জ্বলছিল। একেক লোবান একেক রকম গন্ধ বিলাচ্ছিল। কিন্তু আমার মনে হলো লোবানের ধোঁয়া যেন অক্ষরের রূপ নিয়ে আমাকে কিছু জানাতে চাচ্ছে, বোঝাতে চাচ্ছে কিছু অব্যক্ত কথা। আমার মনটা ব্যথায় ভারাক্রান্ত ছিল, তাই এগুলো মনের ভুলই ধরে নিলাম।

জানাজা পড়া শেষ হতেই ছুটে এসে লাশের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন সাজিদ খান। খুব খারাপ লাগল আমার। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। আর এবার স্পষ্টই দেখলাম লোবানের ধোঁয়ায় গঠিত বাতাসে ভাসমান কিছু অক্ষর, যেগুলোকে এক করলে দাঁড়ায়, 'সবটাই মেকি, সবটাই নাটক, সবটাই লোক দেখানো।'

আমি নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সাজিদকে সরিয়ে নিতেই সকলে মিলে লাশটা বয়ে নিয়ে চলল গোরস্তানের দিকে। আমি একপাশ ধরলাম। আমি যাকে মনের ভুল ধরেছিলাম তা যে ডালপালা বিস্তার করতে শুরু করেছে তা বেশ বুঝতে পারলাম। কারণ কথাগুলো ঘুরে-ফিরে মাথায় আঘাত করতে লাগল।

সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা ঘটল লাশ কবরে নামানোর ঠিক আগমুহূর্তে। অনেক চেষ্টা করেও কেউ লাশ ছুঁতে পারছিল না। লাশ ধরতে গেলেই একেক জনের একেক রকম অনুভূতি হচ্ছে। কেউ বলছে আগুনে হাত রাখার মত, কেউ বলল বরফে, আবার কেউ বলল বিদ্যুতের শক খাবার মত অনুভূতি।

সাজিদ খান আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। হঠাৎ তিনি তাড়া খাওয়া কুকুরের মত দৌড় দিলেন বাড়ির দিকে। দুই তিনজন লোকও পিছন পিছন দৌড় দিল, পাছে না কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। লোকটার জন্য খুব দুঃখ হলো, কারণ ভদ্রলোক হয়তো খুব শীঘ্রই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবেন।

এবার লাশের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। দেখি আমার কী হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমার কিছুই হলো না। আমি একাই মৃতদেহ কবরে নামালাম। এরপর সবাই মিলে বাকি কাজ সমাধান করলাম।

সবাই ফিরে চলল যার যার বাড়ির দিকে, কিন্তু আমার পা চলছিল না। যে দিন প্রথম শুনেছিলাম তারানার বিয়ে হয়ে গেছে সেদিন যেমন লাগছিল, আজ তেমনই লাগছে। কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা। কিছুই ভাল লাগছিল না। এমন সময় কেউ একজন পিছন থেকে আমার হাত চেপে ধরল। আমি চট করে ঘুরে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম কেউ নেই।

আমার মন বলছে কিছু একটা গণ্ডগোল অবশ্যই আছে, কিন্তু কী সেটা তাই-ই বুঝতে পারছি না।

চার

কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি কিছুই মনে এল না। মোহাচ্ছন্নের মত গাড়ি চালিয়ে গেলাম। তবে চালিয়ে গেলাম বললে একটু মিথ্যে বলা হবে, আসলে কেউ যেন আমাকে জোর করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

একটা তীক্ষ্ণ, তীব্র চিৎকারে আমার চমক ভাঙল। একজন মেয়ে আমার গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়েছে।

আমি ঘুরে তাকালাম পিছন দিকে। রাস্তার উপর লাশটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার চারদিক। গাড়ির ব্রেক কষলাম। যা থাকে কপালে ভেবে নেমে এলাম গাড়ি থেকে।

এক পা দু'পা করে অবশেষে এসে পৌঁছালাম লাশের কাছে। চারদিকে একবার ভাল করে দেখে নিলাম কেউ আমাকে দেখছে কিনা। কেউ দেখছে না। লাশটা উপুড় করলাম।

একটা আর্তচিৎকার অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। লাশটা অন্য কারও নয়, তারানার।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে উঠতেই পানিতে ভেসে গেল আমার দু'নয়ন। শুধু মনে হতে থাকল আমি খুনি। তারানাকে আমিই খুন করেছি। কিন্তু একবারও মনে আসেনি যার মৃতদেহ আমি নিজে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছি, আর অল্প কিছু আগে যাকে নিজ হাতে কবরে শুইয়ে এলাম, সে কেমন করে আমার গাড়ির সাথে ধাক্কা খাবে!

হঠাৎ মাথায় কারও আলতো ছোঁয়া অনুভূত হতেই ঘুরে তাকালাম পিছনে।

আর সঙ্গে সঙ্গে জমে গেলাম। পিছনে তারানা দাঁড়িয়ে। খুব আস্তে মাথাটা আবার সোজা করলাম। লাশ আর রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই মাটিতে, বরং রাস্তার ধুলো কটাক্ষ করে বলল, 'কেমন মজা।'

আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন আমার সাথেই শুধু এমনটা হচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছিল কোথাও না কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে।

পাঁচ

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তারানার মুখোমুখি হলাম আমি। প্রথমে সেই-ই শুরু করল, 'কেমন আছ, আরেফিন?'

'ভাল নয়, একদম ভাল নয়।'

'কেন?'

'সে তো তুমি জানোই।'

'আমার ওপরে তোমার অনেক রাগ, তাই না আরেফিন?'

'রাগ! কেন রাগ করব! তুমি আমার কে? রাগ, অভিমান, অনুরাগ, মান এগুলো শুধু মাত্র আপনজনদের সাথে করা যায়। তুমি তো আমার সেরকম কেউ না। এখন নেই, আগেও ছিলে না।'

'এই তো তোমার কথায় স্পষ্ট রাগ প্রকাশ পাচ্ছে। অবশ্য তা তুমি করতে পার। তবে বিশ্বাস করো, আমি কিছুই জানতাম না। সত্যি বলছি এত দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটে গেল যে তোমার সাথে যোগাযোগের সুযোগই পাইনি।'

'আমি তো কোনও কৈফিয়ত চাইনি।'

'আমাকে আজ আর তুমি বাধা দিও না। আমাকে সব বলতে দাও। তোমার সব জানা দরকার।'

তারপর আমার জবাবের অপেক্ষা না করে বলে যেতে থাকল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগলাম ওর কথা।

'আমার বাবা ইমরুল হাসান আর রাজীব খান ছিলেন বাল্যবন্ধু। একজন মধ্যবিত্ত, অন্যজন জমিদার, অবস্থানের এই বিশাল ফারাক কখনোই তাদের বন্ধুত্বে আঁচ ফেলতে পারেনি। একে অন্যের বাড়িতে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ থাকলেও, ব্যবসার কারণে তা খুব একটা হত না, তবে যোগাযোগ ঠিকই ছিল। অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব থাকলে প্রায়ই যা হয় আমার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। অর্থাৎ আমার জন্মের সাথে সাথেই খান চাচার ছেলে সাজিদের সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ছিল আমার কাছে অজানা। বাবার খবর পেয়ে যখন আমি গ্রামে পৌঁছালাম তখন বিয়ের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেছিল। আমি দম ফেলারও সুযোগ পাইনি। বিয়ে হয়ে গেল আমার। কী করব? কেমন করে করব? কেন এমন হলো, ভেবে খুব কেঁদেছি। অবশেষে ভাগ্যের ওপর নিজেকে সঁপে দিলাম। কিন্তু প্রথম ধাক্কা খেলাম বাসর ঘরে, ওকে দেখেই চমকে

গেলাম আমি, এ যে একজন প্রতারক, একজন খুনি।'

আমি এবার ধাক্কা খেলাম। মুখ দিয়ে আর্তনাদের মত বেরোল, 'খুনি?'

তারানা মাথা ঝাঁকিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুনি। আমার বান্ধবীর খুনি। আমার বিয়ের মাস খানেক আগের ঘটনা, এক সকালে খবর পেলাম আমার বান্ধবী মনীষা মারা গেছে। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল আমার খবর শুনে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন ছিল ও। আমাদের মধ্যে কোনও কথাই গোপন থাকত না। তাই আমি জানতাম সিজার নামে একজনকে সে ভালবাসত। ছেলেটার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে সে। তবে শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। তবে মনীষার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সাজিদ আর ওকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় গাড়িতে দেখেছিলাম। তবে পরীক্ষার কারণে ওর সাথে আমার দেখা হয়নি। ভেবেছিলাম একটা সারপ্রাইজ দেব, কিন্তু বোকাটা তার আগেই দুর্ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলল। তা যাক, মনীষার পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেল অত্যধিক পরিমাণে ঘুমের বড়ি সেবনের কারণে ওর মৃত্যু হয়েছে, আর মৃত্যুর সময় সে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে আমার কোনও অসুবিধাই হলো না। বুঝলাম মনীষার আত্মহত্যার কারণ।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি প্রতিবাদ করোনি কেন?'

তারানা আবার বলতে শুরু করল, 'আমি জানলাম তো ঠিক, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। কারণ আমার হাতে কোনও প্রমাণ ছিল না। আর সাক্ষীর অভাবে এটা আত্মহত্যা বলে ফাইল বন্ধ করে দিল পুলিশ। আমি আর কী-ই বা করতে পারতাম। বুকের মাঝে কবর দিলাম সব। ভুলতে চাইলাম সব।'

আমি বললাম, 'এরপর?'

তারানা আবার শুরু করল, 'অনেক ঘটনা আছে যা চাইলেই ভোলা যায় না। এটা সেরকমই ঘটনা। বিশেষ করে সাজিদকে যখন দেখতাম তখনই মনীষার নিষ্পাপ মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত আর একটা অপরাধবোধ এসে ভিড় করত আমার মনে। তবুও মুখ বুজে সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা আমি সয়ে স্বামীর ঘরেই আমার বাকি জীবনটা কাটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে স্বপ্ন আমার স্বপ্নই রয়ে গেল।'

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'এমন কী হলো যে স্বপ্নটা পূরণ করা হলো না তোমার?'

একটা জলের ধারা নেমে এল তারানার দুচোখ বেয়ে। কিছুক্ষণ থেমে থাকল সে, তারপর শুরু করল, 'ও প্রায় প্রতিদিনই বেশ রাত করে বাসায় ফিরত। প্রথম প্রথম না খেয়ে বসে থাকলেও পরবর্তীতে খেয়ে নিতাম সময় মত। এমনই একরাতে খেয়ে শুয়েছিলাম আমি। ঘড়ির কাঁটা তখন মাঝরাতের ঘর পার করে গেছে। এমন সময় ঘরে এল সে। ওর সাথে বিয়ের পর শান্তিতে ঘুমিয়েছি এমন দিনের সংখ্যা হাতে গুনেই বলতে পারব আমি। বিছানার ওপর উঠে বসলাম। খুব শান্ত পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল সে, তারপর আমার পাশে বসে দু'হাত কোলে নিয়ে বলল, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? প্রথমটায় একটু হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম এই হঠাৎ ভালবাসা দেখে। তারপর সামলে নিয়ে বললাম, কী

ধরনের সাহায্য? এর উত্তরে ও যা বলল তাতে আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। ও বলল—রাতেই তার সাথে এক জায়গায় যেতে হবে, শুধু যেতেই হবে না, কোনও এক অফিসারের সাথে রাত্রিযাপনও করতে হবে।'

আমি তারানার দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারলাম না, মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলাম। মানুষ এত ঘৃণ্য, এত নীচ হয় কী করে।

ওদিকে তারানা বলেই চলল, 'আমার মাথার ভেতর যেন হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। আমি প্রতিবাদ করলাম। সাজিদ অনেক চেষ্টা করল তার ক্যারিয়ার, তার ব্যবসা এই সব বোঝাতে, কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হইনি। আর সহ্য করতে না পেরে একসময় মনীষার কথা মুখ ফসকে বলে বসলাম, আরও জানালাম আমার সাথে জোর খাটালে পুলিশকে সব বলে দেব। ভেবেছিলাম এতে হয়তো কাজ হবে, আমাকে আর বলবে না তার প্রস্তাব মানার কথা। কাজ হলো বটে, তবে উল্টো। ওর ধারণা হলো, ওর অপকর্মের কথা সত্যি সত্যি পুলিশকে জানিয়ে দেব আমি। তাই সে রেগে জোরে ধাক্কা দিল আমাকে। ওয়ার্ডরোবের উপর আছড়ে পড়লাম আমি। আর সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারালাম।'

আমি মুখে কিছুই বললাম না। শুধু ইশারায় কথা চালিয়ে যেতে বললাম।

তারানা আমার দিকে সরাসরি তাকাল, তারপর বলতে শুরু করল, 'আমার অজ্ঞান দেহটাকে বয়ে নিয়ে ওর গাড়িতে বসাল সাজিদ। তারপর নিজে ড্রাইভ করে গাড়িটাকে এক খাদের সামনে দাঁড় করাল সে। এরপর সময় নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় গাড়িটাকে খাদের মধ্যে ফেলে দিল।'

নীরবে তারানার মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম আমি। ওর চোখ বেয়ে জলের ধারা অবিরাম ছুটে চলল। আমিও আর জলটাকে ধরে রাখতে পারলাম না। সত্যি বলতে কী, বিশ্বাসই হচ্ছিল না সাজিদের মত মানুষের সুন্দর চেহারার আড়ালে এতটা কুৎসিত চেহারা লুকিয়ে থাকতে পারে। অবশেষে আমিই বললাম, 'তুমি কি আমার কাছে কোন রকম সাহায্য চাও?'

তারানা নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, আরেফিন। আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই। তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।'

'আমি তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আমি প্রতিশোধ চাই, আরেফিন। রক্তের বদলে রক্ত, খুনের বদলে খুন।'

আমি আঁতকে উঠলাম। দৃঢ় গলায় বললাম, 'আমি আইনের লোক। আইন প্রতিষ্ঠা করা আমার কাজ, আইন ভাঙা নয়।'

আমার কথা শুনে তাড়াতাড়ি বলল ও, 'না, আরেফিন। তোমাকে আইন ভাঙতে হবে না, কিংবা খুনও করতে হবে না। যা করার আমিই করব। শুধু তোমাকে যা করতে বলব তা-ই করবে।'

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই দেখলাম তারানা আর আমার সামনে নেই। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কিছুই করার নেই। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর পা বাড়ালাম গাড়ির দিকে।

ছয়

কদিন ধরে শরীর খারাপ থাকার পর আজ একটু ভাল লাগছে। সত্যি বলতে কী, শরীর নয়, মনটা খুব খারাপ লাগছে এই ক'দিন। তাই সম্পূর্ণ বেড রেস্ট নিয়ে নিলাম।

বিছানার উপর উঠে বসলাম আমি। পাশে পড়ে থাকা জার্নালটা টেনে নিলাম কোলের উপর। এই কদিন তারানার ব্যাপারে অনেক ভেবেছি। কিন্তু কোনও পথই বের করতে পারছি না যাতে করে ওর খুনিকে শাস্তি দিতে পারি।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে জার্নালের কয়েক পাতা উড়িয়ে দিয়ে গেল। জানালার দিকে ঘুরে তাকালাম। দেখলাম তারানা। সেখানে দাঁড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে একটা মলিন হাসি খেলে গেল ওর চোখে-মুখে। তবে সবই ক্ষণিকের জন্য।

ওর সামনে আমি একটা কথাও বলতে পারলাম না। কীভাবে বলব ওকে, কোনও সাহায্যই তো আমি ওকে করতে পারছি না।

আমাকে চুপ থাকতে দেখে আবার একবার হাসি খেলে গেল ওর চোখে-মুখে। তারপর বলল, 'নিজেকে অপরাধী ভাবছ কেন? আমাকে সাহায্য করতে পারছ না তাতে কী হয়েছে। শোনো, তুমি সাজিদকে ফোন করো আর মনীষার ব্যাপারটা ওকে বলো, দেখবে তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, আমার লাশ যেখান থেকে পেয়েছিলে ওকে সেখানেই আসতে বলবে। অন্য কোথাও নয়।'

নিমেষেই বুঝে নিলাম আমি তারানার ইঙ্গিত। কিন্তু হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে সামনে তাকিয়ে দেখি তারানা আর নেই। চলে গেছে।

মনে মনে কথাগুলো সাজিয়ে নিলাম। তারপর নিজের মনে সেগুলোকে উল্টেপাল্টে দেখলাম। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে মোবাইল ফোনটা তুলে নিলাম। অপর পাশ থেকে ভেসে এল সাজিদের কণ্ঠস্বর।

'হ্যালো, আমি সাজিদ খান বলছি, আপনি কে?'

'আমি ইন্সপেক্টর রিফাত আরেফিন বলছি।'

'জী, বলুন। কী উপকারে আসতে পারি আমি আপনার।'

আমি কোনও ভণিতা না করে বললাম, 'তারানা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়নি। ওকে খুন করা হয়েছে।'

একবার যেন একটু ধাক্কা খেল সাজিদ। কিছুটা অবিশ্বাস, কিছুটা ভয় নিয়ে বলল, 'আপনাকে এ কথা কে বলল? হত্যাকারী তা হলে কে?'

আমি শান্ত কণ্ঠেই বললাম, 'আপনি।'

একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল সাজিদের গলা থেকে। চিৎকার করে বলল, 'তা

হলে ধরছেন না কেন? ফাজলামি করার জায়গা পান না! আপনি যা বললেন তার কোনও প্রমাণ আছে? মিছিমিছি একজনের নামে দোষ দিতে আপনার লজ্জা করছে না? আমি আপনার নামে মানহানির মামলা করব।'

সাজিদের কথা শেষ হতেই আমি বললাম, 'আমি শুধু তারানার খুনের ব্যাপারেই নয়, বরং মনীষা সম্পর্কেও সব কিছু জানি।'

একটু যেন দমে গেল সাজিদ খান। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আপনি কী চান আমার কাছে?'

মনে মনে খুব আনন্দ পেলাম আমি। প্ল্যান মতই সব হচ্ছে। তাই কটাক্ষ করে বললাম, 'এই তো বুদ্ধি খুলতে শুরু করেছে। আমি দশ লক্ষ টাকা চাই, আর শুধু মাত্র তা পেলেই আমি সব প্রমাণ আপনাকে দিয়ে সব কথা ভুলে যাব।'

সাজিদ খান কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না। তারপর বলল, 'কখন, কোথায় আপনার সাথে আমার দেখা হবে?'

আমি তাকে ঠিক পাঁচটায় তারানার বলা জায়গায় আসতে বলে লাইন কেটে দিলাম।

সাত

পাঁচটা বাজতে এখনও পনেরো মিনিট বাকি, কিন্তু এতই টেনশন লাগছিল যে বাসায় থাকতে পারিনি, চলে এসেছি। যদিও এটা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। মাথার ভিতর হাজারো প্রশ্ন ঘুর-পাক খাচ্ছে। এখানেই কেন তারানা সাজিদকে আনতে বলল? তারানা কীভাবে প্রতিশোধ নেবে? কী প্রতিশোধ নেবে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

হঠাৎ গাড়ির শব্দে আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। ঘুরে তাকালাম শব্দের উৎস লক্ষ্য করে, একটা নীল রঙের মার্সিডিজ এসে দাঁড়াল আমার থেকে একটু দূরে। কিছুক্ষণ পর তা থেকে নেমে এল সাজিদ খান। হাতে কালো রঙের ব্রিফকেস। পরনে সাদা সুট আর নীল টাই। কেতাদুরস্ত সাজ। তবে দারুণ মানিয়েছে।

ঘড়ি পিক পিক শব্দে জানিয়ে দিল পাঁচটা বাজে। বুঝলাম সময় সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন সাজিদ, অথবা জীবনের ব্যাপারে। তবে যাই-ই হোক না কেন, সময়নিষ্ঠ মানুষ আমি পছন্দ করি।

কোন কথা না বলে সরাসরি আমার সামনে এসে দাঁড়াল সাজিদ। হাতে ধরা ব্রিফকেসটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

আমিও কোনও কথা না বলে সেটা নিয়ে একটা খাম ধরিয়ে দিলাম ওকে।

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে। একটা ভারী কিছু এসে আঘাত করল আমার হাতে। আর প্রায় সাথে সাথেই ব্রিফকেসটা দূরে গিয়ে পড়ল। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ওর দিকে তাকাতেই দেখলাম ওর হাতে শোভা পাচ্ছে পিস্তল। বুলেটটা ব্রিফকেসের হাতলে আঘাত করায় আমার কোনও ক্ষতি হয়নি।

আমি এখানে এসেছি একজন সাধারণ নাগরিকের বেশে, তাই পিস্তলটা বাসায়ই রয়ে গেছে। ওকে কবর থেকে উঠে আসা পিশাচের মত লাগছিল। চোখ দুটো এমন ভাবে জ্বলছিল যেন সেই আগুনেই আমাকে পুড়িয়ে মারবে।

কোনও কথা না বলে এবার আমার বুক বরাবর পিস্তলের নিশানা করল সে। সত্যি সত্যি এবার ভয় পেয়ে গেলাম আমি। হয়তো ভয়ে মুখটা আমার বিকৃত হয়ে গেছিল, এতে ওর হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। আমি চোখ বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলাম। সাজিদ ফায়ার করল।

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কোনও কিছু ঘটার জন্য, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরও যখন কিছু হলো না তখন আবার চোখ মেললাম আর যা দেখলাম তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। বুলেটটা আমার বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে, যেন কোনও বিশেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছে।

ওদিকে সাজিদের চোখেও স্পষ্ট অবিশ্বাস। সে আরও একবার ফায়ার করল, তারপর পর পর তিনবার।

সবগুলো গুলির অবস্থা আগেরটার মত হলো। সবগুলো আমার বুকের কাছে এসে থেমে গেল। আমি তো হতবাক। কীভাবে কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ আমার সামনে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হলো এবং তা ধীরে ধীরে মানুষের অবয়ব নিতে লাগল। আমি সরে এলাম সেখান থেকে। ধীরে ধীরে অবয়বটা তারানাতে পরিণত হলো। এবার আমি সব বুঝতে পারলাম। আসলে তারানাই আমাকে বাঁচিয়েছে।

ওদিকে সাজিদের অবস্থা দেখার মত। জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত কুকুরের মত জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে সে। হাত থেকে পিস্তল খসে পড়েছে। হঠাৎ তারানার পায়ের কাছে বসে নিজের জীবন ভিক্ষা চাইতে লাগল।

এই তারানা আর সেই আগের তারানা এক নয়, সে আজ যেন একটা অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। প্রতিশোধের আগুন তার সমস্ত সত্তাকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলেছে। সে একটুও ছাড় দিতে নারাজ। তার একটাই কথা, 'রক্তের বদলে রক্ত, খুনের বদলে খুন।'

আমি দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। হঠাৎ তারানার মনে যেন একটু দয়ার সঞ্চার হলো। সে জোর কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি তোমাকে একটা সুযোগ দেব। এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনব আমি, এরমধ্যে তুমি যদি এখান থেকে চলে যেতে পার তবে তুমি বেঁচে গেলে। এক...দুই...তিন...'

সাজিদ দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে বসল, তারপর ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে পিছন দিকে যেতে থাকল।

আসল ঘটনা ঘটল ঠিক তখনই। গাড়ি পিছন দিকে কিছুদূর গেল, তারপর সোজা সামনের দিকে এগিয়ে আছড়ে পড়ল খাদের মধ্যে।

বুঝলাম তারানা সাজিদকে নিজের মত করে খুন করে প্রতিশোধ নিল।

এবার আমার মুখোমুখি হলো তারানা। একটা তৃপ্তির সোনালি আভা তার চোখে মুখে ছড়িয়ে আছে, সাথে কিছুটা দুঃখী দুঃখী ভাবও আছে। একরাশ দুঃখ

মেশানো কণ্ঠে সে বলল, 'তোমাকে আমি ঠকাতে চাইনি, আরেফিন। প্রতারণাও করতে চাইনি। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আর, হ্যাঁ, নতুন করে, জীবনটাকে সাজাও। আমাকে কথা দাও তুমি, আমার অনুরোধ রাখবে। সংসার করবে।'

আমাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল সে। এদিক ওদিক অনেক খুঁজলাম আমি ওকে। কিন্তু কোথাও পেলাম না। একটা ধোঁয়ার পিণ্ড এক বার আমাকে প্রদক্ষিণ করে আকাশের দিকে চলে গেল।

আমি এক অন্যরকম ভাললাগা নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

অমিত কুমার চক্রবর্তী

এক অভিনেতার মৃত্যু

তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন, আর শুনছেন গ্রাম থেকে ভেসে আসা প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ। দিনের পুরোটা সময়ই গ্রামে গোলাগুলি হলো। বিকালের দিকে একটু কমতে লাগল। সন্ধ্যার পর গ্রাম থেকে বন্দুক আর কামানের গুলির আওয়াজ শোনা গেল না। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এখানকার যুদ্ধ আপাতত শেষ হয়েছে। মার্কিন সৈন্যরা নদী পার হয়ে চলে গেছে। অবশেষে ওরা বিদায় নিয়েছে। জায়গাটা আবার আগের মত নিরাপদ হয়েছে, ভাবলেন তিনি।

গ্রাম থেকে উপরে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গটা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এই দুর্গের ভেতরের এক গোপন কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন কাউন্ট বারসাক।

লম্বা এবং চিকন তাঁর শরীর। তবে কেমন জানি একটু বেশি চিকন—অনেকটা মরা মানুষের মত। তাঁর মুখমণ্ডল এবং হাত-পা মোমের মত বিবর্ণ। তাঁর চুল কালো। তবে চোখ আরও বেশি কালো। পরনে যে আলখাল্লাটা রয়েছে, সেটার রঙও কালো। যখন তিনি হাসেন, তখন তাঁর ঠোঁটজোড়া হয়ে ওঠে রক্তলাল।

এখন, এই গোধূলিবেলায় তিনি হাসছেন। কারণ এখন খেলার সময় এসেছে।

খেলাটার নাম হচ্ছে মৃত্যু। তিনি অতীতে বেশ ক'বার এ খেলা খেলেছেন।

প্যারিসের গ্রাণ্ড গুইর্গনল মঞ্চে তিনি মৃত্যু নামক খেলাটা খেলেছেন খুব দক্ষতার সাথে। তখন তাঁর নাম ছিল শুধু এরিক কেরন। অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক সব চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি তখন বিখ্যাত হয়ে গেছেন। তারপর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং সেই সাথে এল নতুন সুযোগ।

জার্মানরা প্যারিস দখল করার অনেক আগে থেকেই তিনি তাদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। তাদের হয়ে কাজও করেছেন অনেক। অভিনেতা হিসাবে তাঁর দামটা ছিল আলাদা।

এখন এসেছে জীবনের সেই বিরল সুযোগ। এতদিন তিনি মঞ্চে অভিনয় করেছেন। এবার তিনি অভিনয় করবেন বাস্তব জীবনে। এখন তিনি খেলাটা খেলবেন অন্ধকারে, যেখানে স্পটলাইটের কোনও আলো থাকবে না। একজন অভিনেতার কাছে এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর কিছুই হতে পারে না। এমনকী গল্পের প্লট তৈরির ক্ষেত্রেও তিনি সাহায্য করবেন। অথবা তিনি নিজেই সাজাবেন কাহিনি।

'ব্যাপারটা খুব সহজ,' জার্মান অফিসারকে বললেন তিনি। 'বিপ্লবের পর থেকে দুর্গটা খালি পড়ে আছে। গ্রাম থেকে কেউ এখানে আসতে সাহস করে না। রাতের বেলায় নয়। এমনকী দিনের বেলায়ও না। কারণ একটা কিংবদন্তীতে তারা

বিশ্বাস করে। শেষ কাউন্ট বারসাক নাকি ভ্যাম্পায়ার ছিলেন।'

তাঁর কথা মতই সব আয়োজন সম্পন্ন হলো। দুর্গের এক গোপন কামরায় বসানো হলো একটা শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার। পালাক্রমে তিনজন দক্ষ অপারেটর এটা চালাবে। এবং তিনি, এখন কাউন্ট বারসাকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, চালাবেন পুরো অপারেশন। অনেকটা স্বর্গদূতের মত। অথবা মৃত্যুদূত।

'নীচে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে আছে একটা কবরস্থান,' তিনি জার্মান অফিসারদের জানালেন তথ্যটা। 'এর আশপাশে বাস করে নিরীহ এবং সহজ-সরল মানুষগুলো। কবরস্থানে, মাটির নীচে একটা গোপন সমাধিকক্ষ আছে, যেখানে কাউন্ট বারসাক ও তাঁর পূর্বপুরুষদের কফিন রাখা আছে। আমরা এই গোপন সমাধিকক্ষে প্রবেশ করব। তারপর শেষ কাউন্ট বারসাকের কফিনে যা আছে সেটা খালি করব। এর ফলে গ্রামবাসী বুঝবে, কাউন্ট বারসাক আসলেই একজন ভ্যাম্পায়ার। যেহেতু তাঁর কফিন শূন্য, তাই তিনি এখন ভ্যাম্পায়ার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'কেউ যদি সন্দেহ করে?' প্রশ্ন করল এক জার্মান অফিসার। 'কেউ যদি তোমার কল্পকাহিনিতে বিশ্বাস না করে?'

এই প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে তৈরি করাই ছিল তাঁর কাছে। তিনি বললেন, 'তারা বিশ্বাস করবে। কারণ আমি কাউন্ট বারসাক সেজে রাতের বেলায়...'

কালো আলখাল্লা পরে আর মেকআপ দিয়ে যখন তিনি তাদের সামনে দাঁড়ালেন, তখন তারা তাঁর কথায় বিশ্বাস করল। তাঁকে আর কোনও প্রশ্ন করা হলো না। হ্যাঁ, কাউন্ট বারসাকের ভূমিকায় তাঁকে বেশ মানিয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জার্মান অফিসাররা।

হ্যাঁ, কাউন্টের ভূমিকায় আমাকেই অভিনয় করতে হবে, আর অভিনয়টা হবে একেবারে নিখুঁত, সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে কথাগুলো ভাবলেন তিনি। সিঁড়িটা উঠে গেছে দুর্গের বড় একটা কক্ষের দিকে। কক্ষের ছাদ বলে এখন কিছু নেই। মাকড়সার ঘন জাল চাঁদের উজ্জ্বল আলো ঠেকিয়ে দিয়েছে।

রঙ্গমঞ্চের পর্দাটা এখন নামানো উচিত। আমেরিকানরা যদি গ্রামটা পার হয়ে চলে গিয়ে থাকে, তা হলে এখন দুর্গ থেকে বের হওয়া যায়। কাজটা যাতে সহজ হয় তার ব্যবস্থাও আগে করা হয়েছে।

আমেরিকানরা চলে যাওয়ার মুহূর্তের সময়টাকে কাজে লাগানো হয়েছে। এয়ার মার্শাল গোয়েরিং-এর সংগ্রহ করা শিল্পকর্মগুলোর দাম এখন কল্পনাতীত। এই সম্পদ লুকিয়ে রাখা হয়েছে কবরস্থানের ভূগর্ভস্থ একটা সমাধিকক্ষে। দুর্গের ভেতর অপেক্ষা করছে একটা ট্রাক। তিনজন রেডিও অপারেটর বিশেষভাবে এদিকে নজর রাখছে। ট্রাকটা নিয়ে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে যেতে হবে কবরস্থানের পাশে। তারপর শিল্পকর্মগুলো ট্রাকে তোলা হবে।

তিনি সেখানে পৌঁছানোর আগেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে। প্রতিটি শিল্পকর্ম তোলা হয়ে যাবে ট্রাকে। এরপর তারা আমেরিকানদের কাছ থেকে চুরি করা ইউনিফর্মগুলো পরবে। নিজেদের নতুন পরিচয় তৈরি করার জন্য ভুয়া যা যা দরকার তার সবগুলোর ব্যবস্থা করা আছে। আছে রোড পারমিট। সবার শেষে তারা ট্রাকটা নিয়ে নদীর পাশ দিয়ে চলে যাবে। একটা নির্দিষ্ট স্থানে জার্মান

সৈন্যরা তাদের জন্য অপেক্ষা করবে। তারা সেখানে সবার সাথে মিলিত হবে। সুন্দর পরিকল্পনা। কোনও ফাঁক নেই। ধরা পড়ার সুযোগ নেই। কাউন্ট হাসলেন। ভাবলেন, একদিন তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় এটা খুব ভালভাবে লিখবেন।

তবে সেটা নিয়ে ভাবার সময় এখন নয়। কাজটা তো আগে শেষ করতে হবে। ছাদের ফাঁকফোকরের দিকে তাকালেন তিনি। আকাশে ভরাট চাঁদ। এখনই রওনা দেয়ার সময়।

যেভাবে তাঁকে যেতে হচ্ছে, সেটা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। চারদিকে ধুলো আর মাকড়সার জাল। তবে এর মাঝে তিনি খুঁজে পেয়েছেন একটা মঞ্চ। আর এই মঞ্চেই তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিনয়টা করতে যাচ্ছেন। ভ্যাম্পায়ারের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে তিনি রক্তের প্রতি আসক্ত হননি। তবে একজন অভিনেতা হিসাবে অভিনয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পেরে তিনি আনন্দিত। তাই তিনি রক্ত নয়, বিজয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। এই যেমন, তাঁর সামনে পড়ে আছে আরেকটা বিজয়ের তীব্র সম্ভাবনা।

ভূত-প্রেত, ডাইনীদের নিয়ে শেক্সপিয়ার অনেক লিখেছেন। কারণ তিনি জানতেন, বোকা দর্শকরা এসব অলৌকিক জিনিসে বিশ্বাস করে। এখনও মানুষ এটা বিশ্বাস করে। আসল কথা হচ্ছে নিখুঁত অভিনয়, যেটা করতে পারলে মানুষ সবকিছুতেই বিশ্বাস করবে।

দুর্গের প্রবেশমুখের বাইরে অন্ধকারে ডুবে থাকা অংশে চলে এলেন তিনি। গাছের ডালপালা এখানে ঝুঁকে আছে। এই গাছ থেকে লাফিয়ে নামার সময় তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল রেমণ্ডের।

রেমণ্ড হচ্ছে বারসাক গ্রামের মেয়র। বয়সের ভারে সব চুল সাদা হয়ে গেছে তার। তিনি যখন গাছ থেকে লাফিয়ে নামছিলেন তখন মেয়র গাছগুলোর নীচ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। কাউন্টকে এভাবে নামতে দেখে, অথবা শুধু কাউন্টকে দেখে মেয়েমানুষের মত চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালিয়েছে সে।

এটা কয়েকদিন আগের ঘটনা।

তিনি ভেবেছিলেন এই ঘটনার পর রেমণ্ড তাঁর উপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করবে। কিন্তু ঘটনাটা সে বেমালুম ভুলে গেছে। কারণ এরপর তাকে আর দুর্গের আশপাশে দেখা যায়নি। তিনি যে ভ্যাম্পায়ার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই গুজবটা রেমণ্ড বেশ ভালমতই ছড়িয়েছে। এ জন্য তিনি তাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন। শুধু তাই নয়, মেয়র তাঁর লোকজন নিয়ে কবরস্থানে হানা দিয়েছিল। সমাধিকক্ষে গিয়ে কাউন্ট বারসাকের কফিন পরীক্ষা করেছিল। তারা দেখেছিল বারসাকের কফিন ফাঁকা! এরপর কাউন্টের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। যেমনটা তিনি চেয়েছিলেন।

কফিনে ছিল শুধু ধুলো। বাতাসে উড়ে গেছে এসব। এতদিন পর কফিনে কিছু থাকে নাকি? যতসব বোকার দল! ভাবলেন তিনি। তা ছাড়া সুজানের কী হয়েছিল, এটাও তারা জানে না। বেচারি কাউন্টের শিকারে পরিণত হয়েছে, এটাই ওরা ভেবে বসে আছে। তাদের আর দোষ দিয়ে লাভ কী!

একদিন সন্ধ্যার পর তিনি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা ঝর্নার পাশ দিয়ে

যাচ্ছিলেন। কপালগুণে তাঁর সাথে দেখা হয়ে যায় সুজানের। প্রেমিকের সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছিল সে। আলখাল্লা পরা কাউন্টের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে দু'জনই ভয়ে জমে গিয়েছিল। তাঁকে দেখে সুজানের প্রেমিক হরিণের মত দ্রুতগতিতে পালাল। সুজান তখন কাউন্টের সামনে একা। মেয়েটার লাশটাকে মাটিতে চাপা দিতে হয়েছিল। এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। তাঁর অস্তিত্বের সত্যতার জন্য কাজটা করতে হয়েছিল।

কথায় বলে, সব ভাল যার শেষ ভাল। এ পর্যন্ত সব ভালমতই হয়েছে। শেষটাও ভাল হবে, ভাবলেন কাউন্ট। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বোকা রেমণ্ড ছড়িয়ে দিয়েছে যে, কাউন্ট ভ্যাম্পায়ার হয়ে গেছেন। সে নিজের চোখে দেখেছে। কফিন শূন্য, এটাও তারা নিজেদের চোখে দেখেছে। তা ছাড়া, তার নিজের মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ে কেউ দুর্গ এবং কবরস্থানের আশপাশে যায় না। সবকিছুই তো তাঁর পক্ষে। হাসলেন কাউন্ট বারসাক।

গাছ থেকে লাফ দিয়ে নামলেন তিনি। বাতাসে তাঁর পরনের আলখাল্লা উড়ছে পতপত করে। পথের উপর তাঁর কালো ছায়া পড়েছে অদ্ভুতভাবে—অনেকটা বাদুড়ের মত। এখান থেকে তিনি কবরস্থান দেখতে পাচ্ছেন। চাঁদের আলোয় দেখতে পেলেন কবরের স্মৃতিস্তম্ভগুলো বুড়ো আঙুলের মত খাড়া হয়ে মাটির ভেতর থেকে যেন উঠে এসেছে। হঠাৎ করে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ তাঁর মনে হলো, মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়ার মাঝে লুকিয়ে আছে সেরা অভিনেতার মহান অভিনয়ের মহত্ত্ব। কিন্তু তাঁর চারপাশে কেবল মরণের গন্ধ। চারপাশে কেবল অন্ধকার। রক্তের দৃশ্য তাঁকে আনন্দ দেয় না। তা ছাড়া বদ্ধ সমাধিকক্ষে গেলে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসে।

তারপরও কাউন্টের চরিত্রে অভিনয় করা একটা বিশাল সাফল্য। তবে খুশির কথা হচ্ছে, নাটক শেষ হতে চলেছে। এরপর মানুষ হিসাবে অভিনয় করতে পারলেই তিনি খুশি হবেন। সেই সাথে আরেকটা কাজ তাঁকে শেষ করতে হবে, কাউন্টকে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে অন্ধকারের গভীর কূপে, যেখান থেকে তিনি তাঁকে তুলে এনেছেন।

সমাধিকক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দেখলেন ওটার দরজা খোলা। ভেতর থেকে কোনও শব্দ আসছে না। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ট্রাক। তার মানে, তিনি আসার আগেই ওরা কাজটা শেষ করে ফেলেছে। এখন শুধু এখান থেকে পালাতে পারলেই কাজ শেষ।

তাই শরীরের কাপড়-চোপড় খুলে ফেলতে হবে। সেই সাথে মুছে ফেলতে হবে সব মেকআপ।

এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসংখ্য লণ্ঠনের আলোতে তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গেল প্রায়। তাঁর কানে প্রবেশ করল একটা দৃঢ় কণ্ঠস্বর। 'একটুও নড়বে না!'

তিনি নড়লেন না। চোখের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন, ওরা তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। অনেকের চেহারা তাঁর কাছে বেশ পরিচিত। রেমণ্ড, ক্লডেজ আর সাথে আছে গ্রামের কয়েক ডজন লোক। সবার হাতে অস্ত্র। তবে তাদের সবার চেহারায়

তীব্র আতঙ্ক।

ওদের এত সাহস হলো কীভাবে?

ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে এল একজন আমেরিকান করপোরাল। সেই সাথে আরেকজন ইউনিফর্ম পরা সৈন্য। তাদের হাতে স্নাইপার রাইফেল। এখন তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন কেন সবাই ভয় ঠেলে তাঁকে ধরতে এসেছে। তিনজন জার্মান অপারেটরের কপালে কী ঘটেছে, সেটাও বুঝতে পারলেন। ট্রাকে কোনও শিল্পকর্ম নয়, ওখানে রয়েছে ওদের তিনজনের লাশ।

মার্কিন সৈন্যরা তাঁকে প্রশ্ন করছে। তাঁর শরীরে তীরের ফলার মত আঘাত করছে। 'তুমি কে? তিনজন জার্মান সৈন্য কি তোমার আদেশে কাজ করছিল? এই ট্রাক নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?'

তিনি হাসলেন আর মাথা নাড়লেন। কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করা বন্ধ হলো। বন্ধ যে হবে, এটাও তিনি ভালমত জানতেন।

করপোরাল তার সাথীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাওয়া যাক।' তার সাথী মাথা নেড়ে ট্রাকে গিয়ে উঠল। করপোরাল রেমণ্ডের কাছে এসে বলল, 'ট্রাকটা নিয়ে আমরা নদীর দিকে যাচ্ছি। আমাদের বন্ধুরা আশপাশেই আছে। তাদের জন্য এখানেই অপেক্ষা করুন। একঘণ্টার ভেতর তারা চলে আসবে। তখন যা করার তারাই করবে।' করপোরাল আর কথা না বলে ট্রাকে গিয়ে উঠল। চলতে শুরু করল ট্রাক। কিছুক্ষণ পর সেটা অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

তারা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। কারণ চাঁদ মেঘের আড়ালে চলে গেছে। কাউন্টের মুখ থেকে হাসি বিদায় নিল। কারণ তাঁর চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা কোনও যুক্তি মানে না। বিশ্বাস করে কিংবদন্তীতে। মূর্খ ওরা। মাথাভর্তি শুধু কুসংস্কার। কিন্তু সবার হাতে নানারকম অস্ত্র। এদের হাত থেকে বাঁচার সামান্য সম্ভাবনাও তিনি দেখতে পেলেন না।

'ওকে সমাধিকক্ষে নিয়ে চলো,' বলল রেমণ্ড। সে-ই বোধহয় দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে।

লাঠির তীক্ষ্ণ মাথা দিয়ে তাঁকে খোঁচা মারল ওরা। তাঁকে ঠেলে দিতে চাইছে সমাধিকক্ষের দিকে। তাঁর খুব কাছাকাছি কেউ নেই। এই সময় কাউন্ট বাঁচার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখতে পেল। তারা তাঁর কাছে আসছে না, কারণ এখনও তাঁকে সবাই ভয় পাচ্ছে। তাদের দিকে তিনি তীক্ষ্ণচোখে তাকালেন। তারা চোখ নামিয়ে ফেলল।

আমেরিকানরা চলে গেছে, তাই আতঙ্ক তাদের আবার গ্রাস করেছে। তাঁর অস্তিত্ব আর শক্তি তাদের ভীত করে তুলেছে। কারণ তাদের চোখে তিনি একটা ভ্যাম্পায়ার। তিনি যে কোনও মুহূর্তে বাদুড়ে পরিণত হয়ে পালাতে পারেন। ফলে তিনি যাতে পালাতে না পারেন, এ জন্য তাঁকে সমাধিকক্ষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সমাধিকক্ষের দরজার সামনে এসে তিনি হিংস্রভাবে তাকালেন। ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে বের করলেন তীক্ষ্ণ দাঁত দুটো। ভয়ে ওরা তাঁর কাছ থেকে সরে গেল কিছুটা দূরে। সমাধিকক্ষের ভেতরে চলে এলেন তিনি। তারাও এল তাঁর সাথে।

এবারও তিনি নানারকম ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্গি করে তাদের ভয় দেখালেন। তারা গোঙানির শব্দ করে দূরে সরে গেল। অভিনয় জীবনের সব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি ওদের ভয় দেখালেন।

সমাধিকক্ষের ভেতরে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কাউন্ট। তিনি এখন আর মঞ্চে নেই। চলে এসেছেন বাস্তব জগতে। দুঃখ একটাই, পরিকল্পনা মত তিনি মঞ্চ থেকে নামতে পারেননি। এটাই নিয়ম। কারও স্বপ্ন পূরণ হয়, কারও হয় না। যাই হোক, এখন আমেরিকানরা যত তাড়াতাড়ি আসে ততই তাঁর জন্য ভাল। কারণ তারা তাঁকে তাদের হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবে প্রশ্ন করার জন্য। কয়েক বছরের জন্য জেল হতে পারে তাঁর, এর বেশি কিছু হবে না। তবে এখানে এই মূর্খ লোকগুলোর মাঝে থাকলে যে কোনও ঘটনা ঘটতে পারে। তাঁর গুণের কথা শুনে হয়তো আমেরিকানরা তাঁকে ছেড়েও দিতে পারে।

সমাধিকক্ষের ভেতরে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। সেই সাথে আছে দম বন্ধ করা একটা পরিবেশ। অস্থিরভাবে তিনি পায়চারী করতে লাগলেন। হাঁটুর সাথে বার বার লেগে যাচ্ছে একটা কফিন। তিনি চেয়ে দেখলেন বা অনুভব করলেন, কফিনটা কাউন্ট বারসাকের। এই প্রথমবার জীবনের কাছে তিনি পরাজিত হলেন। এখান থেকে তিনি বের হতে চান। কাউন্টের ভূমিকায় অভিনয় করার সাধ তাঁর মিটে গেছে।

সমাধিকক্ষের বাইরে অদ্ভুত সব শব্দ। দরজার কাছে এসে তিনি কান পাতলেন শোনার জন্য। কিন্তু কিছুই শুনতে পেলেন না।

গর্দভের দল ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছেটা কী! এখন আমেরিকানরা এলেই বাঁচি! ভাবলেন তিনি। এখন গরমও লাগছে বেশি করে। তা ছাড়া, হঠাৎ করে চারদিক এমন নীরব হয়ে গেল কেন?

হয়তো রেমণ্ড তার দলবল নিয়ে চলে গেছে।

হ্যাঁ। এটাই হবে। আমেরিকানরা বলেছিল তাকে পাহারা দিয়ে রাখতে, যাতে তিনি পালাতে না পারেন। কিন্তু তারা ভয় পেয়ে পালিয়েছে। রেমণ্ড হয়তো তাদের বোঝাতে পেরেছে যে, তিনি আসলেই একটা ভ্যাম্পায়ার। তাই তারা পালিয়েছে। তারা পালিয়েছে এবং তিনি এখন মুক্ত। এখন তিনিও পালাতে পারেন।

কাউন্ট দরজাটা খুললেন।

এবং দেখতে পেলেন মূর্খ মানুষগুলোকে। তারা দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে। বুড়ো রেমণ্ড তাঁর দিকে হিংস্রচোখে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। রেমণ্ডের হাতে নতুন কিছু একটা। জিনিসটা চিনতে অসুবিধে হলো না কাউন্টের।

একটা লম্বা কাঠের টুকরো। সামনের অংশ বেশ চোখা।

ব্যাপারটা বুঝে ওঠার সাথে সাথে তিনি চিৎকার দেয়ার জন্য মুখ খুললেন। চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, তিনি আসলে একজন অভিনেতা। এতক্ষণ কাউন্টের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। কিন্তু ভুলে গেছেন, ওরা হচ্ছে মূর্খ। কুসংস্কারে ভরা ওদের মস্তিষ্ক। কোনও যুক্তি মানে না। তাই ওদের বুঝিয়ে কোনও লাভ নেই।

মূর্খ লোকগুলো নিজেদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। ওরা মাথার উপর তুলে

ফেলল কাউন্ট বারসাককে, নিয়ে চলল সমাধিকক্ষের ভেতর কাউন্টের কফিনের কাছে। কফিনের কাছে এলে একজন সেটার ঢাকনা খুলল। কফিনের ভেতর শুইয়ে দেয়া হলো কাউন্টের শরীরটাকে। তাঁর দিকে কাঠের টুকরো হাতে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছে রেমণ্ড। বাকিরা তো আছেই।

কাঠের টুকরোটা নেমে এল তাঁর হৃৎপিণ্ড বরাবর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কাউন্ট বারসাকের ভূমিকায় অভিনয় করা অভিনেতা বুঝতে পারলেন, রঙ্গমঞ্চে তিনি অভিনয়টা একটু বেশি ভাল করে ফেলেছেন।

মূল: রবার্ট ব্লচ

রূপান্তর: সরোয়ার হোসেন

নীল অন্ধকার

শীতের রাত।

জমাট বাঁধা নীল কুয়াশার চাদর কেটে ছুটছে সাদা পাজেরো। আকাশে সপ্তমীর চাঁদ। স্টিয়ারিং হুইল ধরে আপনমনে গজগজ করছেন জেম্‌স্‌ হুইটম্যান। পেশায় তিনি ডাক্তার। শহরের বাইরে একটা 'কল' সেরে ফিরছেন।

রাত তিনটা।

শীত জেঁকে বসেছে ভালভাবেই। গায়ে পুরু কোট-মাফলার থাকা সত্ত্বেও ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছেন তিনি।

নির্জন রাস্তা।

দু'ধারে চেস্টনাট গাছ। ন্যাড়া।

মাঝে মাঝে ফাঁকা অসমতল মাঠ।

আশেপাশে দু'তিনশো গজের মধ্যে জনবসতি নেই।

পাজেরোর হেডলাইটের আলোয় সামনের পথের খানিকটা দেখা যাচ্ছে শুধু।

শীতে কষ্ট পেলেও ডাক্তার মনে মনে বেশ নিশ্চিন্ত। শহর প্রায় এসেই গেছে। আর আধঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গরম লেপের তলায় ঢুকতে পারবেন, এতে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। এখন কোন রকমে সময়টুকু কাটলেই হয়!

'ক্যাঁ-এঁ-চ্‌-চ্‌! কি-ই-চ্‌-চ্‌!'

চমকে উঠলেন ডাক্তার। পাজেরোর ভেতর থেকে ধাতব গোঙানির আওয়াজ হচ্ছে।

হুইটম্যানের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। পাজেরো যদি এখন বিগড়ে যায় তা হলে কী হবে? এখনও প্রায় তিন মাইল পথ বাকি। জোর করে ভাবনাটা তাড়িয়ে দিলেন মন থেকে।

কিন্তু অদৃষ্টদেবী বোধহয় তাঁর উপর খেপেছিলেন!

হঠাৎ করে পাজেরোর আর্তনাদ আরও বেড়ে গেল। গতিও হয়ে এল মন্থর। হুইটম্যান সাধ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে চেষ্টা করলেন গতি স্বাভাবিক করতে।

লাভ হলো না কোন।

ধুঁকতে ধুঁকতে কিছুদূর এগিয়ে রাস্তার মাঝখানে অচল হয়ে গেল গাড়ি।

নড়ার নাম নেই!

চেষ্টার ত্রুটি করলেন না ডাক্তার। কিন্তু গাড়িটা অস্ফুট আর্তনাদ ছাড়া আর কোন সাড়া দিল না।

দারুণ শীতের মধ্যেও তিনি টের পেলেন ঘামে ভিজে উঠেছে সারা শরীর। গাড়ি ফেলে রেখে এই জনমানবহীন পথে পাক্কা তিন মাইল পথ পাড়ি দেয়ার কথা চিন্তা করে গায়ে কাঁটা দিল তার। রাতটা গাড়িতে পার করাও অসম্ভব। ঘুম আসবে না কিছুতেই।

ভয়ে, দুর্ভাবনায় হুইটম্যানের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। মাথায় কোন চিন্তা কাজ করছে না। এই প্রথম নিজের ওপর রাগ হলো সঙ্গে লোক না আনার জন্যে। সঙ্গে লোক থাকলে তা-ও ভরসা পাওয়া যেত।

'ডক্টর!'

লাফ দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে চলে এল ডাক্তারের। '...ক...ক...কে?'

'ডক্টর! ডক্টর!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরে তাকালেন ডাক্তার। একটা লোককে দেখতে পেলেন। লোকটি লম্বা শীর্ণ। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু কালো অবয়ব চোখে পড়ছে।

গাড়ির কাঁচে নাক চেপে ধরল লোকটা। হুইটম্যান বুকে পানি পেলেন যেন। যাক্, একটা লোক পাওয়া গেল। গলায় সবটুকু জোর ঢেলে বললেন, 'কে আপনি?'

'আমাকে আপনি চিনবেন না।'

হুইটম্যান তখন চেনার জন্যে ব্যস্ত নন। তার প্রয়োজন একটু সাহায্যের। সে কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছেন, লোকটা বলে উঠল, 'আপনাকে একটু আসতে হবে, ডক্টর। পেশেন্টের অবস্থা খারাপ।'

হুইটম্যান হতভম্ব হয়ে পড়লেন। লোকটা যেন এ সময় তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

'ঈশ্বরের অসীম দয়া! আপনাকে যে এ সময় এখানে পাব কল্পনাও করিনি। অথচ না পেলে...'

কথা বলতে ভাল লাগছিল না ডাক্তারের। একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, 'কোথায় আপনার পেশেন্ট?'

আগন্তুক নিঃশব্দে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে একটা দিকে দেখাল। গাড়ির ভেতর থেকে উঁকি দিলেন ডাক্তার। দূরে এক জায়গায় আলো দেখা যাচ্ছে। এই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে বাড়ি এল কোত্থেকে?

এরকম নির্জন জায়গায় অপরিচিত একটা লোকের সাথে কোথাও যাওয়া একটু বিপজ্জনক। লোকটার মনে কোন খারাপ অভিসন্ধি নেই, তা কে বলতে পারে। আগন্তুক যেন তার মনের কথা টের পেয়েই বলল, 'আপনাকে যেতেই হবে, ডক্টর।'

এরপর আর না গিয়ে উপায় নেই। দেখা যাক্, কী আছে কপালে। বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন।'

মাঠের ওপর দিয়ে পথ। বোঝা যায় কিছু দিন আগে ফসল তোলা হয়েছে। সারা মাঠ জুড়ে ছড়ানো খড়। অন্ধকারে মসৃণ আল ধরে লোকটার পিছে পিছে এগুলেন ডাক্তার।

মিনিট পাঁচেক পর একটা বাড়ির উঠানে এসে পৌঁছুলেন দু'জন। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে। লোকটা সেদিকে দেখিয়ে বলল, 'ভেতরে যান। আমি একটু আসছি।'

অন্ধকারেও তিনি বুঝতে পারলেন বাড়িটা পাকা। তবে জায়গায় জায়গায়

ক্ষয়ে গেছে। জং ধরা ফাঁকফোকরের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে লতাগুল্ম।

ভেতরে ঢুকলেন তিনি।

ঘরটি আয়তনে বড়। সে তুলনায় ঘরে আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। পুরো ঘরে একটিমাত্র জানালা, দরজার মুখোমুখি জানালার ধারে একটা রকিং চেয়ার, মৃদু দুলছে। তাতে শুয়ে আছে এক বৃদ্ধ। মুখ-মাথা মাফলারে ঢাকা।

ঘরে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। তার আলো তির্যকভাবে এসে পড়েছে বৃদ্ধের মুখে। হাঁ করে সিলিঙের দিকে চেয়ে আছে বৃদ্ধ।

'এসেছেন ডক্টর! বসুন,' ক্ষীণস্বরে বলল বৃদ্ধ।

এদিক-ওদিক চেয়ে দরজার বাঁদিকে একটা বেতের চেয়ার দেখতে পেলেন ডাক্তার। সেটিই টেনে রকিং চেয়ারটার পাশে বসলেন।

ঘাড় সামান্য কাত করল বৃদ্ধ। 'বেশ, এবার আমার রোগের কথা বলি।'

ডাক্তারের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি খেলে গেল। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ডাক্তারী করছেন তিনি। রোগীদের নানা অদ্ভুত বাতিকের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁর। বুঝলেন, এখন নিজের রোগ সম্বন্ধে রোগীর মতামত শুনতে হবে তাঁকে।

কেশে গলার শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে নিল বৃদ্ধ। বলল, 'আমার রোগটা কী সারাতে পারবেন আপনি?'

হেসে ফেললেন ডাক্তার। 'সে চেষ্টা করাই তো আমাদের কাজ।'

'পারবেন তা হলে!' রকিং চেয়ার থেকে শীতল হাসির শব্দ শোনা গেল। 'আচ্ছা ধরুন, যদি আজ রাতে এই মুহূর্তে আমি মারা যাই, কী করবেন আপনি? আপনার ফিস্ দেবে কে?'

এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না হুইটম্যান।

'বলুন, কে দেবে?'

আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে তো! হুইটম্যান টের পেলেন তার মেজাজ গরম হয়ে উঠেছে। বললেন, 'আমরা শুধু ফিসের জন্যেই ডাক্তারী করি না।'

'বাহ্! ভাল কথা বলেছেন তো আপনি,' বৃদ্ধের গলার স্বর মৃদু হয়ে এল। 'তবে আপনার ফিস্ আপনি পেয়ে যাবেন।'

'এবার আমি দেখতে পারি?' হুইটম্যান ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের জন্যে তিনি রীতিমত বিরক্ত।

'দেখুন।'

হুইটম্যান চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। তারপর হাত বাড়ালেন রোগীর ডান হাতটা তুলে নিতে। পাল্স পরীক্ষা করবেন।

ধীরে সুস্থে রোগীর কব্জি স্পর্শ করলেন ডাক্তার। হাতটা তুললেন। কিন্তু একী—

ধড়াস করে লাফ মারল হুইটম্যানের হৃৎপিণ্ড। দেখলেন, তাঁর হাতে ধরা হাতটা কোন মানুষের হাত নয়। এটা একটা কঙ্কালের হাত! তা হলে?

বিকারগ্রস্তের মত বৃদ্ধের মুখ থেকে মাফলার সরিয়ে ফেললেন ডাক্তার। পরমুহূর্তেই একটা জান্তব চিৎকার দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিলেন। বুকের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে দক্ষ ড্রামারের ভয়ঙ্কর কসরত।

বৃদ্ধের চোখের শূন্য কোটর যেন হাঁ করে চেয়ে আছে সিলিঙের দিকে। মাঢ়ী ঠেলে বের হয়ে আসা দাঁতগুলো নীরব অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে।

কঙ্কালের স্পর্শ মুছে ফেলার জন্যে ডাক্তার পাগলের মত হাত দুটো শার্টে ঘষতে থাকেন।

অবর্ণনীয় আতঙ্কে তিনি দেখলেন রকিং চেয়ারের পাশে জানালাটা দড়াম করে খুলে গেল।

সপ্তমীর চাঁদ ঢেকে দিয়েছে মেঘ। তার ছায়া পড়েছে বৃদ্ধের মুখে। হঠাৎ হুইটম্যানের মনে হলো বৃদ্ধের শরীরটা নড়ছে।

দু'হাতে চোখ কচলে ভাল করে তাকালেন তিনি।

হ্যাঁ, নড়ছে। নড়ছে বৃদ্ধের কংকাল।

ভয় পেলেন হুইটম্যান—প্রচণ্ড ভয়।

ঘুরে দাঁড়ালেন দৌড় দেয়ার জন্যে। কিন্তু কপাল খারাপ। তাড়াহুড়োয় চেয়ারে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মেঝের ওপর।

ঘরের ভেতর আলোটা নেচে উঠল বার কয়েক। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন ডাক্তার, নিভু নিভু হয়ে এসেছে লণ্ঠনটা।

ততক্ষণে বুড়োর মড়াটাও উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার ছেড়ে।

পড়িমরি করে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। পালিয়ে বাঁচতে হবে এই ভয়ঙ্কর বধ্যভূমি থেকে।

দৌড় দিতে গিয়েও পারলেন না। পৈশাচিক থাবায় বুড়ো আঁকড়ে ধরল হুইটম্যানের কাঁধ।

'আহ্!' অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেন ডাক্তার। থাবার নখ তার কাঁধের মাংস চিরে ঢুকে গেছে ভেতরে। পিশাচের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে পাগলের মত তড়পাচ্ছেন তিনি।

আচমকা হাতে ঠেকল ডাক্তারী ব্যাগটা। সেটা তুলে ধাঁই করে মেরে বসলেন বুড়োর মুখে। আকস্মিক আঘাতে টলে উঠল বুড়ো। ছেড়ে দিল হুইটম্যানের কাঁধ।

এই সুযোগে তিনি ঝেড়ে দৌড় দিলেন দরজার দিকে। সেই মুহূর্তেই লণ্ঠনটা দপ্ করে নিভে গেল। অমানুষিক আর্তনাদ করে উঠল বুড়োর ভূত।

কীভাবে ছুটতে ছুটতে গাড়িতে এসে উঠলেন জানেন না ডাক্তার। শুধু এটুকু জানেন, তাঁকে নিজের জান বাঁচাতে হবে।

কী আশ্চর্য! যাদুমন্ত্রের বলে যেন গাড়িটা স্টার্ট নিল।

হুইটম্যান হাঁফ ছাড়লেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কখনও রাতের 'কলে' ঘর থেকে বেরুবেন না। জীবন থাকতে নয়।

বাড়ির দিকে গাড়ি ছোটালেন ডাক্তার। পেছনে রেখে এলেন কিছু অভিশপ্ত স্মৃতি।

সপ্তমীর চাঁদটা তখন কালো মেঘের অবগুণ্ঠন খুলে বেরিয়ে এল।

সুব্রত দেওয়ানজী

[বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে]

রহস্যমানব

এক

পি.এল.সি.ই.এইচ.ডি-১ প্রকল্পের উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছি ঢাকাতে। আমরা চট্টগ্রাম বিভাগের ত্রিশ জন ইউ.পি.ও। দিনের বেলা প্রশিক্ষণ চলে নীলক্ষেতে, প্ল্যানিং একাডেমীতে। রাত্রে আড্ডা জমে বসুন্ধরায়। কর্তৃপক্ষ এখানেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। সারাদিনের একঘেয়ে প্রশিক্ষণের চাইতে রাত্রের আড্ডাতেই সকলকে প্রাণবন্ত মনে হয়। লাকসাম থেকে এসেছে আতিক, মজার মজার গল্প বলে সে একাই আড্ডা জমিয়ে রাখে। আজ কিছুতেই আড্ডা জমছে না। সকলেই রুমে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সময় উঠল সব গল্পের সেরা গল্প, ভূতের গল্প। আমরা যারা উঠে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, আবার জাঁকিয়ে বসলাম। গল্পটা শুরু করেছে মেজবাহ্। মেজবাহ্ তার গল্পটা ভাল করে শুরুই করতে পারেনি, এর মধ্যেই কয়েকজন প্রতিবাদ করল, 'ভূত বলে কিছু নেই।' গল্পের চাইতে ভূত আছে কি নেই তাই নিয়ে তর্ক জমে উঠল। কেউ বলছে ভূত আছে, কেউ বলছে নেই। দেখা গেল শেষের দলটাই ভারী। আমি নিজেও ভূত আছে বলে বিশ্বাস করি না, তবুও আমি মেজবাহ্র গল্পটা শুনতে চেয়েছিলাম। আমাদের মাঝে সবচাইতে চুপচাপ হচ্ছে মাসুদ। সাতদিনের প্রশিক্ষণে তাকে খুব কমই কথা বলতে দেখেছি। মাসুদ বলল, 'আমি ভূত দেখেছি।'

যাঁরা এতক্ষণ ভূত বলে কিছু নেই বলে চিৎকার করছিলেন তাঁরা হঠাৎ করে থমকে গেলেন। কিন্তু সেটা স্বল্প সময়ের জন্য। খানিক পর সকলে একসাথে বলে উঠল, 'অসম্ভব।'

মাসুদ বলল, 'আপনাদের কাছে অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু আমি নিজ চোখে, সজ্ঞানে দেখেছি, আপনারা ভূত কিংবা প্রেতাত্মা যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, আমি তা দেখেছি।'

একজন লোক যদি বলে আমি নিজ চোখে দেখেছি তা হলে আর তর্ক চলে না। মাসুদ তার গল্প শুরু করল, মাসুদ যা বলেছে আমি তা কোনরকম পরিবর্তন না করেই তুলে দিলাম।

...আমি তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক বছর মেয়াদী সি.ইন.এড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। সি.ইন.এডের সেশন হচ্ছে দুটি। একটা শুরু হয় জানুয়ারি মাসে, এই সেশনে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে বেসরকারী শিক্ষকরা। সরকারী শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ নেয় জুলাই সেশনে। এই সেশনের প্রশিক্ষণার্থীদের হোস্টেলে থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু কুমিল্লা পি.টি.আই-এর হোস্টেলে পর্যাপ্ত সীট না থাকায় প্রতিবছরই কিছু প্রশিক্ষণার্থীকে বাইরে থাকতে হয়। হোস্টেলে সীট পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, তবুও ভাবলাম

একবার খোঁজ নিয়ে দেখা যাক।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, একটা রুম একেবারেই খালি। আমার মত পরে ভর্তি হয়েছে এরকম তিনজনকে নিয়ে পরদিনই উঠে গেলাম হোস্টেলে। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আমরা যে রুমটিতে উঠেছি অর্থাৎ ২০৮ নাম্বার রুমটিই হোস্টেলের সবচাইতে ভাল রুম। সাবেকী আমলের হোস্টেল ভবনের সবর্ত্রই রয়েছে জরাজীর্ণতার ছাপ, কোথাও প্লাস্টার খসে গেছে, কোথাও দরজা জানালা ভাঙা। এসবের মাঝে পরে এসেও ২০৮ নাম্বার রুমের মত তুলনামূলক ভাল একটি রুম পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান মনে হলো। আমাদের মাঝে অরুণ ছিল পরিশ্রমী, দুদিনেই রুমটিকে ঝকঝকে করে তুলল। দুদিন পর রুম পরিষ্কার করে যখন থিতু হয়ে বসলাম তখন জানা গেল রুম খালি থাকার রহস্য। এক রাতে বাবুর্চি শহীদ এসে বলল, 'এই রুমে রাত্রে অনেক কিছু দেখা যায়।'

জানতে চাইলাম, 'কী দেখা যায়?'

'রাত্রে তাদের নাম নেয়া ঠিক না।'

শহীদ পরিষ্কার করে কিছু না বলতে চাইলেও সে কী বলতে চেয়েছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়নি।

অসুবিধা হলো হোস্টেলে আর কোন রুম খালি নেই। সুতরাং আমরা ভূত বলে কিছু নেই এই বিশ্বাসে ভর করে ২০৮ নাম্বার রুমেই থেকে গেলাম।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন কিছুটা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পর আমরা ভূতের কথা ভুলে গেলাম। আমাদের চারজনের মাঝে গড়ে উঠল গভীর বন্ধুত্ব। আমরা একসাথে ক্লাসে যাই, একসাথে খাই, বিকেলে ঘুরতেও যাই একসাথে। শরীর চর্চার ইন্সট্রাক্টর আমাদের বলতেন 'ফোর কমরেডস'। আমাদের সমস্যা ছিল একটাই। সেটা আমিনকে নিয়ে। সে এসেছিল ব্রাহ্মণপাড়া'র সীমান্তবর্তী একটা গ্রাম থেকে। আমিন ঘুমানোর সাথে সাথে শুরু করত নাক ডাকা, তার নাক ডাকা মানে যে সে নাক ডাকা নয়। মনে হত কেউ করাত দিয়ে কাঠ কাটছে। প্রথম দিকে নাক ডাকার শব্দে ঘুমের সমস্যা হত, কিন্তু আমিন কখনোই স্বীকার করত না যে তার নাক ডাকে। একসময় আমরা এই নাকডাকার সাথেও মানিয়ে নিলাম।

অবশেষে একদিন ছন্দপতন ঘটল, অরুণ একদিন সকালে বলল আগের রাত্রে তার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিছুটা শীত-শীত ভাব থাকায় ফ্যান বন্ধ করে ঘুমিয়েছি। মাঝরাতে কিছুটা গরম লাগায় অরুন ভাবল ফ্যানটা ছাড়া দরকার। ভাবার সাথে সাথে সে অবাক হয়ে লক্ষ করল ফ্যানটা ঘুরতে শুরু করেছে।

আমরা বিষয়টা হেসে উড়িয়ে দিলাম, কিন্তু ঘটনাটা অরুণের মনে দাগ কেটে গেল। দিনের বেলাও সে রুমে থাকতে ভয় পায়। ভয় হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধি। দেখা গেল আমরাও ভয় পেতে শুরু করেছি। কয়েকদিন পর একরাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে দেখলাম আমার টেবিলে বসে মোমবাতির আলোতে একজন লোক কিছু লিখছে। ভূতের ভয়টা এমনভাবে মনে ঢুকে গিয়েছিল যে, চিৎকার করে উঠলাম। আমার চিৎকার শুনে লোকটা দ্রুত উঠে দাঁড়াল, লোকটা ওঠার সময় তার হাতে লেগে মোমবাতিটা উল্টে পড়ে নিভে গেল। আমি এতটাই

ভয় পেয়ে গেলাম যে দ্বিতীয় বার চিৎকার করতে সাহস পেলাম না। আতঙ্কে প্রায় জমে যাওয়ার অবস্থা। আমার চিৎকারে অন্যরাও জেগে গিয়েছিল, আতঙ্ক কেটে গিয়ে সৃষ্টি হলো হাস্যকর পরিস্থিতির। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় মোমবাতি জ্বেলে চিঠি লিখছিলেন আমাদের সিনিয়র রুমমেট তাজু ভাই। হাস্যকর ঘটনাটা দ্রুত পিটিআইতে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সাথে ততদিনেও ভূতের দেখা না পেয়ে আমরা ভাবতে শুরু করলাম, ২০৮ নাম্বার রুম নিয়ে পিটিআইতে যে সকল গল্প প্রচলিত আছে সবই বানানো গল্প।

দুই

রমজান মাসে পিটিআই বন্ধ হয়ে গেল। চল্লিশ দিনের লম্বা ছুটি। এত লম্বা ছুটি পেয়ে সকলেই বাড়িতে চলে গেল। আমি আটকে গেলাম এল.এল.বি পরীক্ষার জন্য। রাত জেগে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছি। গোটা হোস্টেলে আমি একা।

এইদিকটাতে ছিঁচকে চোরের উপদ্রব বেশি। তাই হোস্টেলে ঢুকবার কলাপ্সেবল গেটটাতে তালা লাগিয়ে দিয়েছি সূর্য পশ্চিম আকাশে থাকতেই। পড়ছিলাম নিশ্চিন্তে। হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেল। সারাদেশে যে হারে লোড শেডিঙের কথা শোনা যায়, তাতে লোডশেডিং হওয়াটা স্বাভাবিক। একটা মোমবাতি সবসময় টেবিলের উপর রেখে দেই। অন্ধকারে মোমবাতি খুঁজতে গিয়ে বিপত্তি ঘটল। টেবিলের উপর ছিল একগ্লাস পানি, মোমবাতি খুঁজতে গিয়ে সেটা উল্টে ফেলেছি। মোমবাতি, দিয়াশলাই খুঁজে পাওয়ার পর দেখা গেল দিয়াশলাই এর কাঠিগুলো ভিজে গিয়েছে। স্বল্প যে কয়েকটা কাঠি ছিল অনেক চেষ্টা করেও তা জ্বালানো গেল না। বাধ্য হয়ে আলো না জ্বেলে শুয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে যখন কিছু করার থাকে না তখন আমি বাঁশি বাজাই। সে রাতেও অন্ধকারে হাতড়ে বাঁশি বের করলাম। বাঁশিতে সবেমাত্র একটা হারানো দিনের গান তুলেছি, এসময় দরজায় আওয়াজ হলো ঠকঠক করে। বাঁশি বাজানো বন্ধ করলাম। আবার ঠকঠক করে আওয়াজ হলো, এবার খানিকটা দ্রুতলয়ে, বোঝা যাচ্ছে আগন্তুক অধৈর্য হয়ে পড়েছে। আমি বিছানা ছেড়ে দরজায় পৌছবার আগে আবার আওয়াজ হলো। আগন্তুক এবার যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলল, 'রফিক ভাই, ও রফিক ভাই, দরজা খোলেন।'

রফিক ভাই থাকেন ২০৯ নাম্বারে। অন্ধকারে আগন্তুক আমাদের রুমকে ২০৯ মনে করেছে।

দরজা খোলার সাথে সাথেই আগন্তুক হুড়মুড় করে রুমে ঢুকে পড়ল। আগন্তুক একহাতে তার তলপেট চেপে ধরে মেঝেতে বসে পড়ল।

আমি জানতে চাইলাম, 'কী হয়েছে?'

আগন্তুক অনেক কষ্টে বলল, 'গুলি লেগেছে।'

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এই এলাকাটিতে প্রায় প্রতিদিনই মারামারি লেগেই

আছে, লোকটিকে যারা গুলি করেছে তারা নিশ্চয়ই পিছুপিছু আসবে, তার চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে গুলি খাওয়া লোকটি যদি আমার রুমে মারা যায়, তা হলে আমি ফেঁসে যাব। তাই বলে আহত একটা লোককে এতরাতে বের করে দেয়া যায় না। আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম। বাইরে থেকে আসা চাঁদের আলোয় রুমের কিছুটা এতক্ষণ আলোকিত করে রাখলেও দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে সম্পূর্ণ রুম ডুবে গেল অন্ধকারে। অন্ধকারে অনুভব করলাম লোকটা মেঝেতে শুয়ে পড়েছে। ক্ষীণ স্বরে গোঙানি নিঃশব্দতার মাঝে বীভৎস মনে হচ্ছে। লোকটা এখনও জীবিত। কিন্তু আর কতক্ষণ জীবিত থাকবে? অন্ধকারে লোকটার পাশে বসে বুঝতে পারলাম রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। অন্ধকারেই গামছা বের করে আনলাম। গুলিটা কোথায় লেগেছে জানতে চাইলাম।

আগন্তুকের দেখিয়ে দেয়া স্থানে গামছা বাঁধলাম শক্ত করে। এটা হয়তো রক্ত পড়া বন্ধ করবে। রক্ত পড়া বন্ধ না হলেও এই মুহূর্তে আমার করার আর কিছু নেই।

আশপাশে মানুষ বলতে নাইট গার্ড রফিক ভাই। রফিক ভাই থাকেন প্রশাসনিক ভবনের নীচতলায়। ভয় পেলেও বুঝতে পারছিলাম রফিক ভাইকে ডেকে আনা দরকার। লোকটাকে ডাক্তারের কাছে নেয়া দরকার। এসময় আগন্তুক পানি চাইল। তাকে পানি দিতে গিয়ে মনে পড়ল রুমে পানি নেই, কদিন থেকে হোস্টেলের পাম্প নষ্ট। পি.টি.আই ছুটি থাকায় মেরামত করা হচ্ছে না। এদিকে মৃত্যুপথ যাত্রী একটা লোক পানি চাইছে। রফিক ভাইয়ের কাছে গেলে পানিও পাওয়া যাবে।

আমি আগন্তুককে বললাম, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি পানি নিয়ে আসছি।'

আগন্তুক দুর্বল কণ্ঠে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, তখনি আমার মনে পড়ল হোস্টেলের গেট তালা দেয়া। আমার কাছে একটা চাবি আছে, কিন্তু আমি আতঙ্কের সাথে চিন্তা করলাম, গেট তালা দেয়া থাকলে দক্ষিণ দিকের মেহগনি গাছগুলো ছাড়া উপরে ওঠার কোনও উপায় নেই। একটা গুলি খাওয়া লোক নিশ্চয়ই গাছ বেয়ে দোতলায় উঠতে পারবে না। আতঙ্কে আমি চিৎকার করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললাম।

এতক্ষণ লোকটাকে দেখতে না পেলেও এবার আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাকে মোটেই গুলি খাওয়া দুর্বল লোকের মত লাগছে না। সে উঠে দাঁড়াল। আমি বুঝতে পারলাম এ-ই হচ্ছে সেই রহস্যমানব, যার গল্প বছরের পর বছর ধরে প্রচলিত। সেই সাথে আমি বুঝতে পারলাম রহস্যমানব যদি আমাকে আক্রমণ করে, বাঁচানোর জন্য কেউ আসবে না, আসতে পারবে না, আমি যদি চিৎকার করি, লাভ হবে না, বাইরে থেকে কেউ চিৎকার শুনলেও ভিতরে ঢুকতে পারবে না, আমি নিজের হাতে তালা বন্ধ করেছি। প্রশাসনিক ভবনটা এত দূরে যে আমার চিৎকার রফিক ভাইয়ের কাছে পৌছাবে না। আমার মনে হলো আমি হেরে গেছি, এই আগন্তুক অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে মেরে ফেলবে। বন্ধুবান্ধবদের চেহারাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল, ওদের কারও সাথেই আর দেখা হবে

না, আমি মৃত্যুকে মেনে নিতে প্রস্তুত হলাম।

সব আশা শেষ হয়ে যেতেই আমার সাহস ফিরে এল। মরেই যখন যাব, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। চিন্তাটা মাথায় ঢুকতেই মাথা পুরোদমে কাজ করতে শুরু করল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার পাশেই একটা চেয়ার রাখা আছে। আড়চোখে একবার চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে আগন্তুককে বললাম, 'তুমি কী চাও?'

আগন্তুক জোরে হেসে উঠল, হাসিটা এতটাই কর্কশ, মনে হচ্ছে নরক থেকে উঠে আসছে।

হাসির শব্দটা স্নায়ুতে আঘাত করছে।

হঠাৎ করেই আমি ডানহাতে চেয়ারটি নিয়ে ঘুরিয়ে মারলাম, চরম আতঙ্কে দেখলাম চেয়ারটা শূন্যে কোনও অবলম্বন না পেয়ে আঘাত করল বাম দিকের দেয়ালে। আঘাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় আমি ভারসাম্য হারালাম। এই অবস্থায় আগন্তুক আমাকে ধাক্কা দিল। নিমিষেই আমি প্রথমে নিজেকে শূন্যে তারপর ঘরের এককোণে আবিষ্কার করলাম। আমি শুয়ে থাকা অবস্থায় শিকারে পরিণত হতে চাই না। দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম, সেই সাথে অবাক হলাম। এত জোরে পড়ার পরও আমার সব হাড় হাড্ডি মনে হয় ঠিকই আছে। আমি আগন্তুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আশ্চর্য! আমি কোনও কিছুর সাথে ধাক্কা না খেয়ে আছড়ে পড়লাম। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসল। মানুষের যখন সব আশা শেষ হয়ে যায় মানুষ তখন সৃষ্টিকর্তার কাছে আশ্রয় খোঁজে। মনে মনে আল্লাহকে ডাকলাম। হে আল্লাহ, আমাকে রক্ষা করো। উঠতে গিয়ে চেয়ারের সাথে হোঁচট খেলাম, সেই সাথে চেয়ারটা তুলে নিলাম, আগন্তুক আমাকে এবার আর কোনও সুযোগ না দিয়ে আমার হাত থেকে চেয়ারটা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। চেয়ারটা উড়ে গিয়ে পড়ল কাঁচের জানালায়। কাঁচ ভাঙার শব্দে আমার নতুন করে আশার সঞ্চার হলো। গভীর রাত্রি, রফিক ভাই জানালা ভাঙার আওয়াজ পেতেও পারে। আমি টেবিলে হাত দিয়ে পানির গ্লাসটা পেলাম, আগন্তুক সেটাও আমার হাত থেকে নিয়ে ছুঁড়ে দিল। আমি এবার টেবিলটা তুলে নিলাম দুইহাতে, আগন্তুক টেবিলটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। টেবিলটা পড়ল দরজার উপর, পুরনো দরজা ভারী টেবিলের আঘাত সহ্য করতে না পেরে হাঁ করে খুলে গেল। হালকা চাঁদের আলো আমার সাহস কিছুটা বাড়িয়ে দিল। একসময় কিছু জুডো শিখেছিলাম। কিন্তু একটি ছায়ার বিরুদ্ধে তা কোনও কাজেই আসবে না।

আগন্তুক এবার আমাকে তুলে ছুঁড়ে মারল। ভাঙা গ্লাসের আঘাতে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বেরিয়ে এল টাটকা রক্ত। আগন্তুক আমার পাশে এসে বসল। সে তার ঠাণ্ডা দুই হাত দিয়ে আমার গলা চেপে ধরল। আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। শেষ বারের মত লাথি মারার চেষ্টা করলাম, আগন্তুকের মুখ এখন মাত্র একফুট দূরে, চোখ দুটো অঙ্গারের মত জ্বলছে, লকলকে জিভটা বেরিয়ে এসেছে। এখন আর তাকে মানুষের মত মনে হচ্ছে না, এখন তার মুখটা মনে হচ্ছে কুকুরের মত। সেখান থেকে আসছে পচা বোটকা গন্ধ। সেই গন্ধে নাড়ী ভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চাইছে। চরম আতঙ্কে চোখ বুজলাম। এই সময় নাকে আরেকটা

গন্ধ ঢুকল, পচা বোটকা গন্ধ থেকে আলাদা, আবার চোখ খুললাম। ভয়ালদর্শন জীবটা আমার হাতের ক্ষত থেকে রক্ত চাটছে।

ভয়াল জীবটা রক্ত চাটায় এতই ব্যস্ত যে পিছনে একজন এসে উপস্থিত হয়েছে সে টেরই পায়নি। ছাদ পর্যন্ত লম্বা মানুষটার মাথায় একটা হ্যাট। লোকটা তার লম্বা পা দিয়ে জীবটাকে আঘাত করল। দানবটা ভয়াল এক চিৎকার দিয়ে একপাশে ছিটকে পড়ল। হ্যাটওয়ালা আবার আঘাত করল, দানবটা এই আঘাতে আছড়ে পড়ল আমার উপর। সাহেবী হ্যাট এবার দুইহাত দিয়ে দানবটাকে শূন্যে তুলে ধরল। আমি বুঝতে পারলাম দানবটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে শক্তিশালী কেউ একজন এসেছে। আমার মনে পড়ল ২০৮ নাম্বার রুমের রহস্যমানবের যে সব গল্প পি.টি.আইতে প্রচলিত সেইসব গল্পে রহস্যমানবকে হ্যাট পরা অবস্থায়ই দেখা গেছে। রহস্যমানব দানবটাকে বাইরে ছুঁড়ে মারল। সেই সাথে আমি নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারালাম।

তিন

মাসুদের গল্প শেষ হওয়ার পরও সবাই স্তব্ধ হয়ে রইলাম। এতক্ষণ যা শুনলাম তা কি সত্যি? এসময় হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেল। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সাথে বিদ্যুৎবিহীন রাতের গল্পটা যেন এসে হাজির হলো, হয়তো খানিকটা ভয়ও পেলাম। কিন্তু সে সামান্য সময়ের জন্য, রাজধানীর বুকে অভিজাত হোটেল বসুন্ধরার লবিটা দ্রুতই জেনারেটরের কল্যাণে আলোকিত হয়ে উঠল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবার ঘুমোতে হবে। আমার সাথে সাথে সাইদুরও উঠে দাঁড়াল। সাইদুর হচ্ছে মুরাদনগর উপজেলার ইউপিও, চরম তাচ্ছিল্য নিয়ে বলছিল ভূত বলে কিছু নেই। আমি বললাম, 'সাইদুর সাহেব, কিছু বলবেন?'

'আমি আজ আপনার রুমে ঘুমোব।'

আমি ভাবলাম, ভালই হলো, আজ রাতে একা একা আমার ঘুম নাও আসতে পারে। মুখে শুধু বললাম, 'চলুন।'

রেজাউল করিম ডালীম

দেহান্তর

রোজ ভোর সাতটায় ঘুম ভাঙে সেলিম সাহেবের। আজ এর ব্যতিক্রম হলো। ঝাড়া আধঘণ্টা দেরিতে ঘুম ভাঙল তাঁর।

খানিকটা অবাকই হলেন তিনি। টানা সাড়ে চার বছর পর এই প্রথম তাঁর ঘুম ভাঙতে দেরি হলো।

আধঘণ্টা দেরির কারণ ভাবতে ভাবতে তিনি বাথরুমে ঢুকলেন।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালেন। অস্বাভাবিক দৃশ্যটা দেখেও ভাবান্তর হলো না তাঁর কয়েক মুহূর্ত। যখন হলো, তখন ঝট করে পেছন ফিরে তাকালেন। না, কেউ নেই। সাদা একটা বাথটাব শুধু। আবার আয়নার দিকে ফিরলেন তিনি। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন বলিরেখায় ভরা মাংসল একটা চেহারা। গলা শুকিয়ে গেল সেলিম সাহেবের। তাঁর মনে হলো, যেকোন মুহূর্তে মূর্ছা যাবেন। দেখলেন আয়নাটা দ্রুত ঘোলা হয়ে আসছে, একটু পর ওটাকে আয়তাকার একটা বরফের টুকরোর মত দেখাল। সেলিম সাহেব সম্মোহিতের মত চেয়ে রইলেন। খানিক পর ঘোলাটে ভাবটা কাটতে লাগল আয়নার। এবার তিনি নিজের চেহারা দেখতে পাবেন তো? নাকি...। সেলিম সাহেবের আন্দাজ নির্ভুল। আয়নার চেহারাটা তাঁর নিজেরই— ওই কালো চুল, চওড়া কপাল, খাঁজঅলা চিবুক তাঁর চিরচেনা। নিজের অজান্তে পরম মমতায় চোয়ালে হাত বোলাতে লাগলেন সেলিম সাহেব।

কাঁপা হাতে মুখ ধুয়ে শোবার ঘরে ফিরে এলেন তিনি।

অভ্যেসমাফিক রেডিও ছাড়লেন। 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো...' বাজছে। গান শেষ হলে উপস্থাপক খবরের ঘোষণা দিল। সেলিম সাহেব মশারি গোটাচ্ছেন। পোঁ...পোঁ..পোঁ... পোঁওঁওঁওঁ, আওয়াজ দিল রেডিও। খবর শুরু হলো, 'আসসালামুআলাইকুম। খবর পড়ছি ফারজানা শারমিন। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, মহান ভাষাদিবস। উনিশশো বাহান্ন সালের এই দিনে...'

একুশে ফেব্রুয়ারি! বলে কী মহিলা!

সেলিম সাহেব ধরেই নিলেন ফারজানা শারমিন ভুল করছেন। কিন্তু আজ একুশে ফেব্রুয়ারি প্রমাণ করার জন্যেই যেন মহিলা বলে চলেছেন, 'আজ সরকারি ছুটির দিন। ভাষাদিবস ও ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার জন্যে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন মহান একুশ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিকগুলো প্রকাশ করেছে বিশেষ ক্রোড়পত্র। এ ছাড়াও...' নাহ্, রেডিওর এত সাফাই ভুল হতে পারে না। আজ একুশ তারিখই।

তার মানে আজ শনিবার।

তাই যদি হয়, তা হলে শুক্রবার গেল কোন দিক দিয়ে?

সেলিম সাহেব বৃহস্পতিবার রাতে শুয়েছিলেন। কাজেই আজ হবার কথা শুক্রবার। নাকি শুক্রবার দিন-রাত ঘুমিয়েই কাবার করে দিয়েছেন তিনি? তা কী করে হয়? বৃহস্পতিবারে ভারী কোন কাজ করেননি তিনি, কিংবা শরীরও খারাপ ছিল না যে এত লম্বা ঘুম দেবেন।

তা হলে?

আস্ত একটা দিন গেল কোন দিক দিয়ে? কী হতে পারে এর ব্যাখ্যা?

সেলিম সাহেব বিপত্নীক মানুষ। তাঁর পেয়ারের বউটা সাড়ে চার বছর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। সেই থেকে তিনি একা। বাড়িতে এমনকী একটা কাজের লোকও রাখেননি। গেরস্থালী সব কাজ একলা করেন। আর ছবি আঁকেন, এক্সিবিশন করেন, বই পড়েন, খান-দান, ছবি দেখেন, ঘুরে বেড়ান; বউয়ের স্মৃতি কষ্ট দেবার চেষ্টা করলে গলা পর্যন্ত ব্ল্যাক লেবেল গিলে মাতাল হবার চেষ্টা করেন—এভাবেই ভাল-মন্দে কেটে যাচ্ছে তাঁর দিনগুলো।

ব্রেডে ঘি আর চিনি মাখাতে গিয়ে তিনি টের পেলেন, দুই রাত একদিন ঘুমালে যতটা খিদে পাবার কথা ততটা পায়নি।...তা ছাড়া চোয়ালের দাড়িও ছোট ছোট, দুই দিনের দাড়ি এত ছোট হবার কথা নয়।...হঠাৎ খবরের কাগজের কথা মনে পড়ল তাঁর। দরজার কাছে গেলেন। দেখলেন দুটো কাগজ পড়ে আছে গোবরাটের কাছে। হাতে নিলেন দুটোই। দেখা গেল একটা বিশ তারিখের, অন্যটা একুশ তারিখের। বিশ তারিখের কাগজটা আজকের কাগজের মতই কড়কড়ে। বিশ তারিখে, অর্থাৎ গতকাল তিনি ওটা ছুঁয়েও দেখেননি।...আজ যে শনিবার, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না সেলিম সাহেবের।

গড়বর কিছু একটা হয়েছে, বিড়বিড় করে বললেন তিনি নিজেরই উদ্দেশে, আমাকে জানতেই হবে কী সেটা।

আশ্চর্য ব্যাপার! শুক্রবারের কোন কথা মনে পড়ছে না তাঁর।...বৃহস্পতিবারে আলমগীর মিয়ার কাছ থেকে আনা বইটা...। ছি, বইটার কথা মনে পড়তে জিভ কাটলেন সেলিম সাহেব। বইটা শুক্রবারে ফেরত দেবার কথা আলমগীর মিয়াকে। অথচ শুক্রবার টপকে আজ শনিবার।

সেলিম সাহেব ঠিক করলেন, ব্রেকফাস্ট সেরে বইটা ফেরত দিতে বেরোবেন। আলমগীর মিয়ার দোকান নীলক্ষেতে। তার ওখানে যাবার আগে মালিবাগ যাবেন ডাক্তার জুবায়ের ইসলামের কাছে। জানবেন, তাঁর এই এক দিনের স্মৃতিভ্রম মারাত্মক কোন সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের লক্ষণ কী না। এইসব ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেয়া যায় ততই মঙ্গল।

চা খেতে খেতে আলমগীর মিয়ার দেয়া বইটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন তিনি।

প্রথম থেকেই কেন যেন তাঁর মনে হচ্ছে, বইটার কাভার মানুষের চামড়ার। অস্বাভাবিক সন্দেহ।...বইটা ইংরেজিতে লেখা, যে সে ইংরেজি নয়, দাঁত-ভাঙা ইংরেজি।...সেলিম সাহেব পছন্দ করেন আটপৌরে জীবনের কাহিনি, আলমগীর জানে, তা-ও এই অকাল্টের বইটা সে তাঁকে পড়তে দিয়েছে জোর করে, খুব নাকি

ইন্টারেস্টিং বই। গ্যাপ দিয়ে দিয়ে বইটায় চোখ বোলাচ্ছেন তিনি। এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'পরলোকগত কাউকে কাজে লাগাতে চাইলে আগে আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে নিখুঁতভাবে, প্রথমে...' এখানে লম্বা-চওড়া একটা ফর্মুলা দেয়া হয়েছে। কয়েকটা পাতা ওল্টালেন তিনি, এক প্যারায় বলা হয়েছে, 'মাঝরাতে মৃতের আত্মাকে ডেকে তার কাছ থেকে ভবিষ্যতের যেকোন বিষয়ে জানা যেতে পারে...' আরও ক'টা পাতা ওল্টালেন সেলিম সাহেব। আটাত্তর পৃষ্ঠার শেষ প্যারায় চোখ আটকে গেল, বলা হয়েছে, 'চাইলেই আপনি আপনার বন্ধুর দেহকে নিজের দেহ বানিয়ে ফেলতে পারেন। এজন্যে আপনার একটা কিছু জিনিস লাগবে, এই যেমন—চেইন, ঘড়ি, কলম, চিরুনি—এমন কিছু। জিনিসটা বন্ধুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঘরে বসে নিয়মমাফিক কাজ করুন, ব্যস কেল্লা ফতে।...আপনার আত্মা যতক্ষণ তার দেহে থাকবে, ততক্ষণ তার দেহ হয়ে থাকবে হুবহু আপনার দেহ। এসময় তাকে যে কাজে ইচ্ছে লাগাতে পারবেন। এসময় তার দেহ বা আত্মা কোনরকম বেগড়বাই করতে পারবে না।...কাজ শেষে আপনার আত্মা নিজের দেহে ফিরে আসার পরও বন্ধুটির দেহ নিজের রূপ ফিরে না-ও পেতে পারে। তবে ভয়ের কিছু নেই, এই সমস্যা সাময়িক; আপনার বন্ধু জেগে ওঠার পর পরই আপন সুরত ফিরে পাবে।

'ইন্টারেস্টিং তো!' স্বগতোক্তি করলেন সেলিম সাহেব। 'করব নাকি এক্সপেরিমেন্টটা?...ধ্যাৎ, খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আত্মা নিয়ে খেলব। তা ছাড়া লেখক যা দাবি করেছেন, তাই ঘটবে এমন কোন নিশ্চয়তা আছে?...বইটা আজই ফেরত দিয়ে আসতে হবে, আর এক মিনিটও নষ্ট করা যাবে না অকাল্টের পেছনে।'

বইটা আজকের কাগজে মুড়িয়ে ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়লেন সেলিম সাহেব। আকাশের মন খারাপ। যেকোন মুহূর্তে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলতে পারে।

জুবায়ের ইসলামের চেম্বার মালিবাগে। ডাক্তারদের চেহারা খোকা খোকা না হলে কেন যেন মানায় না; জুবায়েরের চেহারা খোকা খোকা তো নয়ই, বরং জল্লাদের মত, দেখলেই মনে হয়, শরীরের পেছনদিকে রামদা লুকিয়ে রেখেছে, সুযোগ পেলেই এক কোপে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে ফেলবে রোগীর। স্বভাবটাও ঠোঁটকাটা। রোগী সামনে বসামাত্র জিজ্ঞেস করবে, অ্যাটেনডেন্টকে টাকা দিয়ে এসেছেন তো? ইতর কাঁহিকা! প্রশ্ন উঠতে পারে, এহেন চরিত্রের জুবায়ের ইসলামের সঙ্গে সেলিম সাহেব যোগাযোগ রাখতে যান কেন? জবাবটা খুব সোজা—জুবায়ের তাঁর একমাত্র শ্যালক।

জুবায়ের আজ ইতরামি করল না। উল্টো, সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধরে বলল, 'দুলাভাই, ছবি দেখবেন? চলেন না যাই। মধুমিতায় স্টার ওয়র্স চলছে...'

'রাখো তোমার ছবি,' খেঁকিয়ে উঠলেন সেলিম সাহেব। সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'আজ সকালে যা হয়েছে, শুনলে তোমার ভূত ভেগে যাবে...'

শালাকে সব খুলে বললেন তিনি।

'আপনার কিচ্ছু হয়নি, দুলাভাই,' সব শুনে সোয়িভ্ল চেয়ারে হেলান দিতে

দিতে বলল জুবায়ের। 'এমনটা অনেকের বেলায়ই ঘটেছে, ঘটবেও ভবিষ্যতে। এ নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই।'

'একই ঘটনা যদি আবার ঘটে?'

'ঘটবে না। অন্তত এপর্যন্ত কারও বেলায় ঘটেনি।'

'হুঁম।...কিন্তু বড় কৌতূহল হচ্ছে, কাল সারাদিন আমি করলামটা কী?'

'সেটা জানা কি খুব জরুরী?'

'জরুরী নয়, কিন্তু মনটা বেজায় খুঁতখুঁত করছে।'

'তা হলে মেডিটেশনের সাহায্য নিয়ে দেখতে পারেন।'

'ধুর, ওকাজ আমাকে দিয়ে হবে না। মেডিটেশন করছি, ভাবলেই মনে হয় যোগী হয়ে গেলাম।'

ঠা ঠা রবে হেসে উঠল জুবায়ের।

শালার চেম্বার থেকে বেরিয়ে বেবিট্যাক্সিতে চাপলেন সেলিম সাহেব।

সঙ্গে আনা খবরের কাগজের হেডিংগুলোয় চোখ বোলাতে লাগলেন; হত্যা মামলার আসামী আ.জ.ম বিল্লাল গ্রেপ্তার—'আম-জনতা-দল'-এর নামে হরতাল ডাকা নিয়ে বরিশালে বিভ্রান্তি; নিজেদের এখতিয়ার নিয়ে প্রতিরক্ষা সংসদীয় কমিটিতে বাকবিতণ্ডা; ডিএনপিসহ চার দলের আহ্বানে আগামীকাল সকাল-সন্ধ্যা হরতাল; মোংলা বন্দরে আজ পাঁচ ঘণ্টা কর্মবিরিতি; জঙ্গিদের অবস্থান ছেড়ে দিতে পাক সেনাপ্রধানের আহ্বান; তেশিমিজু বিদ্যুৎ ও ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট নন—বৈচিত্রহীন সব খবর। ভেতরের পাতাগুলো দেখতে লাগলেন তিনি। আট নম্বর পৃষ্ঠার একটা ছবি নজর কাড়ল তাঁর। ছবির লোকটি তাঁর চেনা। রিপোর্টের শিরোনাম—হেদায়েত উল্লাহ্ খুন হয়েছেন। খবরের বিবরণে বলা হয়েছে, 'নাখালপাড়ার বাসিন্দা হেদায়েত উল্লাহ্ একজন বড় মাপের পাঠক ছিলেন। ব্যক্তিগত একটি লাইব্রেরি গড়ে গেছেন তিনি, অনেক মূল্যবান এবং বিরল বই আছে তাঁর লাইব্রেরিতে। গতকাল কে বা কারা তাঁর লাইব্রেরিতে ঢুকে বেশ কিছু আউট অভ প্রিন্ট বই আত্মসাৎ করে। পুলিসের ধারণা—হেদায়েত উল্লাহ্ দুস্কৃতদের ঠেকাতে গিয়ে ছুরিবিদ্ধ হন। তাঁর মরদেহ তাঁরই লাইব্রেরির ছড়ানো-ছিটানো বইয়ের মাঝে আবিস্কৃত হয়। এই রিপোর্ট লেখার সময় খবর পাওয়া গেছে হেদায়েত উল্লাহর দূরসম্পর্কের এক ভাগ্নে এ ব্যাপারে তেজগাঁও থানায় মামলা দায়ের করেছেন।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন সেলিম সাহেব। দেশটা একেবারে রসাতলে গেছে। এখানে রোজ দু'চারজন হেদায়েত উল্লাহ্ নিকেশ হওয়া মামুলি ঘটনা। এই অবস্থার উন্নতি হবার পথ দেখেন না সেলিম সাহেব; তিনি এই দেশের ব্যাপারে যার পর নেই হতাশ।

কাগজে হেদায়েত উল্লাহর ছবিটার দিকে তাকালেন তিনি আবার। মহাখালী থাকতে জগিঙের সময় হেদায়েত উল্লাহর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত তাঁর। শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, খেলাধুলো—সব ব্যাপারেই আলাপ হত তাঁদের। লোকটা খুব মিশুক ছিল। সেই মানুষটা আজ আর নেই। বিষণ্ন মনে কাগজ নামিয়ে রাখলেন সেলিম সাহেব।

আলমগীর মিয়ার দোকানে পৌছলেন তিনি। নীলক্ষেত জায়গাটা বেজায় ঘিঞ্জি, বেশিরভাগ দোকানিই খদ্দেরদের বসতে দিতে পারে না। বাতাসের আসা-যাওয়া নেই বলে ভেতরটায় অসম্ভব গরম। পাওয়ার চলে গেলে জায়গাটা দস্তুরমত নরকে পরিণত হয়।

আলমগীর মিয়া দোকানে নেই। পাশের দোকানি জানাল, নিউ মার্কেট গেছে অ্যানা কারেনিনা আনতে।

অগত্যা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

আলমগীর মিয়া পনেরো মিনিট পর এল।

তার নাদুসনুদুস চেহারার চামড়া কুঁচকে গেছে বয়েসের ভারে।

সেলিম সাহেবকে দেখামাত্র একগাল হেসে বলল, 'ছার কেমুন আছেন? বইডা আনছেন?' সেলিম সাহেবের হাতের দিকে নজর চলে গেল তার।

অদ্ভুত একটা ধারণা হলো সেলিম সাহেবের।

'নাহ্, আনিনি,' অবলীলায় মিথ্যে বললেন তিনি। 'বইটা বেশ ইণ্টারেস্টিং লাগল। ভাল করে পড়ব ভাবছি। রাখি আরও দিন দুই?'

আলমগীর মিয়া হতাশ হলো। অবশ্যি সেলিম সাহেবের আগ্রহ দেখে না-ও করতে পারল না। বলল, 'কী আর করন যাইব, রাখেন। কিন্তু, ছার সোমবারের বেশি দেরি কইরেন না। বইডা খুবোই জরুলি। আমি পড়তাছি।'

আলমগীর মিয়ার দোকান থেকে পুরানো দুটো ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ওয়ার্ল্ড নিয়ে বেরিয়ে এলেন সেলিম সাহেব।

বইটা ফেরত দিলেন না কেন তিনি?...না, এ তাঁর খেয়াল নয়। শক্ত কারণ আছে এর পেছনে।

আজ ভোরে আয়নায় মাংসল যে চেহারাটা দেখেছেন তিনি, সেটা এই আলমগীর মিয়ার!

ঘরে ফিরে বইটা আবার খুললেন সেলিম সাহেব।

কাভারটা ভাল করে দেখলেন। মানুষের চামড়ারই।

বইয়ের কোথাও প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। তবে তাঁর ধারণা, বইটা কম করেও দেড়শো বছরের পুরানো। ছাপার মান খারাপ নয়। ভাষার ভুল নেই বললেই চলে; তবে, আগেই খেয়াল করেছেন তিনি, ভাষাটা বড্ড শক্ত, অহেতুক জটিল জটিল, অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সেলিম সাহেবের মনে এখন জটিল এক জিজ্ঞাসা: আলমগীর মিয়া সেদিন সেধে তাঁকে বইটা পড়তে দিল, আবার এক দিন যেতে না যেতেই জরুরতের বাহানা দিয়ে ফিরিয়ে নিতে চাইছে কেন? রহস্যটা কী?

তিনি ঠিক করলেন, বইটা প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পড়া শুরু করবেন, পড়তেই থাকবেন যতক্ষণ না ক্লান্তি লাগছে।

অপদেবতা, অপচ্ছায়া, পিশাচ, প্রেত, দানব, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউল্ফ, ডাকিনী, গুপ্তহত্যা—এইসব বিষয়ে ঠাসা বইটা। সব পড়লেন তিনি। পড়তে

পড়তে রাত নেমে এল।

বই বন্ধ করলেন তিনি।

শোবার ঘরের দিকে চললেন।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই চেস্ট অভ ড্রয়ারের কাছে তাঁর প্রিয় সুটটাকে জবুথুবু হয়ে পড়ে থাকতে দেখলেন। মাথায় খুন চড়ে গেল তাঁর। কে করল এই কাজ? এই বাড়িতে হচ্ছেটা কী? বউয়ের দেয়া সুটটা তাঁর জানের জান, ময়লা হবে বলে পরেনই না প্রায়, সেই সুটের কী দশা! হাতে নিলেন তিনি সুটটা। ধুলো-ময়লায় একসা হয়ে আছে। জায়গায় জায়গায় পিঙ্গল দাগ্ও দেখা যাচ্ছে।

সুটের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বাথরুমে চললেন সেলিম সাহেব। পানির বোলে চুবালেন সুটটা। কাচতে কাচতে একসময় দেখলেন, বোলের পানি বাদামী লাল হয়ে উঠেছে। মাস খানেক আগে আলু ছিলতে গিয়ে হাতের আঙুল কেটে গিয়েছিল তাঁর, আঙুলের রক্ত মুছেছিলেন একটা রুমালে, পরে রুমালটা ধোয়ার সময় ঠিক এরকম বাদামী লাল রঙ ধরেছিল পানি।...সুটটা ভাল করে দেখলেন তিনি।...সুটের এই দাগগুলো কি রক্তের? কীসের রক্ত? কীভাবে লাগল?

মুখ-গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল তাঁর। হাত-পা মৃদু কাঁপতে লাগল।

তাঁর যা মনে হচ্ছে, তা কি ঠিক?

বৃহস্পতিবারে আলমগীর মিয়ার দোকানে গিয়েছিলেন তিনি। সেদিন তার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল মনে করতে লাগলেন।

'হেদায়েত উল্লারে চিনেন, ছার?' আলমগীর মিয়া তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল।

'হ্যাঁ। কেন?'

'উনার বাড়িতে গেছিলেন?'

'উঁ...হ্যাঁ, গেছিলাম একদিন, সে বছর দেড়েক আগের কথা।'

'ভদ্রলোকের কালেকশন দেখছেন!'

'হ্যাঁ। প্রচুর বই জমিয়েছেন হেদায়েত সাহেব। এমন কালেকশন খুব কম পাঠকেরই থাকে।'

আলাপের একপর্যায়ে আলমগীর মিয়া হেদায়েত উল্লাহর কালেকশনের বিরল কিছু বইয়ের নাম বলেছিল। কীসের বই ওগুলো? ওগুলোর ব্যাপারে সে অত আগ্রহ দেখিয়েছিল কেন?

খবরের কাগজটা খুললেন আবার সেলিম সাহেব। আট নম্বর পৃষ্ঠা বার করলেন। রিপোর্টে হেদায়েত উল্লাহর কালেকশন থেকে খোয়া যাওয়া বইয়ের একটা লিস্টি দেওয়া হয়েছে।...তাঁর সন্দেহ নির্ভুল!

সেলিম সাহেব আজ আর ব্ল্যাক লেবেল না খেলে পারবেন না। শোবার ঘর লাগোয়া ছোট্ট রুমটায় ঢুকলেন তিনি। গ্লাস ভরে ফিরে এলেন আবার শোবার ঘরে। টেবিলে বসে গলা ভেজাতে লাগলেন সময় নিয়ে।

ড্রিঙ্ক শেষে আলমগীর মিয়ার বইটা খুললেন আবার।...একটা প্যাসেজের কথা মনে পড়ছে তাঁর। খুঁজতে লাগলেন সেটা। পেয়েও গেলেন শীঘ্রি! চাইলেই আপনি আপনার বন্ধুর দেহকে নিজের দেহ বানিয়ে ফেলতে পারেন। এজন্যে আপনার একটা কিছু জিনিস লাগবে, এই যেমন—চেইন, ঘড়ি, কলম,

চিরুনি—এমন কিছু। এ জিনিস ছাড়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার নয়। জিনিসটা বন্ধুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঘরে বসে নিয়মমাফিক কাজ করুন, ব্যস কেল্লা ফতে।...আপনার আত্মা যতক্ষণ তার দেহে থাকবে, ততক্ষণ তার দেহ হয়ে থাকবে হুবহু আপনার দেহ। এসময় তাকে যেকাজে ইচ্ছে লাগাতে পারবেন। এসময় তার দেহ বা আত্মা কোনরকম বেগড়বাই করতে পারবে না।...কাজ শেষে আপনার আত্মা নিজের দেহে ফিরে আসার পরও বন্ধুটির দেহ নিজের রূপ ফিরে না-ও পেতে পারে। তবে ভয়ের কিছু নেই, এই সমস্যা সাময়িক; আপনার বন্ধু জেগে ওঠার পরপরই আপনার সুরত ফিরে পাবে।

...কী সাংঘাতিক! কী ভয়ঙ্কর! কী নির্মম!

...তাঁর সুটে রক্তের দাগ। ধুলোবালি। দুয়ে দুয়ে চার মিলে যেতে চাইলেও মেলানোর সাহস পাচ্ছেন না সেলিম সাহেব।

বইতে যে জিনিসের কথা বলা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই বইটাই স্বয়ং!

এই বই আলমগীর মিয়া দিয়েছিল তাঁকে। বইটা মিডিয়ামের কাজ করেছে। এই বইয়ের মাধ্যমে সেলিম সাহেবের দেহটা দখল করেছিল আলমগীর মিয়া! হারানো শুক্রবারের এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।

সেলিম সাহেব চেয়ারে হেলান দিলেন। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। সিগারেট ধরালেন তিনি। এখন তাঁকে ভাবতে হবে।

টানা পনেরো মিনিট গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলেন তিনি।

বইটা আজ ফেরত দিতে গিয়েও দেননি। ব্যাপারটা আলমগীর মিয়ার চোখ এড়ায়নি। সে বুঝতে পেরেছে, তাঁর মনে সন্দেহ ঢুকেছে। সে বুঝতে পেরেছে, বইটা তিনি মন দিয়ে পড়লে তাঁর বিপদ হতে পারে, তিনি ধরে ফেলতে পারেন—খুনটা আসলে সে-ই করেছে।...এই অবস্থায় কী করার কথা আলমগীর মিয়ার? পুলিসে খবর দেবে নিশ্চয়ই। কে জানে হয়তো দিয়েই দিয়েছে এরমধ্যে। পুলিস এলে রক্তভরা সুট আর অস্ত্রটা পেয়ে যাবে...অস্ত্র! হ্যাঁ, কোথায় ওটা? আলমগীর মিয়া তাঁকে ফাঁসানোর জন্যে ওটা এবাড়িতেই রেখে থাকবে।

খোঁজ লাগালেন সেলিম সাহেব।

পাওয়া গেল ওটা।

ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। একটা ভোজালি। রক্ত জমে আছে ভোজালিটায়। কী সাংঘাতিক আলামত!

আলমগীর মিয়া যদি পুলিসে খবর দিত, তা হলে এতক্ষণে পুলিস হাজির হয়ে যেত। তা যখন হয়নি, যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন তিনি।...প্রথমে তাঁকে দুই আলামত সুট আর ভোজালি গায়েব করে ফেলতে হবে। কেননা আলমগীর মিয়া পুলিসে খবর না দিলেও, হেদায়েত উল্লাহর বাড়িতে ঢোকার সময় আশপাশের কেউ যদি তাঁকে দেখে ফেলে থাকে, তা হলে তা পুলিসের কাছে গড়াবে। কাজেই পুলিস এসে যাতে সুবিধে করতে না পারে, সে ব্যবস্থা নিতে হবে।—এক। দুই—আলমগীর মিয়াকে আচ্ছামত শায়েস্তা করতে হবে।

কাজে লেগে পড়লেন সেলিম সাহেব।

বইটা নিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন

অন্যের দেহ অধিকার করার কায়দা। পুরো ব্যাপারটাই আসলে ইচ্ছেশক্তির খেলা। বার বার পড়লেন তিনি নির্দেশনাগুলো। মুখস্থ করে ফেললেন। তারপর বই বন্ধ করে চোখ মুদলেন।

মনে মনে সেলিম সাহেব দ্রুত হেঁটে চললেন। মুহূর্তে তিনি কাকরাইল-মালিবাগ হয়ে মগবাজার চলে এলেন। মগবাজার থেকে বাংলা মটর। বাতাসের গতিও এত দ্রুত হয় না, হয় কেবল মনের, আত্মার। এখন তিনি বিশ্বাস করেন—আত্মার অনেক ক্ষমতা, আত্মা অনেক কিছুই পারে। তিনি বাংলা মটর থেকে হাতিরপুল পৌঁছলেন। এবার চললেন দক্ষিণ মুখো। দ্রুত। হাতিরপুল থেকে কাঁটাবন। কাঁটাবন থেকে চললেন আরও দক্ষিণে। একটা চৌরাস্তা পড়ল। বাঁয়ের রাস্তা ভার্সিটির দিকে গেছে, সামনেরটা গেছে পলাশী আর ডানেরটা নীলক্ষেত। সেলিম সাহেব ডানে বাঁক নিয়ে ফুটপাথ ধরে এগোলেন।

আলমগীর মিয়ার বইয়ের দোকানে ঢুকল তাঁর আত্মা।

ফ্লোরে, ছোট্ট এক টুকরো জায়গার মধ্যে শুয়ে আছে বুড়ো। মাথার ওপর পুরানো একটা ফ্যান ঘড়ঘড় শব্দে ঘুরছে।

সেলিম সাহেবের আত্মা ঘুমন্ত আলমগীর মিয়ার দেহে ঢুকে পড়ল।

মুহূর্তে পাল্টে গেল তার গোটা দেহ, হয়ে গেল সেলিম সাহেবের। আপাতদৃষ্টে সেলিম সাহেব বইয়ের দোকানের ফ্লোর থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বাতি জ্বাললেন।

বড় এক টুকরো কাগজে লাল সিগনেচার পেন দিয়ে লিখলেন:

অপরাধবোধ আর সইতে পারলাম না। হেদায়েত উল্লাহর মত নির্বিরোধ একজন মানুষকে যে সামান্য কটা বইয়ের জন্যে খুন করতে পারে, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

আলমগীর মিয়া

২১.০২.১৯...

চিরকুটটা ম্যাগাজিনের স্তূপের ওপর পেপারওয়েট-চাপা দিয়ে দেয়ালের কাছে গেলেন সেলিম সাহেব।

র‍্যাক থেকে কতগুলো বই নামালেন। আলমগীর মিয়া এখানে একটা ছোরা রাখে, দেখেছেন তিনি। ছোরাটা পাওয়া গেল।

সেলিম সাহেব নিজের বুকে নিজেই ছোরা মারলেন!

এরপর তাঁর আত্মা বাইরে বেরোল।

আগের চেয়ে দ্রুত ফিরে চলল সে আপন দেহের কাছে।

তন্দ্রা ছুটে গেল সেলিম সাহেবের।

উহ্, কী স্বপ্নটাই না দেখলেন এতক্ষণ!

এইভাবে মানুষ মারা সম্ভব? যত্তসব! নিজের ওপরই রাগ হলো তাঁর।...আলমগীর মিয়া বা অন্য কেউ যদি পুলিসে খবর দেয়, তা হলে তাঁর বাঁচার একমাত্র উপায় আলামত গায়েব করা। আলমগীর মিয়াকে শায়েস্তা করতে হলে অন্যভাবে করতে হবে, এভাবে নয়, এভাবে অসম্ভব।

সাধের সুটটা নিয়ে বেজমেন্টে গেলেন তিনি। আগুন জ্বাললেন। পুড়িয়ে ছাই

করলেন ওটাকে। তারপর সেই ছাই স্লিপার দিয়ে মিহি করে একটা কাগজের প্যাকেটে ভরে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে গিয়ে জানালা দিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন।

আর ভোজালিটা তো কোন সমস্যাই না।

ছাদে উঠলেন তিনি। তারপর জোরে ছুঁড়ে দিলেন। 'টুব্' শব্দে ওটা পঞ্চাশ ফুট দূরের এঁদো ডোবায় পড়ল।

ঘরে ফিরে টেবিল-চেয়ার, ফ্লোর, চেস্ট অভ ড্রয়ার, ঝাড়পোঁছ করলেন ভালমত। তারপর বাথরুম ধুয়ে গোসল সেরে নিলেন।

রাতের খাওয়া সারলেন তিনি দুটার পর।

রাতে ভাল ঘুম হলেও পরদিন সকালে জানলা দিয়ে নীল পোশাক পরা দুই পুলিসকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে কলজে 'ধক্' করে উঠল তাঁর।

অবশ্যি পরক্ষণে নিজেকে বোঝালেন, পুলিস তাঁর কিচ্ছুটি করতে পারবে না। কোন আলামত রাখেননি তিনি।

পুলিস নক করল দরজায়।

দরজা খুললেন তিনি।

'শালা, এত সময় লাগে খুলতে?' গর্জে উঠল পুলিস।

কলজের পানি শুকিয়ে গেল সেলিম সাহেবের। চোখ তুললেন পুলিসের দিকে। দেখলেন, কঠিন চেহারার এক মাঝবয়েসী অফিসার মিটিমিটি হাসছে। তার পেছনে আরেকজন।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন সেলিম সাহেবের। এই পুলিসটি তাঁর বন্ধু—শাহাদত খান। রমনা থানায় আছেন। ওসি।

হাত বাড়িয়ে দিলেন শাহাদত খান। 'বনানী গেছিলাম একটু, ফিরতি পথে ভাবলাম দেখাটা করেই যাই।...চায়ের তেষ্টা পেয়েছে বেজায়...' বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে পড়লেন শাহাদত খান। তাঁর সঙ্গীটিও।

কাউচে বসতে বসতে শাহাদত খান বললেন, 'খবর শুনেছিস? নাখালপাড়ায় হেদায়েত উল্লাহ নামের এক লোক খুন হলো না পরশু? তার খুনীর হদিস মিলেছে। ব্যাটার নাম—আলমুদ্দিন শরাফী, সবাই ডাকে আলমগীর মিয়া। নীলক্ষেতের পুরানো বইয়ের দোকানদার। কাল রাতে সুইসাইড করেছে। চিরকুটে স্বীকারোক্তিও করে গেছে।...চিকেন হার্টেড ম্যান, ভে-রি চিকেন হার্টেড ম্যান...'

সেলিম সাহেব হার্টবিট মিস করলেন একটা। সামলেও নিলেন চকিতে। বন্ধুর দিকে ঘুরতে ঘুরতে বললেন, 'খালি চা খাবি?'

শামীম হোসেন
[বিদেশী গল্প অবলম্বনে]

চেরনোগ্রাৎসের নেকড়েরা

শীতের সন্ধ্যা। চেরনোগ্রাৎস দুর্গের মূল হলঘরে, আগুনের ধারে জমে উঠেছে আড্ডা। গ্রামের ধারে দুর্গটা কয়েক বছর আগে কিনে নিয়েছেন ব্যারন আর ব্যারনেস গ্রুয়েবেল। ব্যারনেস গ্রুয়েবেলের ভাই কনরাড এসেছে হামবুর্গ থেকে। সময়টা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ, জাঁকিয়ে শীত পড়েছে বাইরে।

'এই দুর্গ সম্বন্ধে কোন কিংবদন্তি চালু আছে?' চেয়ারে হেলান দিয়ে ব্যারনেস গ্রুয়েবেলের দিকে ফিরে জানতে চাইল কনরাড। হামবুর্গের একজন সফল ব্যবসায়ী কনরাড পরিবারের সবচেয়ে রোমান্টিক সদস্য।

কাঁধ ঝাঁকালেন কনরাডের বোন, ব্যারনেস গ্রুয়েবেল। 'এসব পুরানো বাড়িকে ঘিরে অনেক গল্প চালু থাকে। কথা ছড়াতে তো লোকের পয়সা লাগে না। হ্যাঁ, একটা গল্প চালু আছে চেরনোগ্রাৎস দুর্গ নিয়ে। যখন কেউ মারা যায় দুর্গে, রাতের বেলায় জঙ্গলের সব নেকড়ে এসে জড় হয় দুর্গের ধারে, সারারাত ওদের ডাকে চোখের পাতা এক করতে পারে না কেউ।'

'ওহ, দারুণ রোমান্টিক ব্যাপার তো!' কনরাড বলল।

'তবে এটা সত্যি নয়!' কনরাডের কল্পনায় জল ঢেলে দিলেন ব্যারোনেস গ্রুয়েবেল। 'এ জায়গাটা কেনার পর এর প্রমাণ পেয়েছি। গত বসন্তে আমার শাশুড়ি মারা গেলেন, অনেক কান পেতে থেকেও কিছু শুনতে পাইনি আমরা। এসব গল্প বলে রং চড়ায় স্থানীয় লোকেরা, গুজব ছড়াতে তো আর পয়সা লাগে না।'

'কথাটা ঠিক শোনেননি আপনি,' হঠাৎ কথা বলে উঠল পরিবারের প্রবীণ গভর্নেস অ্যামেলি শ্মিট। অবাক হয়ে সবাই চাইল তার দিকে। ছিমছাম, ছোটখাট প্রৌঢ়া অ্যামেলির চুল ধূসর। চুপচাপ বসে থাকে সে তার নিজের চেয়ারে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করলে মুখ খোলে না, আর ভদ্রতা করে কেউ তেমন কিছু জিজ্ঞেসও করে না। 'কেবল চেরনোগ্রাৎস পরিবারের কেউ মৃত্যুশয্যায় পড়লেই নেকড়ের দল আসে দুর্গের ধারে। অনেক দূর থেকে আসে ওরা। জঙ্গলের এদিকটায় মাত্র দু'জোড়া নেকড়ে আছে সম্ভবত, কিন্তু বনরক্ষীরা বলে সেরকম রাতে ডজন ডজন নেকড়ে আসতে থাকে মিছিল করে। দুর্গ আর আশপাশের গাঁয়ের যত খামারের কুকুর আছে, সবকটা ভয়ে আর রাগে চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু নেকড়ের পাল থোড়াই কেয়ার করে ওদের। ঠিক যখন মৃতের আত্মা দেহ ত্যাগ করে, তখন দুর্গের আঙিনার একটা গাছ শব্দ করে ভেঙে পড়ে, আর সাথে সাথেই থেমে যায় নেকড়ের ডাক। বাইরের কোন লোক দুর্গে মারা গেলে এরকম কিছুই হবে না! নেকড়েও ডাকবে না, গাছও ভাঙবে না!'

শেষের কথাগুলোর মধ্যে বেশ কিছুটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। গ্রুয়েবেল পরিবার চেরনোগ্রাৎস দুর্গে বহিরাগত! মোটাসোটা, জমকালো পোশাক পরা ব্যারনেস

অবাক হয়ে গেলেন পরিচারিকার স্পর্ধা দেখে, যে তার এতদিনের ছোট অবস্থান থেকে হঠাৎ মাথা তুলে কথা বলছে।

'তুমি চেরনোগ্রাৎসদের অনেক পারিবারিক ইতিহাস জানো দেখছি, ফ্রাউলাইন শ্মিট,' তীক্ষ্ণ গলায় বললেন ব্যারনেস। 'এ ব্যাপারে তোমার জ্ঞানের বহর সত্যি সাঙ্ঘাতিক।'

কিন্তু খোঁচাটা একদম অন্যরকম ফল দিল। 'কারণ আমি নিজেই ফন চেরনোগ্রাৎস পরিবারের একজন, আমি স্বাভাবিকভাবেই আমার পরিবারের ইতিহাস জানি।'

'তুমি ফন চেরনোগ্রাৎস পরিবারের একজন? তুমি? তুমি?' অবিশ্বাসের সুরে কোরাসে প্রশ্ন করল টেবিলের চারধারের মানুষ।

'আমরা খুব গরীব হয়ে পড়েছিলাম। আমি বাইরে গিয়ে বাচ্চাদের পড়াতাম। শেষ পর্যন্ত আরেকটা নাম নিলাম আমি, অ্যামেলি চেরনোগ্রাৎস থেকে অ্যামেলি শ্মিট। এই ভাল, কেউ চিনবে না আমাকে এই নামে বা টিটকারি দেবে না। তবে আমার দাদা এই দুর্গে ছোটবেলাটা কাটিয়েছেন, বাবার মুখে গল্প শুনেছি আমি। শুনে শুনে চেরনোগ্রাৎসদের সব কাহিনীই আমার মুখস্থ। যখন মানুষের কিছু থাকে না, পুরনো স্মৃতিকে সে খুব ভাল ভাবে আঁকড়ে রাখে। আমি অবশ্য এখানে কাজ নেয়ার আগে জানতাম না আমার পূর্বপুরুষের ভিটেমাটিতে আমি ফিরে যাচ্ছি পরিচারিকা হয়ে, জানলে হয়তো অন্য জায়গায় কাজ নিতাম।'

একদম চুপ হয়ে গেল টেবিলের চারপাশটা। ব্যারনেস গ্রুয়েবেল একটা অন্য প্রসঙ্গে কথা ঘোরালেন। কিন্তু অ্যামেলি কোন এক ফাঁকে নিজের কাজে উঠে যেতেই প্রশ্ন আর অবিশ্বাসে সরব হয়ে উঠল টেবিলের চারপাশটা।

'কী আস্পর্ধা বুড়ির!' ব্যারন গ্রুয়েবেলের ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখগুলো এই নতুন অপমানে আরও বিস্ফারিত দেখাচ্ছে। 'আমাদের টেবিলে বসে আমাদের খেয়েপরে আমাদেরই শেখাচ্ছে! ওর নাম শ্মিট। শুধু শ্মিট, আর কিছুই না। এসব কথা গাঁয়ের চাষীদের কাছ থেকে শুনে আমাদের জ্ঞান দিচ্ছে।'

'আমার মনে হয় আমাদের সহানুভূতি কাজে লাগিয়ে ও একটা কিছু আমাদের কাছ থেকে আদায় করতে চাইছে,' যোগ করলেন ব্যারনেস।

'ওর দাদা সম্ভবত চেরনোগ্রাৎস দুর্গের কোন খানসামা ছিল!' টিটকারির হাসি হেসে ব্যারন যোগ করলেন। 'গল্পের ওই অংশটা সত্যি হলেও হতে পারে।'

হামবুর্গের ব্যবসাদার কনরাড কিন্তু কিছু বলেনি। চেরনোগ্রাৎস পরিবারের কথা বলতে গিয়ে অ্যামেলির চোখে পানি দেখতে পেয়েছে কনরাড, তার ধারণা পরিচারিকা সত্যি কথাই বলছে।

'নববর্ষের হৈ-হুল্লোড় মিটলেই ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়ে দেব আমি অ্যামেলিকে।' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যারনেস। 'নইলে একা একা সব ঝামেলা সামলানো সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ঝামেলা একা একাই সামলাতে হলো ব্যারনেসকে। বড়দিনের পরে শীত এমন ভয়াবহ তীব্র হয়ে উঠল যে অসুস্থ হয়ে বিছানা নিতে হলো প্রৌঢ়া পরিচারিকা অ্যামেলিকে।

'আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা করছে ও,' বললেন ব্যারনেস। উনত্রিশে ডিসেম্বর রাতে আগুনের ধারে অতিথিদের সাথে বসে আছেন তিনি। 'আমাদের সাথে এতদিন আছেন, কিন্তু কখনও ওঁকে অসুস্থ হতে, মানে ঠিক অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়তে দেখিনি। অবশ্যই আমরা ওঁর জন্য দুঃখিত। বেচারাকে দেখলে মায়া হয়। কিন্তু এখন বাড়িভর্তি এতগুলো মানুষ, এত কাজ, সাহায্য করার বাড়তি একজন থাকলে...'

'খুব খারাপ কথা।' সহানুভূতির সাথে মাথা নাড়লেন এক অভ্যাগত ব্যাংকারের স্ত্রী। 'কিন্তু আসলে এই ঠাণ্ডায়ই কাবু হয়ে পড়েছে ও। এত ঠাণ্ডা বুড়ো মানুষের সহ্য নাও হতে পারে। সত্যি এবছর ভীষণ শীত পড়েছে।'

'ডিসেম্বর মাসের রেকর্ড তুষারপাত,' ব্যারন বললেন।

'আর বয়সও হয়েছে ওর,' ব্যারনেস যোগ করলেন। 'ওকে কয়েক সপ্তাহ আগেই বিদায় করা উচিত ছিল আমার, তা হলে বেঁচে যেতাম আমরা। ওয়াপি? ওয়াপি কী হয়েছে তোমার?' শখ করে পোষা লোমশ ছোট্ট কুকুরটার দিকে ঝুঁকে বললেন ব্যারনেস। সারাদিন কোলেই থাকে ওয়াপি।

ওয়াপি তার কুশন ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে সোফার নীচে ঢুকল লেজ গুটিয়ে। সাথে সাথেই শোনা গেল দুর্গের সবগুলো প্রহরী কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন, এর সাথে যোগ দিল গাঁয়ের সব কুকুর।

'কী দেখে এত ভয় পাচ্ছে ওরা?' জানতে চাইলেন বিরক্ত ব্যারন।

উপস্থিত মানুষগুলোর কানেও আওয়াজটা পৌঁছাল যা শুনে কুকুরগুলোর এই উত্তেজনা। বাতাসে ভেসে এল অনেক প্রাণীর কাঁপা কাঁপা, বিলাপের মত দীর্ঘ প্রলম্বিত ডাক। এক জায়গায় থামলে আরেক জায়গায় শুরু হয় আওয়াজটা। মনে হয় এই শীতে জমে যাওয়া দুনিয়ার সব দুঃখ, সব বিষাদ যেন মিশে আছে এই শব্দের ভিতরে।

'নেকড়ে!' চমকে উঠে বললেন ব্যারন।

'শত শত নেকড়ে!' বলে উঠল কনরাড। একটু রোমান্টিক স্বভাবের বলে অনেক কিছুই বাড়িয়ে বলে সে।

হঠাৎ কী মনে করে ব্যারনেস উঠে গেলেন অতিথিদের ছেড়ে। সোজা অ্যামেলির ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি, সেখানে বুড়ো পরিচারিকা বিছানায় শুয়ে। হাড় কাঁপানো শীত সত্ত্বেও জানালাটা হাট করে খোলা, কনকনে হাওয়া ঢুকছে সেখান দিয়ে। অস্ফুট শব্দ করে ব্যারনেস ছুটে গেলেন জানালাটা বন্ধ করতে।

'ওটা খোলা রাখো,' দুর্বল গলা অ্যামেলির, কিন্তু কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট আদেশের সুর শুনে থেমে গেলেন ব্যারনেস।

'ঠাণ্ডায় মরে যাবে তুমি, আমেলি,' প্রতিবাদ করলেন গৃহকর্ত্রী।

'এমনিতেই মারা যাচ্ছি আমি,' জবাব দিল শয্যাশায়ী পরিচারিকা। 'শেষবারের মত আমি ওদের ডাক শুনতে চাই। অনেক দূর থেকে ওরা এসেছে। নেকড়ের ডাক, চেরনোগ্রাৎস পরিবারের মৃত্যু-সঙ্গী। আমাকে বিদায় দিতে এসেছে ওরা।'

দুর্গের বাইরে নেকড়ের ডাক এক পর্দা চড়ল, বিলাপের তীক্ষ্ণতা যেন বাতাসকে চিরে ফেলবে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অ্যামেলির মুখে অপ্রত্যাশিত সুখের ছোঁয়া দেখতে পেলেন ব্যারনেস। 'চলে যাও তুমি,' বলল সে কর্ত্রীকে। 'আমি আর একা নই, আমি এখন বিশাল এক পরিবারের সদস্য।'

'আমার মনে হয় ও মারা যাচ্ছে,' বৈঠকখানায় এসে অভ্যাগতদের জানালেন ব্যারনেস। 'মনে হয় আমাদের ডাক্তার ডাকা দরকার। ওহ্, কী ভয়াবহ আওয়াজ! কোটি টাকা দিলেও এমন "বিদায়-সঙ্গীত" শুনতে চাইব না আমি।'

'পয়সা দিয়ে শোনা যায় না এমন কোরাস,' রোমান্টিক কনরাড তার মত দিল, তন্ময় হয়ে নেকড়ের পালের ডাক শুনছে সে।

'ওটা কীসের শব্দ?' চমকে উঠে বললেন ব্যারন গ্রুয়েবেল। 'কান পেতে শোনো সবাই!' একটা কিছু ভেঙে ধসে পড়ার আওয়াজ পেল সবাই।

কর্কশ শব্দে ভেঙে পড়ল দুর্গের পার্কের একটা গাছ। প্রায় সাথে সাথে থেমে গেল নেকড়ের ডাক।

'ও কিছু না!' বললেন ব্যাংকারের স্ত্রী। 'ঠাণ্ডায় কাঠ ফেটে গাছ ভেঙে পড়ে। এই ঠাণ্ডাই নেকড়ের পালকে নিয়ে এসেছে। অনেক বছর এমন ঠাণ্ডা পড়েনি তো!'

ব্যারনেস সায় দিলেন দ্রুত, ঠাণ্ডার জন্যই এসব ঘটছে।

ডাক্তার আসার পর জানা গেল ঠাণ্ডার কারণেই অ্যামেলি হার্ট ফেল করে মারা গেছে।

মূলঃ সাকি
রূপান্তরঃ নাঈম আশরাফ

রাক্ষুসে গাছ

১২ অক্টোবর, রাত ১১টা

বিশাল দুটো আশা পূর্ণ হওয়ার এদিনটা আমার কাছে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটা হলো, আজ ভোরে আমার ড্রেসিং গাউনের রশি দিয়ে আমার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছি। ওর লাশটা কবর দিয়েছি আমার সবচেয়ে বড় কাচের ঘরে সংরক্ষিত গাছপালার বাগানটায়। কাজটা শান্তভাবে করতে পেরেছি ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে। এর মধ্যে আবেগের কোন ব্যাপার নেই। মেডিকেলের ছাত্রদের কাছে ব্যাঙের দেহ ব্যবচ্ছেদের চেয়ে ওটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি, বরং মজাই লাগছিল, বিশেষ করে এই কারণে যে এর মধ্যে নতুনত্বের আমেজ ছিল। ফ্রান্সেসকেও কম ভুগতে হয়েছে, কারণ সে খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার চোখদুটো যেভাবে ঠেলে বেরিয়ে আসছিল এবং জিভটা বেরিয়ে পড়েছিল তা দেখে কৌতূহল বোধ করেছিলাম। কী দারুণ প্রতিক্রিয়া। মৃত্যুর পরও কয়েক মিনিট তার হাত-পা ঝাঁকি খেতে লাগল, যন্ত্রণায় মোচড় খেলো শরীরটা। এসব খিঁচুনি এতটা নিবিষ্ট মনে দেখছিলাম যে, যখন সেটা বন্ধ হলো, খারাপ লাগল খুব।

স্বীকার করছি আমার ছ'বছরের বিবাহিত জীবনটা ব্যর্থ হয়েছে। সন্দেহ নেই, এতে আমারও কিছু দোষ ছিল। আসলে বিয়ে করাটাই আমার উচিত হয়নি। এখন বুঝতে পারি প্রেমে পড়াটাও কত ভুল ছিল। সব সময় কাজের মধ্যে থাকতে চেষ্টা করেছি আমি, আর তাতে চূড়ান্ত দক্ষতা অর্জন করেছি। তাই একটুও আবেগের বশবর্তী না হয়ে ফ্রান্সেসকে যেভাবে খুন করার কাজটা সম্পন্ন করেছি তাতে নিজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।

ফ্রান্সেস ছিল ছোটখাট, সুন্দরী। মুখটা সাদা ফুলের মত, আর বাহুদুটো জড়িয়ে থাকা লতার মত। আমাদের বিয়েটা তার বা আমার—দুজনের জন্যেই দুঃখজনক। তাই আমি যা করেছি তা আমাদের দুজনের জন্যে সুখের হয়েছে।

ফ্রান্সেসের মৃত্যু হওয়ায় এখন খুব কম খরচেই জীবন যাপন করতে পারব আমি, তা ছাড়া আমার কাজেও কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। এই দোষটা ফ্রান্সেসের মধ্যে খুব বেশি ছিল। সব সময় কোথায় কোন উৎসব হচ্ছে সেদিকে মন থাকত। এমন নয় যে আমি তার সঙ্গে যেতাম, বাড়িতে যখন থাকত তখনও আমার সঙ্গে বিশেষ দেখা হত না। উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গবেষণাতেই আমি ডুবে থাকতাম। কিন্তু আমার এই কাজে প্রচুর টাকা লাগে। উত্তরাধিকারসূত্রে চাচার কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম তা শেষ হয়ে গিয়েছিল ফ্রান্সেসের অপচয়ে। এজন্যে অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছ কেনার সামর্থ্য আমার ছিল না। তা ছাড়া যেখানে আমি গাছগুলোকে রাখতাম, অর্থের অভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণের ভাল ব্যবস্থাও করতে পারতাম না। যে লোকের স্ত্রী পুরো গ্রীষ্মে লণ্ডনে আর শীতে রিভিয়েরাতে আমোদ-প্রমোদ করে

কাটায়, বছরে হাজার পাউন্ড তার সংসারের কাছে খুব একটা বেশি নয়।

আজকের দ্বিতীয় ঘটনা হলো আর্মাণ্ড গত জুলাইয়ে আমাজন থেকে যে দুটো বড় লতার বীজ এনেছিল তা হাতে পাওয়া। ইংল্যাণ্ডে ফিরেই সে আমাকে বীজটা দেখিয়েছিল। দেখতে কালো আখরোটের মত। সে বলেছিল লতাটা যখন পুরোপুরি বড় হবে তখন বিশাল হয়ে উঠবে। আর এটা একেবারে নতুন প্রজাতির। তার মুখে গাছটার বিশিষ্টতার কথা শুনে বীজটা কেনার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল সে, তবে একটু আভাসও দিয়েছিল যে তার টাকার দরকার ছিল বলে একটা বীজ সে এক লোকের কাছে পঞ্চাশ পাউণ্ডে বিক্রি করেছে, আর সেই লোকটা অন্য বীজটাও একই দামে কিনতে আগ্রহী। সে দুটোর বেশি আনতে পারেনি। ব্যাখ্যা দিল, বীজদুটোর বিনিময়ে তার তিনটে ছেলে জীবন হারিয়েছে। বুঝতে পারলাম না কেন সে তিনটে নিগ্রোছেলের জীবনের দাম একশো পাউণ্ড ধরল; তারা তো তার সম্পত্তি ছিল না, তবে ধারণা করলাম তাকে হয়তো অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল।

তখন হাতে টাকা ছিল না—সেটা ফ্রান্সেসের কারণে—তাই আর্মাণ্ড কথা দিয়েছিল অক্টোবরে যখন আমি ষান্মাষিক ভাতা পাব, সে পর্যন্ত আমার জন্যে বীজটা রেখে দেবে সে। তবে সতর্ক করে দিল, যদি তখন বীজটা কিনতে না পারি তা হলে অন্য জায়গায় সেটা বিক্রি করে দেবে।

যখন টাকাটা হাতে এল, আমার লেডি ফ্রান্সেস ঘ্যানঘ্যান শুরু করে দিল, বাৎসরিক প্রমোদ বিহারে সে রিভিয়েরায় যাবে। মুখে সম্মতি দিলেও মনে মনে ঠিক করলাম তার টাকা গেলার অভ্যাসটা চিরদিনের মত বন্ধ করে দেব।

আজ সকাল সাড়ে ছটায়, ফ্যান্সেসকে নির্বিঘ্নে কবর দেবার পর গাড়ি নিয়ে লণ্ডনে গেলাম। এত সকালে বের হবার উদ্দেশ্য ছিল দুটো। আর্মাণ্ড একটা সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে ব্রাসেলস্-এ রওনা হবার আগে তাকে ধরতে চেয়েছিলাম, আর আমি চাইনি প্রতিবেশীরা জানুক যে ফ্রান্সেস আমার সঙ্গে নেই। আমি এমন ভাব করতে লাগলাম যেন ফ্রান্সেস রিভিয়েরা যাচ্ছে, আর তাই আমি তাকে শহরে পৌঁছে দিচ্ছি। প্রমোদ ভ্রমণে যাবার সময় আমার অবস্থা দেখে লোকজনের সামনে সে বিকৃত আনন্দ পেত, ওদের মুখে ঈর্ষা দেখে সে খুশি হত।

চাকর বাকরেরা গতকাল চলে গেছে। রয়েছে শুধু বাইরে কাজের লোকটা। কয়েকদিন ছুটির পর আগামী সপ্তাহে ফিরবে সে। তার বৌ সপ্তাহে একদিন এসে ঝেড়ে মুছে দিয়ে যাবে। ফ্রান্সেস যখন চলে যায় তখন এ রকম ব্যবস্থাই হয়। তাই কারও কাছে কোন কিছু অস্বাভাবিক লাগবে না। এক সপ্তাহ গেলে আমি প্রচার করব যে ফ্রান্সেসের কাছ থেকে কোন খবর পাইনি, তখন পুলিশ তাদের ইচ্ছে মত ডোভারে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করুক। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে ফ্রান্সেস ডোভারে যায়নি। এমনকী দক্ষিণের রেলওয়ে টিকেট কালেক্টরও শপথ করে বলতে পারবে না সে যায়নি।

আমি গাড়ির ইঞ্জিনে বেশি শব্দ করে চালাতে শুরু করলাম, যাতে গ্রামবাসীরা বিছানায় বলাবলি করতে পারে, 'ওটা ট্রেজবণ্ড আর তাঁর স্ত্রী, লণ্ডনে যাচ্ছেন।' তারপর কোন উৎসাহ না দেখিয়ে আবার নাক ডেকে ঘুমাতে শুরু করে।

যখন চেলসির ওকলি স্ট্রীটে আর্মাণ্ডের বাড়িতে পৌঁছলাম, এক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল। ওটা আমার স্নায়ুকে সতর্ক করে দিল। দরজাটা লাল-ঝকঝকে রং করা, কোন দাগ নেই সেখানে। সবে বেলটা বাজাতে যাচ্ছি—এমন সময় দুটো ডিম্বাকার অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেলাম। ছায়াদুটো ক্রমেই ঘন হতে লাগল। যখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল ওগুলোকে দেখাল আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে মেলে থাকা চোখের মত। পনেরো সেকেণ্ড পরে ওগুলো মিলিয়ে গেল। দৃষ্টিভ্রম, সন্দেহ নেই।

বীজটা আমাকে দেবার ব্যাপারে আর্মাণ্ড আগ্রহী বলে মনে হলো না, এমনকী তাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড দেখানো সত্ত্বেও। জানতে চাইলাম কেন সে ইতস্তত করছে। মুখটাকে লম্বা করে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'মানে,' সে বলল। 'যে বীজটা আমি অন্য লোককে বিক্রি করেছিলাম...সেটা বড় হয়েছিল।'

'বড় হবে এটাই স্বাভাবিক,' উত্তর দিলাম আমি। 'না হলেই আশ্চর্য হতাম।'

'আহ্, কিন্তু কী সাঙ্ঘাতিক ভাবেই না বেড়েছিল। কাচের ঘরের বাগানটা পুরোপুরি দখল করে ফেলল, তারপর দেখা গেল ওই জায়গাও তার জন্যে ছোট হয়ে গেছে। কাচ ভেঙে বেরিয়ে পড়েছিল ওটা। তারা ওটাকে কেটে ফেলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাতে ওটার বৃদ্ধি আরও দ্রুত হয়ে উঠেছিল। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিল গাছটাকে শেকড়সুদ্ধ খুঁড়ে উপড়ে ফেলবে, কিন্তু মনে হলো ওটার শেকড় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত সালফিউরিক এসিড দিয়ে ওটাকে তারা মারতে পারল। সাধারণ আগাছা ধ্বংস করার ওষুধে কাজ হয় না।'

'কিন্তু ওটাকে মারল কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

তার ভয় পাওয়া দেখে ব্যঙ্গ করলাম আমি, খুলে বলতে বললাম সব কিছু। উঠে গিয়ে আলমারি থেকে বীজটা নিয়ে এল সে, বসল আগুনের পাশে। জিনিসটার দিকে এত দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল যে বিরক্ত হলাম। তারপর মাথা নাড়ল সে, বীজটা আগুনে ছুঁড়ে ফেলতে গেল। সামনে ঝাঁপিয়ে জোর করে বাধা দিলাম তাকে।

সাথে সাথেই আবার এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। (আমাকে সাবধান হতে হবে)। কোথা থেকে একটা হাত উদয় হলো। একটা ছোট, সুডৌল নারীর হাত। আঙুলের নখের নীচে বাদামী রং, যা মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরে মানুষের মাংসে দেখা যায়। হাতটা আর্মাণ্ডের হাতটাকে আগুন থেকে আমার দিকে ঠেলে দিল, তারপর আর্মাণ্ডের আঙুলগুলো জোর করে খুলে দিতেই বীজটা আমার হাতের তালুতে পড়ল। অদ্ভুত হাতটা উধাও হয়ে গেল।

'অবাক ব্যাপার, আমি যখন ওটা পোড়াতে যাচ্ছিলাম, কে যেন ওটাকে আমার কাছ থেকে তোমার হাতে দিল,' বলল সে।

টাকাটা দিয়ে আমি যাবার জন্যে উঠলাম। সত্যি বলতে কী, একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। চলে আসার আগে আর্মাণ্ড আর একটা কথা বলল:

'কোন বাচ্চাকে-পাড়াপড়শীর বাচ্চাকে-তোমার ওখানে যেতে দাও?'

'না,' তাকে বললাম আমি।

'ভুলেও দিও না,' আমাকে সতর্ক করল সে। 'তোমার তো একজোড়া কুকুর আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। তারাই আমার একমাত্র বন্ধু।'

সহানুভূতির সঙ্গে মাথা নাড়ল সে, 'জানে আমার স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্ক কতটুকু।'

'ওটা থেকে কুকুরদের দূরে রেখো,' যে পকেটে বীজটা রেখেছিলাম সেদিকে তর্জনী তাক করে বলল সে।

১৩ অক্টোবর, রাত ৩টা

ঘুমোতে পারছি না। আশা করি আমার স্নায়ুগুলো পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে না। দিনের ডায়েরী লেখা শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিছানায় গিয়েছিলাম। ক্লান্ত থাকায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সাথে সাথে। বিছানায় হঠাৎ করে ভয়ানক আলোড়ন অনুভব করে জেগে উঠলাম। আমার পাশে কিছু একটা, দেখতে মরামানুষের মত, যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে, শ্বাসরোধ হলে যেরকম শব্দ হয় সেরকম শব্দ হচ্ছে। সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম। তখন রাত ঠিক দেড়টা। বিছানার চাদরগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। সন্দেহ নেই—আমার ছটফটানির কারণে। আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। আবার চেষ্টা করলাম ঘুমোতে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। থেকে থেকে শরীরে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেতে লাগল। কাঁপন অনুভব করলাম আমি। অবশেষে উঠে পড়লাম। বসলাম ডায়েরী লিখতে—নেহাৎ কিছু একটা করার জন্যে। মুক্তি পাব দিনের আলো ফুটলে। তখন কাজ করতে পারব। ঠিক করলাম লতার বীজটা লাগাব আমার সবচেয়ে বড় কাচের ঘরের বাগানটায়, যাতে ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারে। ওখানে আমার স্ত্রী রয়েছে—কিন্তু সেসব আমাকে ভুলে যেতে হবে। আর্মাণ্ডকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলে হত কী ধরনের মাটিতে বীজটা বেড়ে উঠেছিল, অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকার ভূতত্ত্ববিষয়ক অধিদপ্তরে খোঁজ করলে জানা যাবে। এ বিষয়ে একটা বইও আমার কাছে আছে।

১৪ অক্টোবর, ভোর ৪.৪৫ টা

তিনঘণ্টা ধরে আমি হেঁটেছি, আর মাঝেমাঝে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিয়ে এই ঘৃণ্য কাঁপুনি বন্ধ করার চেষ্টা করেছি। এসব কিছুই স্নায়ুঘটিত। অবশ্যই। গতরাতে ডায়েরী লিখিনি। ভেবেছিলাম লিখতে গেলে উত্তেজনায় ঘুমোতে পারব না। তবে রাত দেড়টা পর্যন্ত ভালভাবেই ঘুমোলাম। তারপরে আগের মত শুরু হলো অশান্তি। সেই যন্ত্রণায় শরীর মোচড়ানো আর দম বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। তবে এর সাথে যুক্ত হলো আমার পাশে একটা শরীরের অদৃশ্য উপস্থিতি। জীবিত শরীরের মত ওটা গরম নয়। ঠাণ্ডা। সেখান থেকে নির্গত হচ্ছিল এক বিশ্রী গন্ধ। যখন আলো জ্বাললাম, দেখলাম কিছুই নেই।

যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম, গতকাল সকালে সেভাবেই বীজটা লাগালাম। যখন কাজটাতে ব্যস্ত ছিলাম, আমার স্নায়ু আমাকে ধোঁকা দিল। স্পষ্টভাবে শুনতে

পেলাম নারী কণ্ঠের চাপা হাসি, একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি আমার মগজে খোঁচা দিল। এই অনুভূতি ক্রমে ভারি হয়ে চেপে বসতে লাগল আমার বুকের উপর।

১৮ অক্টোবর

বিছানায় গিয়ে লাভ নেই। পড়তে বসলাম যাতে এই ব্যাপারগুলো ভুলে থাকতে পারি, আর ইচ্ছে করলে চেয়ারে বসেই ঝিমোতে পারি। না ঘুমানোর পরে সেই বিচ্ছিন্ন, স্বপ্নের জগতে বাস করতে লাগলাম। সামান্য শব্দে আমার স্নায়ুগুলো বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠতে লাগল। জানি না কুকুর দুটোর কী হয়েছে। অবিরাম চিৎকার করে যাচ্ছে। খাবার খেতে চাইছে না, হাড্ডিসার হয়ে উঠেছে, চোখ দুটোতে ফুটে উঠেছে বুনো দৃষ্টি। এখন আমার কোন কিছুতেই স্বস্তি নেই। মাঝে মাঝে কুকুরগুলো আধ পাগলের মত বাতাসে অদৃশ্য কিছু দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে।

আমি একা থাকতে চাই। কারও সঙ্গে দেখা করার কথা মনে হলে আমার সমস্ত স্নায়ু কাঁপতে থাকে, বুক ধড়ফড় করে। জানি, এসবই বোকামি, তবু কাজের লোকটা ও তার স্ত্রীর ফিরে আসার দিন ঘনিয়ে এলে আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আরও বেশিদিন ছুটি কাটানোর জন্যে ওদের লিখে জানালাম। সেই সঙ্গে পাঠালাম মোটা টাকার একটা চেক।

১৯ অক্টোবর, রাত ১১টা

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কৌতূহলী কিছু পাঠানোর জন্যে যা নিয়ে চিন্তা করা যায়। আজ সকালেই মাটির উপর চারাটা গজিয়েছে। চিন্তাও করিনি এত তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে। বিটমূলের কাণ্ডের মত ওটা গাঢ় লাল আর সবুজ।

না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নিজেকে খুব বোকা মনে হচ্ছে। সকালে ধাক্কা লেগে একটা বিশেষ ধরনের দামী ক্যাকটাসের পাত্র পড়ে গেল, মাড়িয়ে ফেললাম সেটা। তারপর থেকে সারাদিন পায়ের যন্ত্রণায় ভুগছি। ওখানে কী ছিল কে জানে। রাতে জুতো খোলার সময়ই লক্ষ করলাম ওগুলো উল্টো পরেছিলাম। সবকিছুকেই ঘিরে যেন বিষাদ আর হতাশার ভাব বিরাজ করছে। কুকুর দুটোও মারা যাচ্ছে। আজরাতে বিছানায় যাব। আমাকে কিছুক্ষণ ঘুমোতে হবে। কী ঘটে না ঘটে—চুলোয় যাক।

২০ অক্টোবর, রাত ২টা

ঈশ্বর, আর সহ্য করতে পারছি না। রাত দেড়টার সময় আবার একই ঘটনা শুরু হলো, একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কিন্তু তিনি আবার আমাকে একজন মনোবিশ্লেষকের কাছে পাঠাবেন। এরা মস্ত চালাক, কারও গোপন সবকিছুই টেনে বের করে আনেন।

আলো জ্বেলে রেখেই ঘুমোতে গিয়েছিলাম। বেশ আরামেই ঘুমোচ্ছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমার ঘাড় ও বালিশের মাঝখানে একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল। আর তখনই পচা মাংসের গন্ধ পেলাম। বমি এসে গেল।

দেখলাম ফ্রান্সেস আমার পাশে শুয়ে, একটা চটচটে বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে আমাকে। তার নীলচে-বাদামী মুখের দুটো কাচের মত চোখ তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। হাত দিয়ে ঠেলে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাইলাম ওর মুখটা। চামড়া ঠাণ্ডা আর ভেজা। আমার চাপে ওটা ডেবে গেল, মনে হলো একটা পানি ভর্তি ব্যাগ। মাথাটা কুঁকড়ে শক্ত হয়ে গেল। তারপর কালো হতে লাগল, যতক্ষণ না ওটা দেখতে লতার বীজটার মত হলো। আর আমার চোখের সামনে তার সমস্ত শরীর লালচে সবুজ জট পাকানো লতার স্তূপের মত হয়ে উঠল। এরপর, আচমকা জিনিসটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর আমি বিছানায় যাব না, এই সব দৃষ্টি ভ্রমের বিষয়গুলো আর লিখব না। এসব নিয়ে আর চিন্তাও করব না।

একই দিন, রাত ১১টা

আজ সকালে যখন কাচের ঘরের বাগানটায় গিয়েছিলাম, দেখলাম গতকালের চারাটা এরমধ্যেই কুড়ি ইঞ্চি লম্বা হয়ে উঠেছে, আর তাতে তিনজোড়া পাতা গজিয়েছে, এক একটার ব্যাস চায়ের ট্রে-র মত। এগুলো থেকে লতা তন্তু বেরিয়ে এসে সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে ফেলেছে। দিনের মধ্যেই সেটা আরও আট ইঞ্চি বড় হলো। ঠিক করলাম দিনে দুবার ওটার বেড়ে ওঠার মাপ নেব।

২৪ অক্টোবর, দুপুর

আর্মান্ড যে আভাস দিয়েছিল নিশ্চয় তার একটা অর্থ ছিল। এই লতার আচরণ আমার ভাল লাগছে না। ইতিমধ্যে সর্বগ্রাসী দানবের মত ওটা বাগানের অর্ধেকের বেশি জায়গা গ্রাস করেছে। সকালবেলা গিয়ে দেখি অত্যন্ত দামী কিছু চারাগাছ উল্টে পড়ে আছে, আর অনেকগুলো পাত্র ভাঙা। প্রথমে মনে হয়েছিল, হয়তো কোন বেড়ালকে ভুল করে ভেতরে রেখে দরজা বন্ধ করেছিলাম কিন্তু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখার পর বুঝতে পারলাম এই ধ্বংসযজ্ঞের হোতা ওই লতাটা। এর তন্তুগুলো চারাগাছগুলোকে পেঁচিয়ে ধরে মাটি থেকে টেনে উপড়ে তুলেছে। তন্তুগুলো তারের মত। লতাটাকে না ভেঙে চারাগাছগুলো মুক্ত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তন্তুগুলো এমন শক্ত করে আঁকড়ে আছে যে আমাকে তা কাটতে হলো। আর তা যখন করলাম সমস্ত চারাগাছ আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত মোচড় দিয়ে উঠল আর কাটা প্রত্যঙ্গগুলো থেকে জমাটবাঁধা রক্তের মত ঘন তরল পদার্থ নির্গত হতে লাগল। বিকট দুর্গন্ধে আমার বমি এল। টাটকা বাতাসের খোঁজে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে গেলাম। তারপর বাগানের অন্যসব চারা সরিয়ে ফেললাম যাতে লতাটার জায়গার অভাব না হয়।

আমার বেচারা প্রিয় কুকুর, ট্রিক্সির জন্যে শংকিত হয়ে পড়লাম। ওকে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না। আমি কাছে গেলে সে ভয় পায়, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় আর সবকিছুই কামড়াতে চায়। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে সে।

২৯ অক্টোবর

বিকট জট পাকানো অবস্থায়, অসমভাবে বাড়তে বাড়তে লতাটা বাগানের সমস্ত

জায়গা দখল করে এখন দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। এটা এখন পুরোপুরি কালো হয়ে উঠেছে, শুধু কয়েকটা শিরা আর তন্তু ছাড়া। ওগুলোর রং গাঢ় মেরুন। এতে কুঁড়িও দেখা দিয়েছে। ভাল হত যদি মন থেকে ব্যাপারটা মুছে ফেলতে পারতাম।

৩১ অক্টোবর

প্রথম ফুলগুলো সম্পূর্ণ ফুটে উঠেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এক একটা ডিনার প্লেটের মত বড়, কেন্দ্রটা কালো, দেখলে মনে হয় মৃতের চোখের মত তাকিয়ে আছে।

২ নভেম্বর, দুপুর ২টা

আজ সকালে লতাটাতে পানি দিতে গিয়ে একটা খস খস শব্দ কানে এল—শব্দটা আসছিল গাছটার সমস্ত শরীর আর ফুল থেকে। ফুলের সংখ্যা এখন কয়েক ডজন—তাদের জ্বলন্ত কালো চোখ আমার দিকে ফেরানো। মেঝের উপর শুয়ে থাকা লতাটার তন্তুর জালের ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়ে গোড়ায় কিছু পানি দেবার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকেছি, এমন সময় লতাটার ঠাণ্ডা তন্তু আমার ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল, তারপর পেঁচিয়ে ধরল ঘাড়টা। জিনিসটার ছোঁয়া লাগলে এমন ঘৃণা জাগল যে ওটাকে আঘাত করলাম, ফলে একটা ফুলের ডাল ভেঙে গেল।

জানি না কেউ বিশ্বাস করবে কিনা, গাছ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে। এই লতা গাছটা সেরকম উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। রাগে কেঁপে উঠছিল সমস্ত শরীর। এমন ভাবে দুলতে লাগল ও শব্দ করতে লাগল যেন প্রচণ্ড ঝড় বইছে। তন্তুগুলো এগোতে লাগল আমার দিকে, যেন জালে জড়িয়ে ফেলবে আমাকে। সাদা ফুলগুলো এমনভাবে জ্বলজ্বল করতে লাগল যেন বর্ষণ করছে ঘৃণা। আমি এখানে এলেই ধূমপান করি, এই ধোঁয়ায় কিছু কিছু পোকা মরে যায়। একটা শক্ত তন্তু আচমকা আমার পাইপ জড়িয়ে ধরল, তারপর এমন জোরে মুখ থেকে টেনে নিল যে একটা দাঁত খসে পড়ল।

বালতিটা ফেলে দিলাম আমি, লাফাতে লাফাতে দরজার দিকে এগোলাম। ক্রুদ্ধ তন্তুগুলো ছুটে এসে তীব্রভাবে আক্রমণ করল আমাকে, ফেলে দেবার চেষ্টা করল, বারবার আঘাত করতে লাগল আমার মুখে। জুতোর তলায় মাড়াতে সেই দড়ির মত পুরু ডাল এমন প্যাচপেচে শব্দ করে উঠল যেন কাদার মধ্যে পা দিয়েছি। অসহ্য দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল। ভাবছি কিছু পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেব কিনা।

একই দিন, রাত ১১টা

নিজের বাড়িতেই আমি বন্দী। বিকেলে চা খাবার সময়ে কাচ ভাঙার শব্দ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গেলাম ব্যাপারটা দেখতে। দেখলাম, ভয়ে পালিয়ে আসার সময় যে বালতিটা ফেলে এসেছিলাম সেটা দিয়ে ঘরটার কাচে আঘাত করে

চলেছে লতাটা। কিছু তক্তা, একটা হাতুড়ি ও পেরেক নিয়ে এগোলাম ফাটলটা বন্ধ করতে। কাজটা করতে যাচ্ছি, এমন সময় গাছটা আমার হাত ও মুখে এমন জোরে আঘাত করল যে আমাকে চলে আসতে হলো। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছটা সমস্ত বাগান ছাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়তে লাগল।

কুকুরগুলোর চিৎকার শুনতে পেলাম। লতাটা ধরে ফেলেছে ওদের। তন্তুগুলো দিয়ে আঁকড়ে ধরে শ্বাসরোধ করে মারতে চাইছে। ওদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমাকে শত্রু মনে করে ওরা উল্টো খুনী গাছটাকে সাহায্য করল। বিশ্রীভাবে কামড় দিল আমার হাতে। শেষপর্যন্ত গাছটা কুকুর দুটোকে মেরে ফেলল, তারপর মানুষের মত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল। শয়তানের মত ঘৃণাভরে মনোযোগ দিল আমার দিকে। তার জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। বোকার মত কাজের লোকটাকে আরও বেশি ছুটি দিয়েছি ভেবে দুঃখ হলো। তা না হলে সে আজ এখানেই থাকত। এই জিনিসের সাথে একা আমি লড়াই করতে পারব না।

৩ নভেম্বর, রাত ৩টা

এই মাত্র উপরে উঠে এলাম। শোবার ঘরটা বন্ধ করে দিয়েছি। সবে পড়তে শুরু করেছি, এমন সময় জানালায় আস্তে করে টোকা দেবার শব্দ শুনলাম। ভিজে আঙুল কাচে ঘষলে যেরকম শব্দ হয় ঠিক সেরকম অদ্ভুত শব্দ। বইটা নামিয়ে রেখে জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরালাম। তাকালাম বাইরে। অসংখ্য ভয়ঙ্কর ফুল কাচের ভেতর দিয়ে শয়তানের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর দেখলাম বাতাসে কী যেন একটা ছুঁড়ে দেয়া হলো। পরক্ষণেই অর্ধেক ইঁট কাচ ভেঙে ঘরের ভেতরে এসে পড়ল। গাছটা হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল।

আমার পিছু নিয়েছে ওটা। দরজার বাইরে তার খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সরু লতা কালো সাপের মত বুকে ভর দিয়ে দরজার নীচ দিয়ে আসছে...

সাথেসাথেই দরজার কাছে গেলাম আমি। কালো লতার তন্তুগুলো যেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকছে ওখানে পৌঁছে পায়ের তলায় পিষতে লাগলাম। কিন্তু তাজা তন্তু এসে তাদের জায়গা দখল করল, আর এগোতে লাগল আমার দিকে। জানালা দিয়ে ওগুলো আসতে শুরু করল। ফায়ার প্লেসের ভেতর দিয়েও আসছে। ঠাণ্ডা তন্তুগুলো আমার ঘাড় স্পর্শ করল। কী বিশ্রী গন্ধ!

তারা আসছে...সব দিক দিয়েই ঘিরে ফেলছে আমাকে, এই সব মৃত্যুর জাল...ওরা আমার বেড় দিয়ে ঘিরে ফেলেছে...

(এখানেই ডায়েরী শেষ। এরপর আর্মাণ্ডের একটা নোট)

ব্রাসেলস থেকে অল্প কয়েকদিন পর লণ্ডনে ফিরেই আমি ট্রেজবণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ওর ব্যাপারে আমার কিছুটা উদ্বেগ ছিল। শেষবার যখন দেখেছিলাম, ওকে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

নভেম্বরের তিন তারিখ খুব ভোরে আমি তার বাড়িতে পৌঁছলাম, রওনা দিয়েছিলাম রাতের ট্রেনে। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম যে এত ভোরে ট্রেজবণ্ডকে বিছানায় দেখতে পাব। যখন বাড়িতে পৌঁছলাম দেখলাম শোবার ঘরে আলো

জ্বলছে। কিন্তু অনেকবার কড়া নেড়েও কোন সাড়া পেলাম না। তখন গেলাম বাড়ির পেছনটায়। দূরের পাহাড়গুলোতে তখন ভোরের প্রথম আলো দেখা দিচ্ছে। সেই আলোয় বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম একটা বাগান সম্পূর্ণ ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। পড়ার ঘরের জানালাটাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। একটা নরম, ভারি জিনিসের উপর হোঁচট খেলাম। দেখলাম ট্রেজবণ্ডের কুকুর ওটা, পাশ ফিরে মরে পড়ে আছে, জিভটা বেরিয়ে রয়েছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, পা দুটো এমন ভাবে মুচড়ে রয়েছে–বোঝা যাচ্ছে বেশ যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেছে। দূরে দেখলাম আর একটা কুকুরেরও একই দশা হয়েছে।

পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকলাম আমি। সিঁড়ির নীচে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম। জানতাম ট্রেজবণ্ডের স্ত্রী আর কাজের লোক চলে গেছে। আমার চিৎকারের জবাবে একটা ভয়ঙ্কর আর্তস্বর শুনতে পেলাম। ওটা ট্রেজবণ্ডের কণ্ঠ। সে বলছিল:

'জিনিসটাকে সরিয়ে নাও; আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও এটাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে উপরে উঠলাম। ট্রেজবণ্ড তখনও সমানে চিৎকার করে চলেছে। তার শোবার ঘরটা বন্ধ। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ওটা ভাঙলাম।

হতভাগা ফেলো উবু হয়ে, গুটিসুটি মেরে ঘরের এককোণে পড়ে আছে। ওর বিস্ফারিত চোখ দুটো ভীতিকর দেখাল।

ট্রেজবণ্ডকে একটা পাগলাগারদে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময়ে সে উন্মত্তের মত যেসব কথা বলত, তাতে পুলিশের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাগানে খোঁড়াখুঁড়ি করে। ওখানে তার স্ত্রীর নিষ্পেষিত মৃতদেহটা পাওয়া যায়। ড্রেসিং গাউনের রশি দিয়ে গলাটা পেঁচানো ছিল। উডশায়্যারের আদালতে ট্রেজবণ্ডের অপরাধ প্রমাণিত হলো, তবে সে উন্মাদ।

তার ডায়েরীটার অর্থোদ্ধার করতে আমার প্রচুর সময় লেগেছিল। ডায়েরীটা লেখা ছিল গোপন, জটিল সাঙ্কেতিক ভাষায়।

চেলসিতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা যা সে লিখেছিল তা সত্য নয়। লতার বীজ নিতেও সে কখনও আমার কাছে আসেনি। বাগান আর পড়ার ঘরের জানালায় যে ধ্বংস সংঘটিত হয়েছে, আর কুকুর দুটোর মৃত্যু তার নিজেরই কীর্তি।

মূল: নেভিল কিলভিংটন
রূপান্তর: মিজানুর রহমান কল্লোল

ডায়মন্ড লেক

'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন ওখানে যেতে চাইছ না,' বলল সোহানা রহমান। 'আমি সত্যি বুঝতে পারছি না।'

'আমরা ডিজনিওয়ার্ল্ডে যাব,' বলল স্টিভ অস্টিন। 'ওখানে অনেক মজা আছে।'

'জাহান্নামে যাক ডিজনিওয়ার্ল্ড,' মুখ ঝামটে উঠল সোহানা। 'আমি ডিজনিওয়ার্ল্ডে বহুবার গেছি। আমি লেক দেখতে যাব।'

'না, সোহানা।'

'কেন নয়?'

'এখন ওখানে অনেক ঠাণ্ডা।'

'গরমের সময় যেতে চাইলাম, বললে এখন ওখানে খুব গরম।'

শ্রাগ করল স্টিভ। 'আমি ও বাড়ি বিক্রি করে দেব। দালালের সঙ্গে কথাও বলেছি।'

'তোমার বাবা ওই বাড়িতে মারা গেছেন, ডায়মণ্ড লেকের তীরে চমৎকার একটি বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। আর তুমি ওটা আমাকে দেখতে পর্যন্ত দিতে চাইছ না!'

'ওখানে দেখার আছেটা কী! একটা লেক। কিছু জঙ্গল। আর কুৎসিত চেহারার ছোট একটি কেবিন।'

'অ্যালবামে ওই বাড়ির ছবি তুমি আমাকে দেখিয়েছ। ছবিতে তোমাকে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। বোঝাই যায় কৈশোরের দিনগুলো চমৎকার কেটেছে তোমার ও বাড়িতে।'

'আমার কৈশোর খুব একটা ভাল কাটেনি ও বাড়িতে,' অন্ধকার ঘনাল স্টিভের চেহারায়। 'আমি ওখানে যাব না।'

'ঠিক আছে, স্টিভ,' বলল সোহানা। 'তুমি ডিজনিওয়ার্ল্ডে ছুটি কাটাতে যাওগে। আমি ডায়মণ্ড লেকে বেরিয়ে আসব।'

সোহানার জন্ম বাংলাদেশে। তবে এইচ.এস.সি পাশের পরে তাকে ইউএসএ পাঠিয়ে দেয়া হয় পড়াশোনার জন্য। ওর বাবা আজাদ রহমান জাতীয় সংসদের একজন প্রভাবশালী সদস্য। মা সমাজকর্মী। স্টিভের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে সোহানা। পড়তে পড়তে ভাল লাগা। প্রেম থেকে পরিণয়। স্টিভ একটি ল ফার্মে চাকরি করে। সোহানা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। দু'জনে মিলে দু'হপ্তার ছুটি কাটাতে বেরিয়েছে।

'তুমি মাঝে মাঝে এমন অযৌক্তিক সব দাবি করে বস।' বিরক্ত হলো স্টিভ।

'মোটেই না,' বলল সোহানা। 'আমি যা করতে চাইছি তা অযৌক্তিক কিছু নয়। ডায়মণ্ড লেকে তোমার বাবার একটা কেবিন আছে। আমি সেখানে ছুটিটা

কাটাতে চাইছি। কিন্তু আমি যখন বলেছি যাব। যাবই। তুমি গেলে যাবে না গেলে নাই।'

'ঠিক আছে। তুমিই জিতলে,' চেহারা বাংলা পাঁচের মত হয়ে আছে স্টিভের। 'তুমি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছ যাবে। আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'গুড,' বলল সোহানা। 'আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলছি। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব।'

গন্তব্যে পৌঁছুতে প্রায় সারাটা দিন লেগে গেল ওদের। ইন্টারস্টেট ছেড়ে পাহাড়ি রাস্তায় ঢুকে পড়ল। মসৃণ, ঝকমকে রাস্তা। স্টিভ যখন ছোট ছিল ওই সময়ই চওড়া করা হয় হাইওয়ে। ওর বাবা যখন লেকের তীরে জমি কিনে কেবিন বানান, ওইসময় দুই লেনের রাস্তাটি ছিল আঁকাবাঁকা এবং বিপজ্জনক। কৈশোরে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু ক্রেস্ট লাইন পাহাড়কে মনে হত আকাশ ছুঁয়েছে। এখন নতুন কেনা ক্রাইসলার ইমপেরিয়াল সাবলীল গতিতে পাহাড় বেয়ে চুড়োয় উঠে যাচ্ছে।

'এই প্রথম ডায়মণ্ড লেকে যাচ্ছি,' বলল সোহানা, 'আমাদের সেলিব্রেট করা উচিত।' ঘন জঙ্গুলে এলাকা দিয়ে ছুটছে গাড়ি। 'শ্যাম্পেন লাগবে আমার। লেকের আশপাশে শপিং সেন্টার নেই?'

'গ্রামে আছে,' বলল স্টিভ, নার্ভাস ভঙ্গিতে চেপে ধরে আছে হুইল। এ ক'দিন ভালই কেটেছে দিন, কিন্তু এখানে আসার পরে... 'গাঁয়ে একটি জেনারেল স্টোর আছে।'

'তোমার কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা, 'এরকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন চেহারা? আমি গাড়ি চালাব?'

'আমার কিছু হয়নি,' জবাব দিল স্টিভ।

কিন্তু মিথ্যা বলেছে ও। ও ঠিক নেই।

এখানে ফিরে আসা উচিত হয়নি। মোটেই উচিত হয়নি।

এক গভীর অন্ধকার অপেক্ষা করছে ডায়মণ্ড লেকে।

গ্রামটির খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। শুধু বাক্স আকারের একটি মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল গড়ে উঠেছে, সঙ্গে স্পোর্টস ক্লদিং স্টোর এবং নতুন একটি গিফট শপ।

সোহানা ওয়েড'স জেনারেল স্টোর থেকে এক কেজি গরুর মাংস আর এক বোতল শ্যাম্পেন কিনল। বুড়ো ওয়েড মারা গেছে বহু দিন, তার ছেলে এখন দোকান চালায়। বাপের সঙ্গে ছেলের চেহারায় অনেক মিল; এমন কী ছেলে বাপের মতই তারের চশমা পরে চোখে। আর চশমাটি ঝুলে থাকে নাকের ডগায়।

'অনেকদিন পরে এলে,' বলল সে স্টিভকে।

'হুঁ...অনেকদিন পর।'

স্টিভ গাড়ি নিয়ে কেবিনের পথ ধরেছে, সোহানা বলল স্টিভ বুড়োর ছেলের সঙ্গে অমন শীতল ব্যবহার না করলেও পারত।

'তা হলে কী করতে বলো আমাকে? ওর হাতে চুমু খাব?'

'অন্তত হাসিমুখে কথা বললেই পারতে। লোকটা তো তোমাকে হাসি মুখেই

"হ্যালো" বলল।'

'আমার হাসি আসেনি।'

'এমন শক্ত হয়ে আছ কেন? একটু রিল্যাক্স করো না।' বলল সোহানা। 'খোদা, কী সুন্দর!'

ওদেরকে ঘিরে আছে ঘন পাইনের সারি, মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে চমকাচ্ছে সবুজ তৃণভূমি, চকচকে গ্রানিট, যেন রঙের সাগরে কালো দাগ।

'এখানে কী ধরনের ফুল জন্মায়, জানো?'

'বাবা এসব খবর রাখতেন,' বলল স্টিভ। 'এদিকে আছে লূপিন, আইরিশ, বাগল ফ্লাওয়ার, কলম্বাইন...বাবা ক্যামেরা নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। বুনো প্রকৃতির রঙিন ছবি তুলতেন। বিশেষ করে পাখির ছবি। লাল ঝুঁটিঅলা কাঠঠোকরার ছবি তুলতে খুব ভালবাসতেন তিনি।'

'তুমি তোমার বাবার সঙ্গে বেরুতে না?'

'মাঝে মাঝে। বেশির ভাগ সময় মা-ই সঙ্গে যেত। শুধু বাবা আর মা। আমি তখন লেকে সাঁতার কাটতাম। বাবা জঙ্গল দারুণ পছন্দ করতেন। তবে মা মারা যাওয়ার পরে মাত্র দু'বার এসেছি এখানে। চোদ্দ বছর বয়স যখন আমার, তারপর থেকে বাবার সঙ্গে আর আসা হয়নি। বাবাকে বাড়িটি বিক্রি করে দেয়ার জন্য অনেকবার বলেছি। তিনি কানেই তোলেননি আমার কথা।'

'ভালই করেছেন। তোমার কথা শুনলে আর এদিকে আসা হত না।'

'বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেলে বেঁচে যাই।' গম্ভীর গলায় বলল স্টিভ।

'কেন?' স্বামীর দিকে ফিরল সোহানা। 'এ জায়গাটির প্রতি তোমার এত বিতৃষ্ণা কেন?'

জবাব দিল না স্টিভ। ওরা লারসনের পুরানো মিল হুইল পাশ কাটাল। পনেরো বছর পরে আবার ডায়মণ্ড লেক ভেসে উঠল স্টিভের চোখের সামনে—গাছের ফাঁকে ঝিলিক দিল যেন রোদে ঝলসানো ইস্পাত। স্টিভের শিরদাঁড়া বেয়ে নামল বরফ জল। চোখ পিটপিট করছে ও। শুনতে পাচ্ছে দিড়িম দিড়িম ঢাকের বাজনা বাজাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

ওর এখানে আসা মোটেই ঠিক হয়নি।

যেমন দেখে গেছে ঠিক তেমনই আছে কেবিন—লম্বা, ঢালু ছাদ, রেডউডের তৈরি কাঠের বাড়ি। নুড়ি বিছানো পথ ধরে এগিয়ে গেল ওরা।

'বাড়িটা একদম নতুনের মত লাগছে!' বাচ্চা মেয়ের মত কলকল করে উঠল সোহানা। 'আমি ভেবেছি ভাঙাচোরা একটা বাড়ি দেখব।'

'বাবা বাড়ির যত্ন নেয়ার জন্য কেয়ারটেকার রেখেছিলেন। যার প্রয়োজন হত এ বাড়িতে দু'এক রাত্তির কাটিয়ে যেত।'

সামনের দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল দুজনে।

'বাহ্, ভারী সুন্দর তো!' বলল সোহানা।

ঘোঁত ঘোঁত করল স্টিভ। 'ড্যাম্প পড়ে গেছে। বেডরুমে কেরোসিন তেলের একটা স্টোভ ছিল। রাতে স্টোভ জ্বালাতাম। রাতের বেলা এদিকে খুব ঠাণ্ডা

পড়ে।'

কেবিনের ভেতরটা কালো ওক কাঠে তৈরি। আসবাবগুলোও একই কাঠের, পাথরের একটি চুল্লিও আছে। লেকের দিকে মুখ ফেরানো কাঁচের জানালা। লেকের তীরে, পাহাড়ের দিকে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা পাইন। ভারী মনোহর দৃশ্য।

'ভিউকার্ডের কোনও দৃশ্যের মধ্যে যেন চলে এসেছি আমি,' বলল উদ্ভাসিত সোহানা। ঘুরল স্বামীর দিকে, হাত ধরল। 'ক'টা দিন এখানে সুন্দরভাবে থাকার চেষ্টা করা যায় না, স্টিভ?'

'চেষ্টা নিশ্চয় করা যায়,' জবাব দিল স্টিভ।

রাতের বেলা চুল্লিতে আগুন জ্বালল স্টিভ। সোহানা রান্না করল। বাসমতি চালের ভাত, গরুর মাংসের রেজালা, ডাল আর সালাদ। ডেসার্ট হিসেবে থাকল ভ্যানিলা আইসক্রিম। চাল আর ডাল সে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে। স্টিভ সোহানার হাতের গরুর মাংস আর ভাত খেতে বেশ পছন্দ করে।

খাওয়া শেষে শ্যাম্পেনের গ্লাস টোস্ট করে সোহানা বলল, 'ডায়মণ্ড লেকের ছুটি সফল ও সার্থক হোক।'

তবে স্টিভ কিছু বলল না। সে জানালার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে চুপচাপ মদ গিলল।

'কৈশোরে এখানে তোমার নিশ্চয় অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল,' বলল সোহানা।

ডানে-বামে মাথা নাড়ল স্টিভ। 'না...আমি একাকী থাকতেই ভালবাসতাম।'

'তোমার গার্লফ্রেণ্ড ছিল না?'

চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল স্টিভের। 'আমার বয়স তখন মাত্র চোদ্দ।'

'তো? তোমরা, আমেরিকানরা তো আরও আগেই মেয়েদের প্রেমে পড়ো। তোমার জীবনে বিশেষ কেউ ছিল না?'

'বললামই তো এখানে আমার জীবন খুব একটা ভাল কাটেনি। অন্য কথা বলো। এসব নিয়ে বলতে ভাল্লাগছে না।'

সিধে হলো সোহানা। বাসনগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, 'ঠিক আছে। তোমার ভাল না লাগলে এ প্রসঙ্গ থাক।'

'শোনো,' শক্ত গলায় বলল স্টিভ। 'আমি এখানে আসতে চাইনি। তোমার চাপাচাপিতে আসতে হলো। এটুকুই যথেষ্ট নয় কী?'

'না। এটুকুই যথেষ্ট নয়,' স্টিভের দিকে ফিরল সোহানা। 'তোমার হয়েছেটা কী? তখন থেকে দেখছি মুখটা রামগরুড়ের ছানা করে রেখেছে।'

সোহানার কাছে হেঁটে এল স্টিভ, চুমু খেল গালে, ডান হাত আলতো ছুঁয়ে গেল স্ত্রীর ঘাড় এবং কাঁধ। 'দুঃখিত, সোহানা,' বলল ও। 'এ জায়গাটা আমার ভাল লাগে না। আমি এখানে কোনও দিনই আসব না ভেবেছিলাম। এখানে এলে অতীত স্মৃতি মনে পড়ে যায়।'

সোহানা আয়ত চোখ রাখল স্টিভের চোখে। 'এ জায়গা নিয়ে তোমার জীবনের কোনও খারাপ ঘটনা ঘটেছে, না?'

'আমি জানি না,' ধীরে ধীরে বলল স্টিভ। 'আমি সত্যি জানি না কী ঘটেছিল...'

জানালা দিয়ে বাইরে, লেকের কাচের মত স্বচ্ছ, কালো, তেলতেলে জলে তাকাল স্টিভ। কালো জলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এল রাত জাগা পাখির ডাক।

ভয়ার্ত এবং ব্যথাতুর আর্তনাদ।

পরদিন জোরে জোরে বাতাস বইতে লাগল। সোহানা ধরে বসল সে লেক ঘুরে দেখবে। 'এটা কেমন জায়গা আমি দেখতে চাই।' রাজি হতেই হলো স্টিভকে। ওর বাবার ইঞ্জিনচালিত একটা রো-বোট আছে। ওটায় চড়ে দু'জনে ভেসে পড়ল লেকে। ইঞ্জিনের শব্দ খালি কেবিনে যেন প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল।

বিশাল লেকে শুধু ওরা দু'জন। আর কেউ নেই।

'এদিকে আর কাউকে দেখছি না কেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'গরম শেষ হলে এদিকে আর কেউ পা মাড়ায় না। অক্টোবরে এদিকে এমন ঠাণ্ডা পড়ে, কেউ সাঁতার কাটা কিংবা বোট চালানোর কথা ভুলেও ভাবে না।' আর আজ অক্টোবরের শেষ। ওর কথার সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন বেড়ে গেল বাতাসের গতি, পাহাড় বেয়ে নেমে এল হাড় জমাট বাঁধা শীতল হাওয়া।

'ফিরে যাই চলো,' বলল সোহানা। 'পাতলা সোয়েটারে শীত মানছে না। জ্যাকেট নিয়ে আসা উচিত ছিল।' স্ত্রীর কথা শুনছে না স্টিভ, স্থির দৃষ্টি পাথুরে তীরে। হাত তুলে দেখাল, 'ওখানে কে যেন বসে আছে,' কাঁপা গলা ওর। 'পাথরের স্তূপের পাশে।'

'কই, আমি তো কাউকে দেখছি না।'

'ওই তো বসে আছে,' ঢোক গিলল স্টিভ। 'আমাদেরকে দেখছে। নড়াচড়া করছে না।'

স্টিভের কণ্ঠ কেমন ভৌতিক এবং অপার্থিব। অস্বস্তি লাগল সোহানার। 'কই আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল সে।

'ঈশ্বর!' স্টিভ ঝুঁকে এল সোহানার দিকে। 'তুমি কি কানা? ওই তো...পাথরের ওপরে।' তীরের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে স্টিভ।

'আমি শুধু পাথর দেখতে পাচ্ছি। তবে...বাতাসে হয়তো কোনও কিছু উড়ে এসে পড়েছে—'

'চলে গেছে,' সোহানার কথা কানে যায়নি স্টিভের। 'এখন কেউ নেই ওখানে।'

আউটবোর্ডে থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিল স্টিভ, লেকের কাকচক্ষু জলের বুক চিরে তীর অভিমুখে ছুটল বোট।

জলের ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটি বাজপাখি, শিকারের সন্ধানে।

গাঢ় ধূসর আকাশের কফিনে শুয়ে বিশ্রাম নিতে চলেছে ক্লান্ত সূর্য।

আজ রাত হবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার একটি রাত।

*

রাত একটার দিকে, আকাশে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ, কেবিনে ঘুমাচ্ছে সোহানা, স্টিভ নিঃশব্দে দরজা খুলে চলে এল লেকের ধারে, বোল্ডারগুলোর পাশে। পরনের ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট ভেদ করে চামড়ায় ধারাল ছুরির পোচ বসাচ্ছে কনকনে উত্তুরে বাতাস।

তবে বাইরের ঠাণ্ডা কাবু করতে পারেনি স্টিভকে, ভেতরের হিমধরা ভয় ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপ্টে রেখেছে সাপের কুণ্ডলীর মত।

ভয় পাচ্ছে স্টিভ কারণ ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। গ্রানিট পাথরে নিশ্চল যে মূর্তিটি ও দেখেছিল, তার সঙ্গে ডায়মণ্ড লেককে নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠার নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

মনে মনে যা ভেবেছিল স্টিভ, তাই ঘটল। আবার আবির্ভূত হলো সেই মূর্তি। পাইনের জঙ্গলের ঘন আঁধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নারী, কুড়ি/একুশ হবে বয়স, লম্বা, কোমর ছাপানো চুল, শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার উন্মুখ ভঙ্গি দেহে, দীঘির অতল জলের মতই মিশমিশে কালো, জ্বলজ্বলে চোখ। তার পরনে লম্বা, সাদা গাউন। জোছনায় রুপোর মত ঝলমল করছে। সে এগিয়ে এল স্টিভের দিকে।

লেকের তীরে মুখোমুখি হলো দু'জন।

'জানতাম একদিন না একদিন তুমি ফিরে আসবেই,' নারীমূর্তি হাসল স্টিভের দিকে তাকিয়ে। তার কণ্ঠ মার্জিত, হাসিমাখা, তাতে উষ্ণতা অনুপস্থিত।

স্থির চোখে মেয়েটিকে দেখছে স্টিভ। 'কে তুমি?'

'তোমার অতীতের একটা অংশ।' হাত বাড়িয়ে দিল নারী। খুলল মুঠো। তালুতে ব্রোঞ্জের একটি চেইন, তাতে ছোট্ট মুক্তো বসানো। 'শেষ যেবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় তারপর থেকে আমি এটা গলায় পরে আছি। তখন আমি সবে তেরোতে পা দিয়েছি। আর তুমি চোদ্দ।'

'ভেনেট,' ফিসফিস করে নামটা উচ্চারণ করল স্টিভ, নারীর গভীর কালো চোখের মাঝে যেন হারিয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। ভীত হয়ে উঠল পরক্ষণে। জানে না কেন তবে মেয়েটি তাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

'তুমি আমাকে চুমু খেয়েছিলে, স্টিভি,' বলল সে। 'আমি তখন ছোট্ট লাজুক একটি গেঁয়ো মেয়ে। আর আমার জীবনে তুমিই প্রথম পুরুষ যে আমাকে চুমু খেয়েছে।'

'মনে আছে আমার,' বলল স্টিভ।

'আর কী মনে আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল তরুণী। 'মনে পড়ে এখানে, এই পাথরের ওপর বসে তুমি আমাকে চুম্বন করেছিলে? সেটা ছিল গ্রীষ্মের এক রাত। লাখ লাখ তারা জ্বলছিল আকাশে। লেক ছিল শান্ত এবং সুন্দর। মনে পড়ে, স্টিভি?'

'আ...আ আমার মনে পড়ছে না,' তোতলাচ্ছে স্টিভ।

'তুমি ওই স্মৃতি কবর দিয়ে রেখেছ,' বলল মেয়েটি। 'তোমার মন সে রাতের স্মৃতির ওপর পর্দা ফেলে রেখেছে তোমাকে রক্ষা করার জন্য। বেদনা থেকে দূরে

রাখার জন্য।'

'আমি তোমাকে নেকলেস দেয়ার পরে,' ধীরে ধীরে বলল স্টিভ, উপযুক্ত শব্দ হাতড়ে বেড়াচ্ছে মনে করার চেষ্টা করছে, 'আমি...তোমাকে স্পর্শ করি...তুমি তোমার শরীর আমাকে ছুঁতে দিতে চাওনি, কিন্তু আমি—'

'তুমি আমাকে ধর্ষণ করেছিলে,' মেয়েটির কণ্ঠ যেন হিমশীতল সিল্ক। 'আমি কাঁদছিলাম, তারস্বরে চিৎকার করছিলাম, তোমাকে মিনতি করছিলাম থামার জন্য, কিন্তু তুমি আমার কথা শোনোনি। তুমি আমার পরনের কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিলে, আমাকে ব্যথা দিয়েছ। অনেক অনেক ব্যথা দিয়েছ।'

সে রাতের প্রতিটি দৃশ্য পরিষ্কার ফুটল স্টিভের মনছবিতে। ভেনেটের অনাঘ্রাতা কুমারী শরীরে প্রবেশ করার পরে কিশোরী তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল...তবে এরপরে কী ঘটেছে মনে নেই ওর।

'আমি চিৎকার করছিলাম বলে তুমি রেগে গিয়েছিলে,' তরুণী মনে করিয়ে দিল স্টিভকে। 'কী রাগ সেদিন তোমার! আমি চিৎকার করছি আর তুমি আমার চিৎকার বন্ধ করার জন্য একের পর এক ঘুসি মেরে আমার মুখটাকে থেতলে দিয়েছ।'

'আমি দুঃখিত,' বলল স্টিভ। 'খুবই দুঃখিত...আ-আমার মাথাটা বোধহয় সেদিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'এরপরে কী ঘটেছিল মনে আছে তোমার?'

মাথা নাড়ল স্টিভ। 'না....কিচ্ছু মনে পড়ছে না।'

'আমি বলব কী ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ,' নিচু গলায় বলল স্টিভ, মেয়েটি যা বলবে নিশ্চয় সুখকর কিছু নয়। তবু ও জানতে চায়।

'তুমি একটি পাথর তুলে নিয়েছিলে। বড় একখণ্ড পাথর।' বলল ভেনেট। 'তারপর পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে আমার মাথাটাকে প্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর তুমি আমাকে তোমার বাবার বোটে তুলে নাও...ওই বোটটা,' রো বোটটা হাত তুলে দেখাল সে। 'বোট নিয়ে চলে এসেছিলে লেকের ঠিক মাঝখানে। বোটে লোহার নোঙর এবং কিছু রশি ছিল। তুমি রশি দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেললে যাতে সাঁতার কাটতে না পারি। তারপর—'

'না!' হাপরের মত ওঠানামা করছে স্টিভের বুক। বিস্ফারিত চোখ। 'আমি ওটা করিনি! গডড্যাম ইট, আমি ওই কাজ করিনি!'

নিরুত্তাপ স্বরে বলে চলল তরুণী, 'তুমি আমাকে বোটের পাশ দিয়ে পানিতে ঠেলে ফেলে দিলে, পায়ে নোঙর বাঁধা। আমি তলিয়ে যাই পাতালে। আর উঠতে পারিনি। লেকে সলিল-সমাধি ঘটে আমার।'

'মিথ্যা কথা! তুমি বেঁচে আছ। আমার সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছ। জ্যান্ত!'

'আমি দাঁড়িয়ে আছি বটে তবে বেঁচে নেই। যদি বেঁচে থাকতাম তা হলে এখন এতটাই বড় হতাম আমি। এরকমই চেহারা থাকত আমার।'

'এসব—' স্টিভের গলা কাঁপছে। 'তুমি নিশ্চয় আশা করছ না যে আমি বিশ্বাস

করব—'

'—যে তেরো বছরের একটি কিশোরীকে তুমি খুন করতে পার? কিন্তু ঠিক এ কাজটাই তুমি করেছ। তুমি দেখবে ওরা যখন আমাকে লেক থেকে তুলল ওই সময় আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল...? রশির বাঁধন আলগা হয়ে যাওয়ার পরে আমি পানির ওপরে ভেসে উঠি।'

কদম বাড়াল তরুণী। কাছিয়ে এল। আরও কাছে।

'কাছে এসো না। খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠল স্টিভ, ঝট করে এক কদম পিছাল। 'চলে যাও!'

স্টিভের সামনে এখন একটি কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে। তার মাথার বামদিকের হাড় ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে, চাঁদের আলোয় বীভৎস সাদা দেখাচ্ছে, শরীরটা ফুলে ঢোল, কুচকুচে কালো। তার একটা চোখ অদৃশ্য, খেয়ে ফেলেছে মাছ কিংবা জলজ কোনও প্রাণী, পরনের পোশাক ভেজা, পচা, কাদামাখা।

'হাই, স্টিভি,' খনখনে গলায় ডাকল সে।

ভৌতিক দেহটার সামনে থেকে চরকির মত ঘুরেই দৌড় দিল স্টিভ। প্রচণ্ড আতঙ্কে উন্মাদের মত ছুটছে। সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়াচ্ছে। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে প্রাণপণে ছুটছে। পালিয়ে যাচ্ছে লেকের তীর এবং ভয়ঙ্কর ওই জিনিসটার কাছ থেকে। ছুটতে ছুটতে বেদম হাঁফিয়ে গেল স্টিভ, গলা আগুনের মত জ্বলছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, পা আর টানতে চাইছে না শরীর। দম নিতে দাঁড়িয়ে পড়ল স্টিভ। এক হাতে জড়িয়ে ধরে থাকল পাইনের গুঁড়ি। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত স্টিভ আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। জোছনায় প্লাবিত এ নিবিড় অরণ্যে ওর ঘনঘন নিঃশ্বাস নেয়া এবং দম ফেলার শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। তারপর, আস্তে আস্তে, যখন স্বাভাবিক হয়ে আসছে দম, মাথা তুলে চাইল স্টিভ এবং....ওহ গড, ওহ ক্রাইস্ট...

ওই যে সে!

ভেনেটের বিকটভাবে ফুলে থাকা বিশ্রী মুখটা স্টিভের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। মাংস গলে গলে পড়া, সাদা হাড় বেরিয়ে থাকা হাতটা বাড়িয়ে দিল প্রেতিনী, স্পর্শ করল স্টিভের গাল...

দুই বছর পরে, সোহানা ডায়মণ্ড লেকের বাড়িটি বিক্রি করে চলে এল বাংলাদেশে। জাভেদ চৌধুরী নামে এক সুদর্শন যুবকের প্রেমে পড়ল সে। জাভেদ একদিন কথায় কথায় জানতে চাইল সোহানার প্রথম স্বামীর খবর। ভাবলেশশূন্য মুখে সোহানা বলল, 'ও ডুবে মরেছে। ফ্লোরিডার ডায়মণ্ড লেকে।'

অনীশ দাস অপু

***